কিসের তরে অশ্রু ঝরে

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য

প্রাপ্তিস্থান : অধ্যাপিকা ভট্টাচার্য, পোঃ বালি-দুর্গাপুর (মাকালতলা) জিলা-হাওড়া (৭১১২০৫)
কলকাতায় দে বুক স্টোর, কথা ও কাহিনী, মণ্ডল এণ্ড
সনস্, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, বুক মার্ট, এস. বি বুকস

প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৫৩

প্রকাশক : সানুশ্রী ভট্টাচার্য
পো: বালি-দুর্গাপুর
জিলা : হাওড়া

মুদ্রক : বাসু ফটোকম্পোজিং সেণ্টার
১০এ, আশুতোষ শীল লেন
কলিকাতা-৯

লেখকের অন্যান্য বই --

এবং জলবাংলার মনচিত্র
এবং তুমি
এবং প্রেম-অপ্রেম
এবং ভাঙ্গাকুলো
এবং ভূত
নয়নের নীড়
মন এক মন্তর
দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও আমরা (মিত্র এণ্ড ঘোষ)

কিসের তরে অশ্রু ঝরে

সকল

কন্যা-জায়া-মাতাদের

উদ্দেশে

ভূমিকা

শ্রী অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের বিভিন্ন রচনা পড়ার সৌভাগ্য পূর্বে হয়নি। নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মধ্যবিত্ত মানুষের মানসিকতা তাঁর রচনাবলীর প্রধান উপজীব্য। আলোচ্য বইখানিতে তারই একটা বিশিষ্ট দিক ধরা পড়েছে।

নারীসমাজের সমস্যা নিয়ে বিগত তিন দশক ধরে বিভিন্ন আলোচনা, গবেষণা ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণা ও রচনাবলীর ব্যাপ্তি নারীসমাজের সামাজিক আর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার নানা স্তর জুড়ে হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণালব্ধ তথ্যগুলির মধ্যে লক্ষণীয় ঃ যদিও সমাজের অর্থনৈতিক উচ্চস্তরে কথঞ্চিৎ উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেছে, কিন্তু নিম্নস্তরে তার অবনমন ঘটেছে অনেকখানি। অর্থাৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, বিচারক প্রভৃতি পদে যেমন নারীসমাজের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ দেখা যায়, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নারীসমাজের পশ্চাৎপদ অবস্থা আর নেই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাই শিক্ষার ব্যাপকতা কমে গেছে, স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা দুর্লক্ষ্য, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীসমাজ সর্বত্রই পশ্চাৎপদ। এই তথ্যগুলি পরিবেশিত হওয়ার ফলে নারীসমাজের অবস্থা সম্বন্ধে কৌতূহল এবং আগ্রহ বুদ্ধিজীবী মহলে অনেক বর্ধিত হয়েছে।

আলোচ্য বইখানিতে নারীসমাজের সাধারণ সামজিক ভূমিকা এবং বর্ণাশ্রমধর্মের প্রচণ্ড অভিঘাতক্ষুব্ধ সমাজ পরিমণ্ডলে মেয়েদের নিজস্ব চিন্তা চেতনার দিকগুলি আলোচিত হয়েছে। বিবাহ সংস্কারের চিরায়ত চিন্তাধারার মধ্যে যে নতুন দিক্‌নির্দেশ সূচিত হয়েছে, নারীর মুখেই তার দ্বিবিধ ব্যাখ্যা আলোচ্য বইখানির এক উল্লেখযোগ্য দিক। পরন্তু, নারীর চিরাচরিত সামাজিক ভূমিকার মুখোমুখি নতুন চেতনার উদ্ভব তার নিজস্ব সাংসারিক অঙ্গনে এক অভিঘাতক্ষুব্ধ চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে। সামাজিক সম্পর্কগুলি, কন্যা, বধূ, ননন্দা, শ্বশ্রূ প্রভৃতি নতুন ব্যাখ্যা ও উপলব্ধির দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সর্বোপরি ব্যক্তিচেতনার বিকাশ, সামজিক সম্পর্কের চিরাচরিত সংকীর্ণ পরিমণ্ডলের মধ্যে বৃহৎ ভাঙন ধরিয়েছে। আজ শিক্ষাগর্বী নারীসমাজকে নতুন করে নিজের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে হবে, লেখক এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন তাঁর এই বইখানিতে।

অদ্যাবধি পুরুষের চোখে নারীসমাজ এক বিশিষ্ট কৌতূহলের বস্তু। লেখক সেই কৌতূহলেরই প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনায়। মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হিসাবে নিশ্চয়ই তাঁর অধিকার আছে এই কৌতূহল নিরসনের প্রচেষ্টার। সেজন্য নারীসমাজ সম্পর্কিত আলোচনাসমূহের বিপুল পরিসরে আলোচ্য বইখানি বিশিষ্টতার দাবী রেখেছে।

লেখকের কথা :

এই বইটিতে নারী চরিত্ররা তাদের নিজ নিজ কথা বলেছে। তাদের কথাই প্রধান। আমার কোনো কথা নেই। ওদের কথা-সুর-গানে আমার কাজ তবলার অনুসঙ্গ মাত্র। যা কিছু তাল ভঙ্গ, সুর-ছেদ, ছন্দপতন তার দায় আমার, মধুর যদি কিছু থেকে থাকে তা ওদের।

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য

সূচী :

তাপসীকে	৭
তনিমা বিয়ে করবে না	২৬
অনিমা বিয়ে করবে	৪২
রায়বাঘিনী	৫৩
আমাকে বলতে দাও	৬১
নারী স্বাধীনতা	৭১
এমন জানলে	৮৪
প্রিয় লেখকমশাই	৯৪
প্রিয় প্রকাশক	১০০

তাপসীকে

প্রিয় তাপসী,

এতো দিন পরে হঠাৎ আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই হকচকিয়ে যাবি। হয়তো ভাবতে বসবি কি এমন হল যে তোকে এতো বড় চিঠি দিচ্ছি। সেই কবেই তো শেষ হয়ে গেছে আমাদের কলেজের জীবন, শেষ হয়ে গেছে অকারণ গঙ্গার ধার বেয়ে বেয়ে পদচারণা, পুরোনো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছগুলোর শীতল আচ্ছাদনের আড়ালে আমাদের কতো শত সদর গোপন কথার জাল বুনন। সে সবই এখন স্মৃতি। এবং সুখেরও। যতবারই ফিরে ফিরে সেই সব অনুচ্চকণ্ঠ আলাপনের দিনগুলোতে যাই ততবারই মনে হয় হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছি। উপরের নীল আকাশ, নিচের সবুজ ঘাস আর তার মাঝখানে তরুণ মনের পরতে পরতে রং-তুলির ছবি ছবি দিনগুলো আর ছন্দবদ্ধ মনের মিল-পয়ার অনুভবগুলো যেন রামধনুর মতো বাস্তবের সূর্যালোকে এমন করে পুড়ে গেল, ছিঁড়ে গেল, হারিয়ে গেল! স্মৃতি তাই দুঃখকে যেন বাড়িয়ে তোলে, ঘন করে ভারি করে ফেলে। আমাদের সেই পাখি-ওড়া অতীত যেন পাথর ঘেরা বর্তমানকে অধিকতর দুঃসহ করে তুলছে। তোর কথা জানি না; নিজের কথা মর্মান্তিক ভাবেই জানি।

তোকে লেখা এই চিঠি তাই, বলতে পারিস্, আমার নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া। এ-চিঠির কোনও উত্তর দেবার দায় তোর ঘাড়ে চাপাতে চাই না; নিজের মমপীড়াটুকুকে সযত্নে প্রকাশ করে হাল্কা হতে চাই। অনেকটাই যেন গীর্জায় গিয়ে স্বীকারোক্তি দেবার মতো। নিজের সঙ্গে নিজের অংক কষা। কোথায়, কখন এবং কেমন করে যেন আমার জীবনের একলা মনের তরীখানি দিকভ্রষ্ট হয়ে অথৈ জলের নিঃসীম পাথারে হারিয়ে যাচ্ছে। কূল যে খুঁজে পাচ্ছি না তাই নয়, অকূলের যাত্রায় কূল খোঁজার চেষ্টাটাই যেন ক্রমশ বৃথা বলে মনে হচ্ছে। এই চিঠি তাই আমার বেদনার সবিস্তার বর্ণনা, আমার ভুলের নির্মম গতিপথের বিবরণ, আমার অক্ষমতার-অজ্ঞতার নামাবলি।

তুই আমাদের পরিবারের সকলকেই তো চিনিস্। বেশ ভাল করেই জানিস্। কতোবার এসেছিস আমাদের বাড়িতে। আমার মায়ের স্নেহময়ী রূপটি তোকে বার বার টেনে এনেছে। আমার বাবা জীবনে সংগ্রাম আর প্রাপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁর কথা বলা, বিশ্লেষণ করার তীক্ষ্ণ মানসিকতা, ধৈর্য আর স্থির ব্যক্তিত্ব তোকে প্রভাবিত করেছে। আমার দিদিকে তোর তত ভাল লাগেনি কারণ সে অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির। স্বনির্ভর, স্বাধীনচেতা এবং মহিলাসুলভ কোনও কোমলতাই তার পছন্দের মধ্যে পড়ে না। পুরুষ প্রধান এই পৃথিবীতে আমার দিদি যেন একটা অদৃশ্য যুদ্ধ পতাকা বহন করেই চলেছে। আর আমার নামুন, অর্থাৎ আমার ঠাকুমা? আমার বাহন, আমি বাহিত। আমি আর আমার ঠাকুমা জীবনের দুই প্রান্তে বিপরীতমুখী গতিতে যেন পয়ার ছন্দ। বন্ধু, সখা মিত্র। আমার একটিই মাত্র ভাই, আমার দাদা। দিদির সঙ্গে তার দূরত্ব যতটাই বেশি আমার নৈকট্যটা ততই কাছের ছিল। মা আমাকে আঁচলের মতো ভালবাসতো, আড়াল করে রাখতো আর বাবার কাছে আমি ছিলাম পুতুলের মতো আদরের, পোষা পাখিটির মতো স্নেহের। এই ছিল আমার শৈশব তারুণ্যের ছবি। আমার জীবনে পূর্ণতা পূর্ণমাত্রায়ই ছিল।

অন্য অনেক মেয়ের থেকেই আমার জীবন অন্যরকম ছিল। তোর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে, অর্থাৎ কলেজ জীবনের আগেই, আমার অনেক জায়গায় ঘোরা হয়ে গেল। অনেক স্কুল, অনেক

বন্ধু, অনেক পরিবেশ। অত্যন্ত অল্পবয়সেই উত্তর বঙ্গের সজল-সবুজ পরিবেশ। পরিচ্ছন্ন শহর, ছোট ছোট বন্ধু-বান্ধব, দৌড়-ঝাঁপ খেলাধূলা, পুকুর, নদী মাঠ-ঘাট। একটা বিরাট পরিসরে নড়াচড়া। কালের পটে আমার মিষ্টি চেহারা আমাকে সকলের কাছেই নিকট করে দিতো। সকলেই আমাকে আদর করত। পাড়ার মামি-পিসি থেকে স্কুলের দিদি-দিদিমণিরা সকলেই। (তোর নিশ্চয়ই মনে পড়ছে তোরা অনেকেই আমার মুখের শ্রী নিয়ে কতো দুষ্টুমি করেছিস্!) সেই একই ব্যাপার ঘটেছে কলকাতার কাছে যখন বাবা বদলী হয়ে একটা শহরতলির সরকারি কলেজে এলেন। সেইখানে, সেই আর একটু বয়স বাড়ার পরে, আমার আর্কষণও তো আরও একটু বেড়ে গিয়ে থাকবে। বাড়িওলা থেকে শুরু করে আশপাশের অনেকেই আমার মিষ্টিমুখের জয়গান করতো। তখনও তরুণী। তাই ভালও যেমন লাগে, শংকাও তেমন অবুঝ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। তারপরে একসময়ে গঙ্গার ওপার থেকে এ পাড়ের একটা বিখ্যাত বিদ্যালয়ে। ট্রেনে যাতায়াত, স্টেশন থেকে স্কুল বেশ একটু হাঁটাপথ। অনেক বাড়ি, বহু ব্যালকনি-দৃষ্টি। এবং সবশেষে তোর সঙ্গে পরিচয় অত্যন্ত পুরোনো, বহু স্মৃতিবিজড়িত, সবুজের সমারোহে মোড়া গথিক্ স্টাইলে গড়া গঙ্গার বহমান স্রোতে ধৌত তোদের এবং আমাদের কলেজে। এখানে এসেই আমাদের তারুণ্যের কবিতা যৌবনের চতুর্দশপদীতে রূপান্তরিত। সেই উত্তরণের প্রায় সবটাই তোর জানা।

তোর যেটা জানা নেই সেখানেই আমার যত অন্ধকারের আনাগোনা। তুই আমার সূর্যসাক্ষী জীবনের অনেকটাই জানিস্। তোকে জানিয়েছি, তুই জেনে নিয়েছিস। সেই আলোঝলমল জীবনের কোথায়ও ছোপধরা অংশ ছিল না। তাই লুকোনোর ছিল না কিছুই, বরং বলার মধ্যে, প্রকাশ করার মধ্যেই ছিল আনন্দ। এখন চলছে অমাবস্যা, কালো কালো দিবসরজনীর চলমান বহমান আদিগন্ত অন্ধকার। তাই তোকে সেটাও জানাতে চাই। নদীর বাঁক নেওয়া শুনেছি, ছবিতে দেখেছি। পাহাড়ের উর্ধ্বগতি পথে 'ইউ' বাঁকও দেখেছি, শুনেছি। নিজের জীবনে যে আলো আর অন্ধকার, ভাল আর মন্দ, সম্মুখগতি আর পশ্চাৎগতি এমন একাকার হয়ে দেখা দেবে তো স্বপ্নেও ভাবি নি।

অথচ এটা আদৌ স্বপ্ন নয়, স্বপ্নে ঘটে নি। আমি নিজে হাতে একটা একটা করে আমার চারদিকের সব দরজা জানালাগুলো নিজে হাতে বন্ধ করে দিয়েছি। তুই হয়তো ভাববি যে এটা কেমন করে হয়। যদি আমি আমার নিজের কাজগুলো এতো পরিষ্কার করেই বুঝতে পারি, বুঝতে পেরে থাকি, তাহলে কেন এমন কাজ করলাম, করতে গেলাম। এর উত্তরের মধ্যেই তো উপ্ত আছে, আমার জীবনের বিষবৃক্ষের বীজটি। সব পেয়ে পেয়ে আমার না-পাওয়ার চেতনাটাই জাগ্রত হয় নি ; শৈশব-কৈশোর-তারুণ্য পরিব্যাপ্ত জীবনে আলো আর আলো আমাকে অন্ধকারের অনুভব তৈরি করে দেয়নি। অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসায় অবগাহন করে করে আমার মনটা সীমিত-ক্ষুদ্র-অনটনের অভিজ্ঞতাটাই টের পায় নি। তাই হঠাৎ যখন না-পাওয়ার বেদনাবোধ আমাকে আক্রমণ করল তখন আমি অপ্রয়োজনীয় কঠিন হয়ে পড়লাম। প্রথম যখন অন্ধকার আমার চোখের সামনে বাস্তব হল তখনই আমি 'জেদি' হয়ে পড়লাম আর স্নেহ-ভালবাসার আটপৌরে অনটনে আমার অহংকার জাগ্রত হল। এখন খুব সহজেই বুঝতে পারি যে জেদ, অহংকার এবং কাঠিন্য আমার স্বরূপেই ছিল। বীজের অন্তরে যেমন অঙ্কুরের উদ্গম সম্ভাবনা নিহিত থাকে তেমনি। সময় ও পরিবেশ তাকে তাপে, চাপে এবং আবহে স্বাভাবিক পরিণতি দেয় মাত্র।

তাপসী, তুই আমার জীবনের বহু বছরকে জানিস্। কিন্তু জানা নেই ছিয়াশি থেকে এই নব্বই সাল পর্যন্ত ক'একটা বছর। এই বছর ক'টি আমার জীবনকে ওলট পালট করে দিল। অথবা বলতে পারি একের পর এক ভুল করে করে আমি নিজেই আমার এই মূল্যবান বছরগুলোকে নষ্ট

করে ধ্বংস করে কবরের দিকে অনিবার্য করে গড়ে তুললাম।

ডিসেম্বরে বিয়ে করলাম। [তুই কিন্তু এসেছিলি, দেখেছিলি, এবং মন ভরে আমার প্রাপ্তিতে আনন্দ করে গেছিলি।] ষোল দিনের মাথায় মা মারা গেলেন। তিন মাসের মাথায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গেলাম। দেড় বছরের মাথায় মা হয়ে গেলাম। আড়াই বছরের মাথায় স্বামী আমাকে ত্যাগ করে গেল আমার বাপের বাড়িতে। এবং তার দু'মাসের মধ্যে আমি বাবাকে এবং ভাইকে ত্যাগ করে আবার চলে গেলাম স্বামীর কাছে। যখনই যা করছি এবং করেছি সেই সময়ে সেই কাজ আমার করণীয় বলেই করেছি। সঠিক বলেই মনে করেছি। স্টিম যেমন ইঞ্জিনকে চালায় আমার মধ্যে তেমন একটা তাৎক্ষণিক জেদ-শক্তি আমাকে চালিত করে। যখনই যে কাজ করি, তখন, সেই করার সময়ে, আমার মধ্যে একটা তেজ, একটা অধীর যুদ্ধভাব যেন আমাকে গ্রাস করে রাখে। তাই আমিই আমার জীবনের রাহু। এই রাহুগ্রাস থেকে যখন এবং যতটুকু সময় মুক্ত থাকি, মুক্ত হয়ে আমি আমার আলোময় আমিতে বিচরণ করি সেই সময়টুকুই আমার অনুশোচনার আমার আত্মধিক্কারের সময়।

এরকম একটা সময়েই আমি তোকে এই চিঠি লিখতে বসেছি।

এবারে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে এসেছি। আসার সময়ে বাবাকে একটি চিঠি দিয়ে এসেছি। তার থাকা না থাকা যে আমার কাছে সমমূল্যের, বাবার কাছে যে আমি আর আসব না, চিঠি দেব না তা পরিষ্কার করেই তাঁকে জানিয়ে এসেছি। এবং তাঁর ডায়েরির পাতা থেকে এমন সব অংশ ছিঁড়ে এনেছি যা তাঁর প্রিয় সন্তান এবং পুত্রবধূর জীবনকে বিষময় করে তুলতে সাহায্য করবে বলেই নিয়ে এসেছি। সেই ছিন্ন-ডায়েরি-অংশ আমি কাজে লাগাব বলেই, ধ্বংস কাজে লাগাব বলেই নিয়ে এসেছি। আমার মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়েই এ কাজ করেছি। আমার জেদ আমার অহংকার আমার ধৈর্যহীন ঈর্ষাবোধ আমাকে অমানুষ করে তুলেছিল। তাছাড়া ইন্ধন জোগানোর লোকও ছিল। একদিকে আমার স্বামী অন্যদিকে আমার দিদি। দুজনেরই নিজ নিজ প্রয়োজনে আমার বাবার বিরোধিতা করা প্রয়োজন ছিল। তাঁকে আঘাত হানতে তারা স্বতন্ত্রভাবে উদ্যতই ছিল। আমাকে ব্যবহার করেছে তারা। আর আমি ব্যবহৃত হয়ে, সেই সময়ে মনে করেছি দারুণ একটা কাজ করে চলেছি! আমার আত্মতৃপ্তির নেশা, আমার প্রতিশোধ স্পৃহা আমার আঘাত হানার ক্ষমতা একই সঙ্গে যেন চরস্-গাঁজা-আফিং-এর নেশায় উত্তাল করে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এবং কত সহজেই না আমি মানসিক আত্মহত্যাটি করে বসলাম।

আমি হারালাম। ছোট হয়ে গেলাম। স্থানচ্যুত হলাম! একই সঙ্গে বাবাকে হারালাম, দাদা-বৌদিকে হারালাম এবং নোতুন করে পাওয়া মাতৃস্নেহের আশ্রয়টিকেও হারালাম — মাসিমা বলি বৌদির মাকে। তিনি আমাকে সন্তানের মতোই স্নেহ করেন। যদি কেড়ে নিতাম, বলে নিতাম অথবা নেবার পরেও জানাতে পারতাম তাহলেও তো চুরি হত না! আমি চুরি করেছি! তাপসী, আমি সারাজীবনেও তো এই চুরির কলঙ্ক অপসারণ করতে পারব না! একান্ত ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতা চুরি করেছি!

এই হারানোটা যে আমার কতখানি তা আর একটু ভাল করে বলি। আমার বাবা আমাকে অসীম স্নেহ করতেন। আমাকে ভয়ও করতেন। আমি অত্যন্ত অভিমানী মেয়ে। মা-ঠাকুমার আঁচলের আড়ালে বড় হতে হতে কখন যেন সেই আঁচলখানিই আমার অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিল। বাবার কর্তব্য বোধের নির্দেশ আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন কঠোর বলে মনে হত। বাবা অনেক সময়েই আমার গোমড়ামুখ অভিমানী চোখের জ্বালায় সরে যেতেন। আমার জেদ্ আমার অহংকার প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে আমার মাপ ছাড়িয়ে আরও বড় হয়ে উঠলো। আমার সহ্য শক্তি অত্যন্ত দুর্বল,

ঠুন্‌কো আমার চোখের জল। আমার এই ক্রমশ গড়ে ওঠা অহমিকায় ইন্ধনের অভাব ছিল না। দাদা-দিদি থেকে আমি চার-পাঁচ বছরের ছোট ; ওরা বড় বলে বাবা ওদের প্রতি যে যত্ন নিতেন, লেখা-পড়া, স্কুল, জামাকাপড়, কথাবার্তা আদপ-কায়দা গড়ে তুলতে যে পরিমাণ সময় ব্যয় করতেন তা আমার ঈর্ষাকে বাড়িয়েই তুলতো। তাই একদিকে বাবার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতার দীক্ষা হল, অন্যদিকে অবচেতনেই হবে, একটা প্রতিপক্ষ-বোধ, একটা বঞ্চনার উৎস-বোধ ভিতরে ভিতরে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। আগের অংশ আগে বুঝেছি, পরের অংশ এখন বুঝতে পারছি।

আমার বিয়ের ব্যাপারে বাবা অসাধ্য-সাধন করলেন। পত্রে, বর্ণনায় এবং বিশ্লেষণে যখন মা আর আমি নিশ্চিত প্রকাশিত মত দিলাম, এবং একসময়ে এ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে বলে আমি ঝোঁক দিলাম তখন বাবা আবার উঠে পড়ে লাগলেন। কিছু সাময়িক বাধা এই সম্বন্ধটিকে বিপথচালিত করতে সচেষ্ট ছিল! আমার বাবার চিন্তা-ভাবনা বিশ্লেষণ অঘটন-ঘটন প্রকৃতি এবং সিদ্ধান্তমুখীতাই সব বাধা বিপত্তি চূর্ণ করে আমার কানে সানাই-এর ধ্বনি অনুরণিত করিয়ে তবে খান্ত হলো। ওদের চিঠি পড়ে আর বাবার কাছে পাত্রের বর্ণনা শুনে আমার কুমারী মন দত্তা হয়ে পড়েছিল। তাই বাবা অন্যথা হতে দিলেন না।

সৌম দর্শন শান্ত স্বভাব স্বল্পবাক সুরুচিপূর্ণ যুবক। ব্যাঙ্কে চাকরি। বাবা রেলের অবসরপ্রাপ্ত হেড এসিস্টেন্ট। সেই সময়ের ইংরেজির অনার্স স্নাতক। পাত্র ও স্নাতক। বিজ্ঞানের। এক দিদি, বিবাহিতা। মা আছেন। ছোট্ট সংসার। ছিমছাম। বাবা ভাল পেনশন পান, ছেলের সিডিউল্‌ড্‌ ব্যাঙ্কের স্বীকৃত মাইনে। নিজেদের বাড়ি আছে, কিন্তু ছেলের চাকরির কারণে শহরেই থাকেন, ভাড়াবাড়িতে। বর্ণনা, পাত্র এবং বিবরণ আমাকে মোহিত করে ফেলল। তাই যখন বাধা এলো তখন আমি উত্তাল হয়ে পড়লাম, অধীর বেদনায় মাকে দিয়ে এবং নিজেও বাবাকে উদ্বুদ্ধ করলাম। অসাধ্য সাধনে পটু আমার বাবা সাধনে-সমাপনে সাথক স্বীকৃতি পেলেন।

আমি শ্বশুর বাড়ি গেলাম। তের-চোদ্দ ভরি সোনার গয়না অনেকেরই চোখ কপালে তুলে দিল। তার সঙ্গে ওনিডা কালার টিভি এবং ড্রেসিং টেবিল। আনুসঙ্গিক 'অরকেস্ট্রেটেড'! বড়লোকের ছোট মেয়ে বলে ওদের নাকি বেশ একটু কিন্তু ছিল, বিশেষ করে আমার ভাবী স্বামীর। এ-বিষয়ে স্টেশনে বাবার সঙ্গে নাকি তার কিছু কথাও হয়েছিল। আমি তা শুনেছিলাম। তাই চেষ্টা করে বড়লোক-ভাব ঢাকতে চেষ্টা করেছি। এমন হতে পারে সেই চেষ্টার মধ্যেই আমার মনের গভীরে অবস্থিত অহংকার বারবারই বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

প্রথম প্রথম যা হয় তাই হল। ওরা সকলেই খুব ভাল, খুব ভাল। নোতুন বৌ হিসেবে তো আমার প্রশংসার শেষ ছিল না। আমি দেখতে ভাল, মিষ্টি। আমার কথাবার্তা ভাল, সংস্কৃত। আমার আদপকায়দা ভাল, পরিশীলিত। আমার কাজকর্ম ভাল, চটপটে। আমার নজর সব দিকে, আত্মীয়স্বজন অভ্যর্থনায় মুগ্ধ। একটা নেশা-নেশা ভাব ক'এক সপ্তাহ চলতেই থাকল। বেশ লাগছিল এই নোতুন জীবন, নোতুন স্বাদ, নোতুন আবিষ্কার। সবদিক দিয়েই, সর্বথা। দেহে-মনে অনুভবে। আত্মীয়-স্বজনে-অভ্যাগতে। একটা মিলনের সুর, একটা আনন্দের মূর্ছনা যেন চন্দ্র-সূর্যকে বিভোর করে রেখেছিল। অনুক্ষণ মনে হত যে ফুলের সত্য তার পাঁপড়িতেই, আকাশের সত্য তার নীলিমায়। সামনে প্রসারিত বাঁধে-মাঠের সত্য তার সবুজে, অদূরে প্রবাহিত নদীটির সত্য তার চপল চঞ্চল প্রবাহে। পাখি সুন্দর তার গানে, শিশুরা সুন্দর তাদের কলভাষণে। বার বার মনে হয়েছে বড়রা ভাল তাদের আপনাপন বোধে, স্বজনেরা সুন্দর তাদের আন্তরিকতায়। আমি বিমূঢ়, আমি উচ্চকিত, আমি পূর্ণবোধের ঝলকে উদ্ভাসিত।

দ্বিরাগমনে এলাম পূর্ণ মন নিয়ে। সেই প্রথম দেখলাম আমার স্বামী ঘরের কোণকে একান্ত করে আঁকড়ে ধরেছে। এক বাড়ি লোকের মধ্যে সে যেন কেমন একেবারেই একা। একা-অন্ত-অস্তিত্ব অবস্থান। আমার ভীষণ রাগ হতে লাগল। স্বামীর উপরে নয়, বাড়ির সকলের উপর। তারা কেন ওকে কাছে টেনে নেয় না, ডেকে কথা বলে না, কেন ওকে সঙ্গ দেয় না? বাবার কাছে অভিযোগ জানালাম; মাকে অনুযোগ করলাম। আমার মনোবাসনা পূরণ হল না; যদিও বা একজন কেউ ওকে ডেকে নিয়ে যায়, কথা বলে, ও কিন্তু প্রথম সুযোগেই সেই একান্ত কক্ষের একপ্রান্তেই নিজেকে স্বাভাবিক মনে করে। সকলেই বড়, শ্বশুর শাশুড়ি; তাই ওর গল্পকথায় প্রাণ পায় না। দাদা অনেক সময় ওর ঘরের একান্তে ব্যয় করে। সে তো সধূম নৈকট্য মাত্র। আগুনের জ্বলুনী শেষ হলেই ওদের দ্বৈত উপস্থিতিও শেষ হয়ে যায়। দিদি মেলামেশা বেশি পছন্দ করে না। বিশেষ করে তখনও দিদির সঙ্গে আমার এবং আমার বিয়েকে কেন্দ্র করে যে বিভেদ তৈরি হয়েছিল সেই দূরত্ব বোধ, বিভেদ শেষ হয়ে যায় নি। বাকি রইল কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। ওরা ঘন-নৈকট্য চায়, পাশে বসে আদর করতে চায়, অকারণ পুলকে বিরক্ত করতে চায়। আমার স্বামী সেখানে গম্ভীর হয়ে থাকে। মিলতে মিশতে পারে না। বাচ্চাদের সঙ্গে কি ছেলেমি করা চলে? পরে, অনেক পরে শুনেছি মা সেই প্রথম ক'দিনের জানা-দেখাতেই বলেছিলেন যে তার জামাইটি অসামাজিক হল! বিকেলে প্রায়ই বাইরে বেড়াতে যেতো। ফিরে আসতো পূর্ণ-গম্ভীর হয়েই। নোতুন জামাই নোতুন শ্বশুর বাড়িতে এসে এমন ভাবে চোয়ালচাপা হয়ে থাকাটা সকলেরই দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল। আমার মনে হয়েছিল বিয়ের সময় বরযাত্রীদের দুর্ব্যবহার, ফ্লাওয়ার ভাস্ চুরি করা, বালিস ছেড়া এবং একাধিক দামী Emergency light ভাঙ্গার যে ইতিহাস রেখে গেছিল সেই জন্যেই হয়তো ওর গাম্ভীর্য। অথবা অন্য কোনও কারণে হবে বা। পরে জেনে নেবো বলে সংকল্প ছিল।

ফিরে যাবার পর পরই ডাক এলো মা অসুস্থ, হাসপাতালে। রাত জেগে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেও মাকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না। আমার জীবনের এখন পর্যন্ত মর্মান্তিকতম আঘাত। পরদিনই ফিরে গেলাম। বলা যায় নিয়ে গেল।

সদ্যমাতৃহারা আমি ফিরে গিয়ে আর সেই আনন্দঘন পরিবেশটি খুঁজে পেলাম না। আমার মনের বিষাদ, একাকিত্ব এবং নিঃসঙ্গতার কোনও অনুভব ওদের কারো মনেই বেদনার ঢেউ তুলল না। মা-সর্বস্ব আমি যে কি হারালাম তা ওরা উপলব্ধিই করতে পারল না। এই বিষাদ ব্যাকুল মনে পৃথিবীটাই আমার কাছে ক্রমশ বিস্বাদ মনে হতে লাগল। আমার শাশুড়ি আর আমার মা রইলেন না, বাস্তবের অভিভাবিকা হয়ে দেখা দিলেন। আমার চোখের জলে ভেজা বালিশের পাশে আমার স্বামীর নিদ্রাটি অ-সুখের হতে পারল না। দিনের সূর্য আমার জীবনে আলোর উৎস না হয়ে ক্রমশই খরতাপানলের প্রতিভূ হয়ে দেখা দিতে লাগল। ঘরের অধিকার ব্যবহার নিয়ে অসুবিধা দেখা দিতে লাগল, দিনে-রাতের যে কোনও সময়েই শাশুড়ি আমাদের বেড রুমে তার প্রয়োজনে ঢুকে পড়তে লাগলেন, সর্ববিষয়ে আমার যে স্বাভাবিক অধিকারটি ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল তা ক্রমশই খর্ব হতে লাগল। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কেমন ব্যবহার করার কথা তা শাশুড়ি এবং তৎস্থানীয় অন্যান্যরাও বেশ পরিষ্কার করে আমার স্বামীকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। আমার মনে হল ওদের মাথায় প্রথম থেকে শাসনের প্রয়োজনটি স্বতঃই অথবা স্বজনমাধ্যম রোপিত হয়ে থাকবে। আমার স্বাধীনতায় বাধা দেওয়াটা যেন ওদের একটা প্রধান কর্তব্য হয়ে দেখা দিল। স্বামীর কাছে জানাতে গিয়ে ভালবাসার বদলে পেলাম নির্দেশ, সান্ত্বনার বদলে পেলাম জ্ঞানগর্বী উপদেশ। স্ত্রী পরিবারের সকলের জন্যে, সকলের সেবার জন্যে, সকলকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। স্ত্রীর কাজ সকলকে মান্য করা। স্ত্রী শুধু স্বামীর — এটা স্বার্থপরের মতবাদ। তাছাড়া বড়রা যাই করুন ঠিকই করেন, অন্যথা মাত্রই

অবাধ্যতা। তার কথার মধ্যে গুরুগিরি যতটা প্রকাশ পেত, সহানুভূতি ততটাই অপ্রকাশ হয়ে পড়তো।

সেই সময়ের দিনগুলো যায় আমার নানা কাজে আর অকাজে, নানান আত্মীয়-স্বজনদের অভ্যর্থনায় আর তাদের অফুরন্ত উপদেশবাণী শ্রবণে। আর রাতগুলো কাটে চোখের জলে আর অভিমানের আত্মযন্ত্রণায়। মাথায় হাত রাখার কেউ নেই, দুটো নম্রকোমল কথার জন্য কারো সময় নেই, সদ্য মাতৃহারা পিতৃগৃহ-ছিন্ন একটি তাজা প্রাণের বেদনা-যন্ত্রণা-বিষাদ বোঝার মতো কোনও মনই চারধারে দেখা যায় না। দিন যায় আর আমার মন ভাঙ্গে; রাত যায় আর আমি নিঃস্ব হয়ে পড়ি।

বার বারই এই সময়ে আমার মনে হয় সবই মরীচিকা! মনে হয় ফুলে কাঁটাও আছে, কীটও আছে, আকাশের নীলের আড়ালে কালবৈশাখীর ঝড় আব বাজপাখির আনাগোনাও মিথ্যা নয়, অদূরের বাঁধ আর মাঠ এখন সবুজ হারিয়ে কাঁকড়-পাথরের সমাহার বলে মনে হয়, নদীটির সত্যতায় প্লাবণ এবং মৃতদেহের প্রবাহও কম কিছু নয়। মনে হয় পাখিদের কণ্ঠে কর্কশ রবের ঘোষণা, শিশুদের অবাধ্যতাই তাদের অসুন্দর করে তোলে। মনে হয় বড়রা ছোটদের বোঝে না, নির্দয় বলে। স্বজনেরা কেবল মাত্র স্বার্থপর। আমার যুবতী মনের প্রথম ফোটা ফুলটি ক্রমশই শুকিয়ে উঠতে লাগল। তাপ নেই, সেচ নেই, মমতা নেই। শুধু নেই, আর নেই!

এই চারদিকের নেই নেই এর তাড়নায় মধ্যে যখন আমার অন্তরাত্মা হাঁপিয়ে উঠছিল তখন আমি আমার স্বামীকেই আরও বেশি কাছে পাবাব জন্যে জড়িয়ে ধরতে চাইছিলাম। যতক্ষণ সে অফিসে থাকত ততক্ষণ সময় যেন আমাকে পিষ্ট করে ফেলতো। মিনিটগুলোকে ঘণ্টা আর ঘণ্টাগুলোকে দিন বলে মনে হত। প্রথম প্রথম আমার স্বামী দেড়টায় বাসায় চলে আসতো। টিফিন করে আবার যেতো অফিসে। কাছেই অফিস। কিন্তু আমার স্বামী নির্ভরতা যতই বাড়তে লাগল শাশুড়ির শোষণ এবং 'বারো ভূতের' পরামর্শ ততই তীব্র হতে থাকল। আমি বুঝতে পারলাম সবই। আমি মানসিক ভাবে নির্ভর করতে চাইলাম স্বামীর উপর কিন্তু ফল হল বিপরীত। মা-কে এবং আত্মীয়স্বজনদের তুষ্ট করতে স্বামী দুপুরের নৈকট্যটুকু কেটে দিল। আর সকাল সন্ধ্যায় বাইরের কাজের অছিলায় দূরে চলে যেতো। আমার দুর্ভাগ্য শুরু হয়ে গেল সৌভাগ্য শুরুর আগেই। আমার নামে রটনা হল আমি অত্যন্ত কামুক, সেক্সি! প্রচার হল আমি একমাত্র স্বামীকেই আপন বলে মনে করি অন্য কাউকেই নিজের বলে মনে করি না। বলা হল আমি অহংকারী, আমি জেদী, আমি আত্মসর্বস্ব স্ত্রী! এইসব রটনার পেছনে কারণসমূহ কি তা বোঝার আমার ধৈর্য ছিল না। ধৈর্য ছিল না এই জন্যে যে যাকে নির্ভর করে আমার এই বাড়িতে অধিকার সেই আমার স্বামী আমাকে আশ্রয় দেবার বদলে দূরে ঠেলে দিতে চাইল; আমার প্রতি কোনও আনুগত্য দেখালে পাছে তাকে স্ত্রৈণ বলে ধিক্কার ওঠে তাই সে কঠোর হয়ে উঠলো। স্ত্রীর কাছাকাছি আসাটাকে সে পৌরুষের পতন বলে মনে করতে থাকল। মা তার গর্ভধারিণী জননী, স্ত্রী পরের বাড়ির মেয়ে। আমার স্বামীর এই বিরূপতা, এই অ-স্বামীসুলভ মনোভাব, দায়-দায়িত্বহীন আচরণ আমাকে যার পর নাই বিরক্ত বিব্রত এবং নিঃস্ব করে দিল। পাওয়ার আগেই আমি হারিয়ে ফেলতে থাকলাম।

আমি আমার শাশুড়ির মনোভাবের একটা কারণ খুঁজে পেলাম। বৌ-এর জন্যে ছেলেকে হারানোর ভয়! ছেলে যদি বৌ-এর কথা শোনে তাহলে মা'এর কথা শুনবে না। মা হবেন সর্বহারা, পুত্রহারা। তাই তিনি আঁকড়ে ধরতে চাইলেন তার ছেলেকে। সেই চাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে আনপড় আজন্মগ্রাম্য-মানসিকতার সেই প্রৌঢ়া বউ-এর নামে লাগান-ভাঙ্গানকেই প্রক্রিয়া হিসেবে

পরীক্ষিত পথ বলে ব্যবহার করতে চাইলেন। আর তাঁর যাঁরা স্বজন, তাঁরা সকলেই প্রথম থেকেই রাশ ধরে রাখার পরামর্শ দিলেন। মা-এর প্রতি ছেলের অসীম বাধ্যতা। তাছাড়া ছেলে যদি বিয়ের পরে বৌ-এর স্বাধীনতা, সে যত যুক্তিগ্রাহ্যই হোক্ না কেন, যদি সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিতে উদ্যোগী হয় তা হলে তার অবমূল্যায়ন গ্রাম্য-পরিবেশে অনিবার্য! তাই আমার স্বামী বাধ্য সন্তান হওয়াটা অধিকতর কাম্য বলে মেনে নিল; সে একই সঙ্গে প্রিয় স্বামী হবার মনটিকে খুঁজে পেল না।

অথচ তোকে না বলে পারছি না তাপসী, প্রথম থেকেই স্বামীগৃহে মহিলা বলতে পেলাম আমার শাশুড়িকেই তো? সদ্য মাকে ছেড়ে গেছি, তারপরেই হারিয়েছি। তাই আমি তো আমার সব পণ করে সেই মাকেই মা করে নিতে চেয়েছিলাম। সব কাজে সব সময়েই তার কাছে কাছে, হাতে হাতে চলেছি। কিন্তু ক'এক মাস যেতে না যেতেই তাঁর এই পরিবর্তন আমাকে অবাক করে দিল। দিনের বেলায় ছেলেকে খেতে দেওয়া, স্নানের সময় তেল-তোয়ালে এগিয়ে দেওয়া, অফিস যাবার সময় ব্যাগ এগিয়ে দেওয়া, রুমালের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া — এসব কাজ তো স্বাভাবিকভাবেই আমার এলাকায় চলে আসার কথা ছিল। কিন্তু হল না। আমার বলে যে সব কাজ সমাজ-প্রকৃতি নির্ধারিত সে সব কাজ অবলীলায় শাশুড়ি করে যেতেন। অনধিকারচর্চা নয়? স্বামীকে যখন বলতে গেছি, আমার জন্যে কিছু কিছু কাজ চাইতে গেছি, তখনই স্বামী আমাকে সেবা ধর্ম বিষয় ছোট-বড় ভাষণ দিতো। বাবা অসুস্থ, তার সেবা করা গৃহবধূর যে সর্বক্ষণের কাজ তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতো; বয়স্ক মায়ের সেবাযত্ন, আত্মীয় স্বজন এলে-গেলে আমার ইতি-কর্তব্য, এবং গৃহপরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আমার করণীয় বিষয় নিয়ে তার অর্নগল বক্তব্য ঘুমের আগে আমার 'সিডেটিভ' হিসেবে অবশ্য সেব্য ছিল। আমার স্বামী আমার শরীরকে চিনতে যত চেষ্টা করেছে তার শতাংশের এক অংশও আমার মনের চেহারা নিয়ে, প্রতিক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয় নি। আমাদের অবশিষ্ট নিশীথ-নৈকট্য তাঁর প্রগাঢ় ঘুমে আর আমার বিনিদ্র চোখের সজল সেচনে কেটে যেতো।

আত্মধিক্কার! স্বামীব আহ্নিক গতিতে যদি স্ত্রীর বিনিদ্র-রজনী কোনও রেখাপাতই না করে, স্ত্রীর অস্তিত্ব যদি স্বামীর কাছে কষাই-এর শবব্যবচ্ছেদের সত্য বলে পরিগণিত হয়, আর মায়ের আঁচল ছেড়ে যদি সন্তান বেরিয়ে এসে স্বামীর স্বাধীন-স্বতন্ত্র সত্তায় নিজেকে খুঁজে না পায়, তাহলে স্ত্রী হিসেবে আমার আত্মধিক্কার অবশ্যই তুই ধিক্কার দিবি না! এবং আমার ভেতরটা যতই ধিক্কৃত বোধ করতে লাগল আমাদের মধ্যে ততই বিরূপতা সৃষ্টি হতে থাকল। যখন ভালবাসার জন্যে অঞ্জলি পাতি তখন পরিবর্তে পাই ভাল-ভাষণ। যখন ছোট-বড় অবিচার উল্লেখ করে সহানুভূতি চাই তখন বদলে জুটতে লাগল অসহযোগ। আর তার পরে, উত্তেজিত হয়ে বিচার চাইলে পেতাম পৌরুষের দৃপ্ত প্রকাশ বা প্রকাশ-প্রতিজ্ঞা!

গৃহ অশান্তির এই ধিকি-ধিকি আগুনে ইন্ধনের অভাব হল না। একটি উপদেষ্টামণ্ডলী ধীরে ধীরে বেশ পুষ্ট হয়েই গড়ে উঠলো। আমার দুই মামি শাশুড়ি, এক মামা-শ্বশুর এবং তস্য তনয় যিনি পেশায় ডাক্তার, সম্পর্কে ভাই, আমার স্বামীর মামাতো ভাই এবং বন্ধুও। পুরুষপ্রধান সমাজে পুরুষ উপদেষ্টাদের প্রধান কাজ ছিল আমার তৈরি চা খেয়ে আমার দাঁতের গোড়া ভাঙ্গার ব্যবস্থা! আর মহিলা সদস্যদের কাজ ছিল বেশ জটিল প্রকৃতির। তারা কুশলতার সঙ্গে আমার শাশুড়িকে কঠোর হওয়া বিষয়ে, সংসার বিষয়ে এবং পুত্র-না-হারানোর বিষয়ে যথোপযুক্ত উপদেশাদি সকাল দুপুর সন্ধ্যা দিয়ে যেতেন। অবশ্যই উষ্ণ পানীয় এবং আনুসঙ্গিক ভোগ্যসহ। আর, ভুলতেন না, আমার প্রতি তাঁদের দায়। আমাকেও শতবার উপদেশামৃত পান করিয়ে যেতেন, শ্বশুরের সেবা, শাশুড়ির সেবা এবং স্বামীর প্রতি কর্তব্য বিষয়ে। প্রথম পাতে (এ ক্ষেত্রে জীবনে) তেতো খায় লোকে সামনের

প্রাপ্যকে অধিকতর মিষ্টি করে পাবার আশায়, সংসার পাকস্থলীর জারক-রসের প্রস্রবণ মুখটি স্বাভাবিক করে পাবার আশায়। হায় আমার কপাল! আমার জন্যে তেতোর ব্যবস্থাটাই পাকা হল, মিষ্ট সমাপন দূরে অস্ত গেল।

অসুস্থ শ্বশুরের একান্ত সেবা করছি, শাশুড়ির সব ফুট-ফরমাস টান্-টান্ করে চলেছি। আত্মীয় স্বজন এলে বিশ্রাম ত্যাগ করে তাদের সেবায় অক্লান্ত হয়ে চঞ্চল হচ্ছি। কিন্তু দিনান্ত নৈকট্যে আমার স্বামীর কাছে আমার দিনমানের ভুলভ্রান্তি সমূহের একটি তালিকা মুখস্থ আবৃত্তির মতো, আমার কানে গরম সিসের মতো ভারি এবং জ্বালাময় বলে মনে হতো! মনে হতো ঈশ্বর কি এই ব্যক্তির মাথায় ঘিলু বলে কোনও পদার্থই দেন নি? কখনই কি এই 'অবতার' চরিত্রটি তার স্ত্রীর বিষয়ে সত্যটুকুও ভাববার কথা ভেবে পায় না? কোনও second thought ? জননীর বাণী তো বেদ-নয়, অপৌরুষেয় নয়, অনিবার্য সত্যও না হতে পারে? না, এ-সব ভাবে যারা কুপুত্র, যারা logician অথবা logician এর পুত্র কন্যা!

কপালে করাঘাত করা নাকি আমার বাবার জ্যেঠিমাব স্বভাব ছিল। শুনেছি তা মনোবিজ্ঞানে masochism নামে পরিচিত। আমি সে-পথের পথিক নই। আমি গান্ধীবাদীও নই। দ্বিতীয় গাল এগিয়ে দেওয়া আমার প্রকৃতিতে নেই। সুতরাং? অয়মারম্ভম্ অ-শুভায় ভবতু—শুরু হয়ে গেল!

আমাকে আমার মায়ের মৃত্যুর জন্যে ওরা অশুভ বলেছে। আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে বাপের বাড়িতে পাঠাবে না বলেছে। আমাকে আঘাত দিতে আমার অতীত বিষয়ে অনেক অশালীন প্রশ্ন করেছে। আমার কলেজ জীবন, কলেজের বন্ধুবান্ধব এবং গঙ্গার ধার! চিঠিপত্র, প্রেম, ভালবাসা। কেন তবে ফুলের মতো নিষ্পাপ একটি জীবনে আমাকে জুড়ে দেওয়া হল? আমার স্বামী ফুলের মতো নিষ্পাপ, কুসুমের মতো কোমলহৃদয়, শিশুর মতো মাতৃবৎসল, প্রহ্লাদের মতো ঈশ্বরভক্ত এবং ইত্যাদি। সেই ছেলের জীবনে আমার মতো নাস্তিক, একবোখা, মাতৃহন্তা এবং কামুক স্ত্রী অযোগ্য অবাঞ্ছিত, অশুভ! রক্তের মধ্যে যে লোহিত কণিকারা ছলছলাৎ চলাচল করে তারা তো অপরের দেহ থেকে সেই লোহিত কণিকাদের বাইরে বার করেও আনতে পারে! আমার ওজন প্রায় ষাট কিলোগ্রাম, আর আমার স্বামীর পঞ্চাশ হবে! তাহলে? যা পরিণতি হতে লাগল তা অতীতের দৃষ্টিতে বিপ্লব, অভাবিত। স্বামী মার খেয়ে আত্মসম্মানে টোল খাওয়াতো এবং ঘনিষ্ঠজনের কাছে নালিশও করেছে শুনেছি।

তাই বলে তুই যেন মনে করিস না এটা আমাদের রোজকার ব্যাপার ছিল। মারামারিটাও যদি জান্তব ক্রোধের প্রকাশ, লুটোপুটিটাও তো তা হলে কম জান্তব নয়! কিন্তু আমার জীবনে মরুভূমির প্রসার ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। 'ওয়েসিস' — মরুদ্যান — কখনও সখনও দেখা দিত। এই গরল প্রধান বৈবাহিক জীবনেই আমি একদিন ঘুমের বড়ি খেয়ে নিলাম। একেবারেই ছুটি চাইলাম! আত্মযাতনার হাত থেকে মুক্তির জন্যে এই পথ আমার স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। শ্বশুর-এর জন্যে ঘরে বড়ি কেনাই থাকত।

কিন্তু আমার মরা হল না। ওরা বাঁচিয়ে দিল। সেই সময়ে আমি প্রথমবার শারীরিক মৃত্যু-চেষ্টা করে ছিলাম। পারি নি। এবারে আমি মানসিক আত্মহত্যা করে গেলাম। কেউ আমাকে বাঁচাতে পারল না।

এই চিঠির প্রথমেই তোকে বলেছি যে উত্তর আমি চাই না। এই চিঠি আমার জন্যে cathartic. আগে বলেছি স্বীকারোক্তি। দুটোই সত্যি। মনের গভীরে যে বেদনাবোধ গুমরিয়ে ফেরে, যে লজ্জাবোধ কখনই মনের পেছন ছাড়তে চায় না, যে জীবন দেয় না কিছুই শুধু কেড়েই

নেয় তাকে নিয়ে, তাদের নিয়েই তো আমার বর্তমানের দাবদাহ, অনুশোচনার অন্তর্দাহ। তারই কিছু কিছু আমি তোকে লিখে জানাচ্ছি। বলতে পারিস্ লিখে জানাচ্ছি আমার মধ্যেকার সেই আমিকে যাকে আমি চিনতাম, তুই জানতিস্ এবং যে আমি আমার অতীতের আমি। এমনও হতে পারে আমার যে আমিটা আমার বর্তমানের হওয়া উচিত ছিল সেই আমির কাছে এই এখনকার অনাকাঙ্ক্ষিত আমির চোখের জলে লেখা এই চিঠি!

যাক্ আবার ফেরা যাক্ পুরোনো কথায়। তোকে আমাদের যৌথ জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলেছি। বলেছি একদিনের ভূমিকম্পের কথা, যেদিন আমি জীবনের অর্থহীনতার উত্তর খুঁজেছিলাম ঘুমের বড়ির মধ্যে। ওরা সবাই মিলে আমার বাঁচার সব স্বাভাবিক পথগুলোকে এক এক করে নিষেধের বাঁধ দিয়ে দিয়ে যখন মনের মধ্যে একটা অসীম লবণাক্ত সাগর বানিয়ে ফেলল তখনও আমার স্বামীর মধ্যে কোনও চেতনা দেখা দিল না। গৃহ-উৎপাটিত মাতৃহারা বিদেশ বিভূঁই-এ সমূল প্রোথিত এই যে আমি তার যে ওদের সংসারে, স্বামীর জীবনে বেড়ে ওঠার জন্যে হৃদয়ের তাপ, মনের স্নেহসিঞ্চন এবং চিন্তাভবনার পরিপোষণ দরকার তা ওদের কারো মনে মাথায় এলো না। একটা পাথরখণ্ডকে ছেনী-হাতুড়ির ক্রমবিন্যস্ত আঘাতে-ছেদনে ওরা আমাকে ওদের প্রয়োজনের মতো করে কেটে ছেঁটে নিতে চাইল। পাথর হয়ে যে কেন জন্মাই নি সেই খেদ তখন মনে বার বার উঁকি দিয়েছে। রক্তমাংসে গড়া এই মন-বুদ্ধি-বিচার সম্পন্ন জীবনটাই আমার কাল হল। অন্যান্যদের হৃদয়হীন অস্ত্র-উপচারে আমার কোনও বেদনাবোধ থাকত না যদি আমার স্বামী আমার সমস্যাটিকে উপলব্ধি করতে পারতো, যদি একটু সহানুভূতি, একটু ভালবাসার ছোঁয়া দিয়ে আমার জীবনের স্টিয়ারিং-এ বসে চালনা করত। অবশ্য সে তার মতো স্টিয়ারিং-এই ছিল। শুধু তার পথটি দৃষ্টিটি এবং কৌশলটিই ছিল সপ্তদশ শতকের যোগ্য! ওরা যদি গ্রাম থেকে একটা রক্ত মাংসের জ্যান্ত কাপড়-জামার পুটুলি বিয়ে করে আনতো তাহলে ওদের কোনও দুঃখ থাকত না, যাকে আনা হত তারও সম্ভবত কোনও অনুভব-বিস্ফোরণ ঘটত না! ওরা বেছে বেছে শিক্ষা-সংস্কৃতির পটভূমি, বিজ্ঞানের সাম্মানিক স্নাতক এবং শহরের পরিবেশে লালিত পালিত একটি তাজা প্রাণ মেয়েকে ঘরের বৌ করে নিয়ে গিয়ে তাকে কেটে ছেঁটে নিজেদের মাপে তৈরি করে নিতে গেল! সর্বনাশের শুরু এই এখানেই।

ওরা বোধহয় ভয় পেয়ে গেছিল। ভয় পেয়েছিল পুলিশের, আইনের এবং আমার বাবার অর্থ, বুদ্ধি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার। তাই ওরা সচেষ্ট হল আমাকে সহজ স্বাভাবিক জীবনে টেনে নেবার। এটা ছিল ওদের উপর উপর লোকদেখানো ভালমানুষী। আমার শাশুড়ি এবং অবশ্যই তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী, সকলের চোখের আড়ালে তাদের অস্ত্রে শান্ দিতে সচেষ্ট ছিলেন। এটা বুঝেছি অনেক পরে অনেক মূল্য দিয়ে। আমার স্বামী? তার মনের কথা আমি জানতে পারি নি। সে নিজেই জানে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। স্বজনসমাজে ভালমানুষ বলে পরিচিত হতে একটা স্বল্পবাক্, শান্ত-স্বভাব টান্ টান্ ধরা থাকে। সেই মুখোশখানা পাছে খসে পড়ে তাই আত্মীয়স্বজনদের কথামতো কাজও করে; তারা মনে করে আমাদের ছেলে যেমন ছিল ঠিক তেমনটিই আছে! কুমার জীবন আর বিবাহিত জীবনে যে গুণগত প্রভেদ আছে সেটা আমার স্বামী তাই বুঝে থাকলেও প্রকাশে কখনও প্রতিষ্ঠা দিতে পারে নি। অন্যদিকে তার মা! তার মায়ের আঁচলখানা সে আরও জোর করে চেপে ধরল এটা প্রমাণ করার জন্যে যে মা-ছাড়া তার আর কেউ সত্য নয়, মা-ঐব কেবলম্! তাহলে ছাদনাতলায় গেলে কেন? মা-এর জন্যে বৌ এনে দিতে। মুখে একাধিকবারই বলেছে স্ত্রী হচ্ছে পরিবারের, আত্মীয়স্বজনদের, এবং সব শেষে স্বামীর। যারা বিপরীত-ক্রমে সত্য খোঁজে তারা বিপথগামী!

এর ফলে আমি স্বামী পেয়েও স্বামীর মানসিক নৈকট্য পেলাম না, প্রতিরক্ষা পেলাম না, মন পেলাম না। আর ওরা বৌ পেলেও আমাকে পেল না! এই অবস্থায় যে টানাপোড়েন, যে tension যে বিরোধ তা ধিকি ধিকি জ্বলতেই লাগল। এই মানসিক যাতনা থেকে ছুটি পাবার জন্যে অনেক চেষ্টায় কাশ্মীর যাবার পরিকল্পনা করলাম। গেলাম। ফিরেও এলাম। কিন্তু মানসিকতার বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন কোথায়ও ঘটল না। কেবলমাত্র দুটি লাভ হল। এক অর্থক্ষয়, দুই সন্তান সম্ভাবনা সঙ্গে নিয়ে ফিরলাম অথবা বলা যায় আমার মিত্র অথবা শত্রু — ক্রমশ প্রকাশ্যকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

এই অঙ্কুরোদ্গমের দিনগুলো আমি একেবারেই ভুলতে পারি না। একদিকে স্বামী আমার যত্ন নিতে চায়, বিকেলগুলো ডাক্তারের নির্দেশে বেড়ানোয় কাটে, অনেক কথা বলার সুযোগ পাই। অন্যদিকে শাশুড়ি এবং পরিজনদের সংস্কার আর কুসংস্কার মিলে আমার সকাল-দুপুর-বিকেলগুলো নাস্তানাবুদ হতে থাকে। আমার শরীরের মধ্যে আর একটা প্রাণ যেমন প্রথম প্রথম আমার প্রানান্ত অস্বস্তির কারণ হয়ে বেড়ে উঠছিল, তেমনই আত্মীয়-পরিজনরা সবাই মিলে আমাকে অশান্তিতে রাখবার চেষ্টা করেই চলেছিল। ওদের মনে বোধ হয় ভয় আরও বেশি হয়ে উঠছিল। যদি আমার স্বামী এবারে তার মা ও স্ত্রীর দ্বন্দ্বের মধ্যে না থেকে সন্তানের আর্কষণে স্ত্রীরূপী 'জননী'-কে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলে? আমি আর শুধুমাত্র স্ত্রী নই, ঘরের বউমাত্র নই; আমি মা হতে চলেছি? সকলে মিলে শাশুড়িকে মাধ্যম করে একদিকে আমার চারধারে অসংখ্য গণ্ডি টানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর অন্যদিকে তাদের সন্তানকে, আমার স্বামীকে, তার করণীয়-অকরণীয় বিষয়ে নির্দেশ দিতে থাকল। ফলে আমার বাইরে বেড়ানো বন্ধ হয়ে গেল, আমার স্বামী নৈকট্য আবার ঘুচতে বসল। মাতৃবৎসল পুত্র 'অশূচী' আমার নৈকট্যটুকু বাতিল করে দিতে থাকল! যে প্রীতিপূর্ণ উজ্জ্বল ভালবাসার সূর্যতাপ স্বাভাবিক ভাবেই আমার জীবনে আলো ফেলতে শুরু করেছিল সেই আকাশে ক্রমশ মেঘের আনাগোনা এবং শেষকালে ঝড়ের সংকেত দেখা দিল। আবার সংঘাত! ছেলে 'ভাল-ছেলে' মাতৃবৎসল ছেলে হতে গিয়ে আবার পুনর্মূষিক হল। আমাদের মধ্যে আবার ঝগড়া, মতভেদ এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শুরু হতে দেরি হল না।

আগের সব tense মুহূর্তগুলোকে ওরা আরও তীব্র করে তুলেছিল। আমার নির্ভরতাকে ওরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে টিকা-টিপ্পনীতে কাতর করে ফেলছিল, আর যত আমি আমার বাড়ি, আমার বাবা আমার ফেলে আসা পরিবেশের কথা মনে করছিলাম ওরা ততই আমাকে নির্যাতনের চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ক্রমশই আমার স্বামীগৃহ আমার কাছে শত্রু পুরী বলে মনে হচ্ছিল। ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি চিৎকার চেঁচামেচি সবই বেড়ে যেতে দেরি হল না। বাবাকে আমি কিছু কছু জানালাম। তিনি ছুটে এলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। ইতিকর্তব্য বিষয়ে পথনির্দেশ করলেন এবং একখানা বই আমাকে পড়তে দিয়ে গেলেন। বলে এলেন শ্বশুরমশাই-এর সাহায্য নিয়ে বইটা পড়তে এবং প্রয়োজনীয় জায়গাগুলো বাংলা করে বুঝে নিতে; বলে এলেন যাতে আমার শাশুড়িও জানতে পারেন। ফল হল বিপরীত! "বই পড়ে জানে মূর্খরা; বেশি পড়লে লোক বেশি মূর্খ হয়ে যায়। প্রসব করতে বই পড়তে হয় না। বই-এর তুলনায় মা-মাসিরা অনেক বেশি জানে......" বাবাকে এবং আমাকেও লেখাপড়া নিয়ে কটু-কাটব্য করতে ওদের আটকালো না। ঘাত-প্রতিঘাত, চাপান-উতোর বাক্-বিতণ্ডা বাড়তে বাড়তে মাঝে মাঝেই এবারে বিস্ফোরণ হতে দেরি হল না। আমার স্বামী এবারে আমাকে পথে আনার জন্যে, আমার শাশুড়ি আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। আমার জেদ এবং তীব্রতাও সেই পরিমাণে বাড়তে লাগল। অসহনীয় অবস্থা। আশেপাশের লোকেরা এবারে আমাদের ভিতরের খবরাখবর জানতে পারছেন। জানলার ধারে

দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীরা আমাদের ঝগড়া, মারামারি শুনে এবং দেখে যাচ্ছেন। ঘরের মধ্যে এক বৃদ্ধ, অসুস্থ, পঙ্গু, অসহায়। তাকে উত্তেজিত করে তোলার সব রকমের প্রচেষ্টাই ওরা প্রতিনিয়ত করে চলেছে। সেই বৃদ্ধকে আমি অক্লান্ত সেবা দিয়েছি, নৈকট্য দিয়েছি, সন্তানের মমতায় তাকে যত্ন করেছি। ক্রমশ সে সবই অপব্যাখ্যায় বিলীন হয়ে যেতে বসেছে। স্বামীগৃহ আমার কাছে একেবারেই শত্রুপুরী হয়ে দাঁড়াল।

এই সময়েই আমার স্বামী আমার বাবাকে চিঠি লিখলো। Telegram মনে করে চলে আসতে লিখেছে। বাবা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। তাঁর কাছে মন খুলে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করলো। সকলেই। আমার স্বামী, আমার শাশুড়ি, এবং তাঁর স্বজনেরা। বাবা আমার কাছে সব জানতে চাইলেন। তার পরে এক এক করে আমার স্বামীকে প্রশ্ন করতেই ঝোলার মধ্য থেকে বিড়াল নয়, সাপ বেরিয়ে পড়ার অবস্থা হল। স্বামী উত্তর না দিয়ে উত্তেজনা দেখালো। অনেক জল ঘোলা হল। কাজ কিছুই হল না। তিক্ততা আরও বেড়ে গেল মাত্র।

তাপসী তুই ভাবতে পারবি না বিংশ শতাব্দীর এই শেষদিকে এইসব লোকের মনে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ধ্যান ধারণা অনায়াসেই তাদের 'আধুনিক' মনের ঠিক ছায়াটিতেই ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ির কথা বলতে চাই না; তাঁরা পুরোনো দিনের মানুষ। বার্ধক্যের জড়ত্ব তাদের নামাবলি হলেও আমার বলার কিছুই নেই। কিন্তু আমার স্বামী? বিদ্যালয়ের শিক্ষা তার বেশ ভাল স্কুলেই, কলেজের শিক্ষা কলকাতায়। তুই ভাবতে পারিস্ তাপসী, বিজ্ঞানের স্নাতক হয়েও আমার মুখে অনুসন্ধানের প্রশ্ন শুনলেই তার পৌরুষে ঘা পড়তে থাকে! যুক্তি-তর্ক এবং বিশ্লেষণ তার কাছে anathema ,বিষতুল্য পরিত্যাজ্য! ব্যক্তি স্বাধীনতায় সে অত্যন্ত বিশ্বাসী যতক্ষণ ব্যক্তি বলতে পুরুষকে বোঝায়, যাকে বোঝায়! স্ত্রী কোনও ব্যক্তি নয়! স্ত্রীর স্বাধীন চেতনা, বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণ তাই আমার স্বামীর অপছন্দ। শুধু অপছন্দ হলে কথা ছিল না। দৃঢ় কণ্ঠে, সম্ভাব্য ফলাফলের উল্লেখ করে মত-প্রকাশ রুদ্ধ করাই তার সর্বক্ষণের প্রচেষ্টা।

তবেই বোঝ, আমি যখন খাঁচায় বন্দি, বঞ্চিত, অত্যাচারিত এবং ক্রীতদাসীর জীবন যাপন করতে নির্দেশিত তখন আমার দেহখাঁচায় আর একটি প্রাণী ধীরে ধীরে এই পৃথিবীতে প্রবেশের জন্যে আঁকুপাঁকু করছে। যখন জীবনে সবথেকে শান্তি, tension free সুখী এবং আনন্দের বাতাবরণ দরকার তখনই আমার জীবনে ঘোর অমাবস্যার কালো ছায়া ঘিরে ফেলল! অনির্বচনীয় এই দুঃখের মধ্যে একমাত্র ওয়েসিস আমার বাবার চিঠিগুলো আর মাঝে মাঝে তার উপস্থিতি। তিনি যথেষ্ট কাঙ্ক্ষিত নয়, অপেক্ষিতও নয়। তা সত্ত্বেও তিনি আসতেন, চিঠি দিতেন আমাকে শান্তি দিতে, আনন্দ দিতে আর মনের দিক থেকে মা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত করতে।

এই সময়ে অনেক শলাপরামর্শ টের পেতাম, বুঝতে পারতাম। আমি অবশ্যই সে সব পরামর্শের স্থানে এবং কালে অপাংক্তেয়, অপ্রয়োজনীয়। আত্মীয়-স্বজন (?) আমার বিষয়ে, আমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। সন্তান কোথায় হবে? এই প্রশ্নে আর্থিক এবং শারীরিক দায়-দায়িত্ব প্রধান হয়ে দেখা দিত। এই সব আত্মীয় স্বজনদের সার্থক পরামর্শেই স্থির হল যে আমাকে বাপের বাড়িতেই পাঠান হবে। টাকা বাঁচবে, অকারণ ঝুঁকি থাকবে না এবং শেষ দিকে একেবারে কর্মে-অক্ষম একটি স্ত্রীকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়া-পরা এবং তোয়াজের হাত থেকে সকলেই পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু আমার স্বামী এবং শ্বশুর মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। দায়-দায়িত্ব আমাদের, তাছাড়া আমার বাপের বাড়িতে মা নেই, কোনও মহিলাই নেই। এটা এদের মনে বিবেক দংশনের মতো ঠেকছিল হয়তো। কাকিমা-মাসিমা-পিসিমাদের কাউকে আনিয়ে নিলেই হবে। আর তাছাড়া

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে আমার ভাল বা আমার বাপের বাড়ির দিক দেখার চাইতে যে ওদের সকলের স্বস্তি অনেক বেশি মূল্যবান, অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত তা বোঝাতে আত্মীয়-স্বজনদের বেশি বেগ পেতে হয় নি। কারণ এই সংসারের যাবতীয় সিদ্ধান্তই বাইরে থেকে শাশুড়ির মাধ্যমে সহজেই আরোপিত!

তুই হয়তো এতক্ষণ বহুবারই বিরক্ত হয়ে উঠেছিস। ঠিক না তাপসী? কিন্তু তুই যদি নাও পড়িস, তা হলেও তো আমাকে লিখতেই হবে। আমার মনের জ্বালা আর যন্ত্রণাকে আমি প্রকাশ না করতে পারলে তো পাগল হয়ে যাব! তাই তুই যদি পড়িস্ তা হলে সেটা হবে আমার উপরি পাওনা, অধিকন্তু লাভ।

ওঁরা আমার বাবাকে ডেকে আনলেন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। ভেবে দেখ তাপসী ওঁরা, বিশেষ করে আমার স্বামী তো পৌঁছে দিয়ে আসতে পারতো। তা আমার বাবা নির্দেশিত দিনেই হাজির হলেন। কিন্তু ওঁরা সেই দিন আমাকে পাঠালেন না। ওঁরা আগেই জানতেন যে সেই দিন আমাকে ওঁরা পাঠাবেন না। আমার অনুরোধ সত্ত্বেও সেই খবরটি ওঁরা বাবাকে জানালেন না। আমার প্রায় ষাট বছরের বাবা এলেন, জানলেন সবই, কিন্তু কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করেই চলে গেলেন। বাবাকে বলে দেওয়া হল দিনস্থির করে পত্র দিলে যেন এসে নিয়ে যান্! বাবা তাতেও তথাস্তু বলে চলে গেলেন। আমি যে তার কন্যা! তার উপর মা নেই।

আমার বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ির মধ্যে ক'একশ মাইলের ব্যবধান। এটা মনে রাখলে বুঝতে সুবিধা হবে যে কী অপরিসীম কষ্ট এবং যন্ত্রণার কারণ হয় এ ধরনের সিদ্ধান্তহীনতা বা তুঘলকী আচরণ। কিন্তু ছোট-বড় কারোই এই হেনস্থার জন্যে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা প্রকাশ পেতে দেখিনি। বরং মেয়ের বাবাদের যে আরও কতো বেশি কষ্ট এবং যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় মেয়ের শ্বশুর বাড়ি থেকে তার নাতিদীর্ঘ বিবরণী সহ জানান হতে লাগল যে আমার in-law-এরা অত্যন্ত ভদ্র এবং শালীন বলে আমার বাবাকে অনেক কম কষ্ট এবং যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। এ-সব 'বিচার' শুনে আমার মনের অবস্থা তুই সহজেই অনুমান করতে পারবি। তাছাড়া এই বাইরের লোকের মাতব্বরি আমার একেবারেই পছন্দ নয়, দেখিও নি আমার বাপের বাড়িতে। আমার স্বামী আমার চোখে ক্রমশই ছোট হয়ে যেতে লাগলো। এবং সেও আমার উপর অত্যন্ত কঠোর হতে উঠে পড়ে লাগল। এর ফলে অবস্থা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছিল। জটিল হচ্ছিল আমার পেটের মধ্যেও! অনেক কথা কাটাকাটির পর স্থির হল আমাকে বাপের বাড়িতেই পাঠান হবে। আমার স্বামীর প্রধান যুক্তি কি ছিল শুনলে তুই হাসবি না কাঁদবি তা সহজে ঠাহর করতে পারবি না। ছেলে তার মায়ের কথা 'বমি' করে জানাল যে সেই জননী অনভিজ্ঞ, কিছুই বোঝেন না তাই বাপের বাড়িতে যাওয়াই বিধেয়! দুই সন্তানের গর্ভধারিণী অনভিজ্ঞ। অজ্ঞান অবস্থায় নাকি তার 'হয়ে' গেছে, এবং আরও কতো কথা যা প্রকাশ করে বলা যায় না। তাই প্রসবে অভিজ্ঞ(!) আমার বাবার হেফাজতে পাঠানোটা নাকি সঠিক সিদ্ধান্তই হয়েছিল। আমি টাকার এবং দায়-দায়িত্বের খোটা দিতেই স্বামীর পৌরুষে আঘাত লেগে গেল। সে তার বাবার সঙ্গে কথা বলল। সিদ্ধান্ত হল বাপের বাড়িতে নয়, শ্বশুরবাড়িতেই আমার মা 'হওয়াটা' হবে। যাক নিশ্চিন্ত হলাম।

পিতাপুত্রের যৌথ সিদ্ধান্ত যে শাশুড়িকে সন্তুষ্ট করে নি তা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তিনি যে স্বামী-পুত্রের বিরুদ্ধে তলে তলে ঘুটি চালাচালি করবেন তা বুঝিন। কিছুদিনের নিশ্চিন্ততা এবং শান্তির বাতাবরণ উপভোগ করতে না করতেই বুঝলাম আমার শাশুড়ি সফল হতে চলেছেন। ছেলের কাছে কাঁদুনি ছাড়াও মারণ-উচাটন, তাগা-তাবিজ, জল-পড়া পান-পড়া, আত্মীয়-স্বজন করে করে অবস্থা আবার এমন করে তুললেন যে শ্বশুর হাল ছেড়ে দিলেন।

(কোনও দিনই তিনি হালে ছিলেন বলে শুনি নি) এবং ছেলে আবার বিরূপ কর্কশ রূঢ় ব্যবহার শুরু করে দিল। অবস্থা একদিন চরমে পৌছলো। শাশুড়িই করালেন। কিন্তু ছেলে তা বুঝলো না। আমার গায়ে হাত তুলতে চাইল, আমাকে ঘরে বন্ধ করে শাস্তি দিতে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ফলে জানালা-দর্শীরা পাড়ায় ছড়িয়ে দিল ঘটনা। জড়ো হল পঞ্চাশ-ষাট জন তরুণ যুবক। কেন? কেন এমন হবে?

ওদের রোষ থেকে আমার স্বামীকে আমি বাঁচালাম। কিন্তু কৃতজ্ঞতার বদলে ওরা দীর্ঘ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। সে এক দীর্ঘ চক্রান্তের ইতিহাস। দুই মামা, দুই মামি এক ভাই-রূপ বন্ধু মিলে অনেক সুতো টানাটানি চলল, অনেক উপাখ্যান বহু চাতুরী। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা জানছেন সবই কিন্তু ধারে আসছেন না। এবং এই পর্বের শেষে একদিন আমার স্বামী আমাকে আমার বাপের বাড়িতে পৌছে দিয়ে গেল। কেন? কারণ আমাকে কেন্দ্র করে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ তুলে পাড়ার ছেলেরা নাকি তক্কে তক্কে আছে। তাই ওখানে দাঙ্গার সম্ভাবনা, ওখানে কোনও ডাক্তার, কোনও নার্সিং হোম আমাকে নেবে না, কেনও সাহায্য পাওয়া যাবে না, ইত্যাদি প্রভৃতি করে আমাকে বোঝানো হল। এবং এই বোঝানোর জন্যে দীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুললো প্রায় নিখুঁত অভিনয় করে করে। দুজনেই। মাতা-পুত্র উভয়েই।

তাপসী একবার ভেবে দেখ প্রসব পূর্ব দুমাস এবং তার পরে প্রায় পাঁচ মাস আমি আমার বাবার আস্তানায়। কী অসীম যত্নে, তত্ত্বাবধানে এবং মনোযোগ দিয়ে বাবা যে সেই প্রাথমিক দুই মাস এবং পরের দীর্ঘ মাসগুলো আমাকে লালন করেছেন, আমার সন্তানকে পালন করেছেন তার দিন-রাত্রির সচেতন সাক্ষী তো আমি নিজে। এতটুকু আনন্দের জন্যে, এতটুকু শান্তির জন্য আমার বাবা কীই না করেছেন। পান থেকে চুন খসলেই ছুটে এসেছেন, ছুটোছুটি করেছেন। বই পড়ে, গল্প করে, হাসি আর আড্ডায় আমার প্রাক্-প্রসব দিনগুলোকে আকণ্ঠ ভরিয়ে রেখেছেন। সে সব কথা ভোলবার নয়। আমার কষ্টের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, বই থেকে আমাকে পড়তে দিয়েছেন, কখনও পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার সব কষ্টের সকল বেদনার আঘাত-বেদনাকে কোমল হাতে প্রলেপ দিয়েছেন।

সেই সময়ে এবং তার পরে বাবার জীবনে অনেক আঘাত অনেক সংগ্রাম। সে সবের আমি প্রত্যক্ষ এবং সচেতন সাক্ষী। আমার বাবা অত্যন্ত কর্তব্যসচেতন, কঠোর-কঠিন কর্মী। অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণী তার মস্তিষ্ক। তিনি কোনও কিছুকেই বাদ দিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত নন। সঙ্গীহীন, জীবন-সাথী বঞ্চিত আমার বাবাকে মাঝে মাঝেই আমার কেমন যেন পাথর বলে মনে হত। হতাশা তার জীবনে ছায়া ফেলতে পারে না। প্রচেষ্টায় যে সাফল্য অনিবার্য এই বিশ্বাসই তার জীবনের মন্ত্র। বাবার জন্যে আমাদের অনেক গর্ব, অনেক শ্রদ্ধা অনেক ভক্তি।

কিন্তু আমার জেদ? আমার অহংকার? আমার অভিমান? এরাই আমাকে অমানুষ করে দেয়। আমি বল্গাহীন হয়ে পড়ি। এবং সম্ভবতঃ আমার অবচেতন, অবচেতনের conflicts, repression, urges!

এই প্রসঙ্গে পুরোনো কথা কিছু বলে নিলে ভাল হয়। বিয়ের পরে পরেই যদি প্রথম কোনও স্বামী তার স্ত্রীর অতীত নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, অতীতের মেলামেশা, ভাবভালোবাসা, চিঠি-পত্রে ভাল লাগা মন্দ লাগার post mortem করে? স্বামী-স্ত্রী, ৩০/২৩, স্কুল কলেজ এবং পাড়া প্রতিবেশী কাছে-দূরের স্বজন পরিজন, দীর্ঘ প্রাক-বিবাহ জীবন যাত্রা। সেই অতীতে ভাল লাগা ভাব ভালবাসা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, বরং peer group এর মধ্যে স্বাভাবিকই। কিন্তু কোনও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামী যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই অতীত জীবনের দিন মাস বছরের হিসেব নিতে

থাকে তা হলে তার সেই মানসিকতাকে কি স্বাভাবিক বলা চলে? যে দুটি অপরিচিত ব্যক্তি সদ্য দ্বৈত জীবন যাত্রায় পথিক তাদের adjustment-এর জন্যে তো বর্তমানটাই প্রধান। সেই বর্তমানকে সঞ্জীবিত করার জন্য যে পরিবেশ প্রতিস্থাপন সেই প্রচেষ্টায় কিছু অতীত এবং কিছু ভবিষ্যতের কল্পনাই তো আসল হবার কথা। চাতকের দৃষ্টিতে আকাশে তাকান আর কাক্-শকুনের দৃষ্টিতে অতীতের অন্বেষণ তো এক কথা নয়। আমি অনেক অতীতের কথাই তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছি, অনেক বলা হয় নি। বলা হয় নি লুকোনোর জন্যে নয়, সব বলা সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয়ও নয় বলে। কিন্তু আমার স্বামীর মনে যে পুলিশের সন্দেহ ছিল, সে যে আমার কোনও বিশেষ অতীত নিয়েই মাত্র ব্যগ্র ছিল। তাই সোজাসুজি প্রশ্ন না করে ঝোপঝাড় পিটিয়ে অবশেষে তার বিশ্বাস দৃঢ় হল যে দীপক-বিষয়ে আমার অবশ্যই লুকোনোর কিছু আছে!

তুই তো দীপককে চিনিস্। আমাদের ক্লাসের সেই ছেলেটা যে পেছনের দিকে বসত; বেঁটে আলু-গোল মোঙ্গলীয় নাকমুখ। মেয়েদের নৈকট্য পাবার জন্য যে সদাসর্বদাই ইতিউতি করত। কলেজ জীবনে যেমন সকলেই সকলের পেছনে লাগে তেমনি অনেকেই তো আমার তোর পেছনেও লাগতো। দীপককে নিয়ে তোরা তো কম হাসিঠাট্টা করিস্ নি। সেই পাঁড় বোকা দীপক হয়তো নিজের চঞ্চলতায় আমাকে এক আধখানা চিঠিও দিয়েছে। তোরা সেই চিঠি নিয়ে অনেক হাসি মস্করাও করেছিস। কোথায় সেই দীপক আর কোথায় আমি। বাণিজ্য বিভাগ ছেড়ে সে হঠাৎই বিজ্ঞান দিয়ে পড়তে শুরু করল। কেন? না, আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী! ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি। ব্যর্থ করে দিয়ে দীপক জীবনপণ করে আমার জন্যে অপেক্ষা করত। আমাকে চিঠি দিয়েছে, বাড়িতে এসেছে আরও কতভাবেই যে সে তার বোবা প্রেম নিবেদন করেছে তার কোনও লেখাজোখা নেই। আমার বিয়ে হয়ে যাবার পরে ভাবতেই পারিনি যে সে আবার আমাকে চিঠি লিখতে পারে। কিন্তু সে তাই করেছে। এবং সেই চিঠি আমার স্বামীই পেয়েছে। সুতরাং? সুতরাং স্বামীটি মনে করে বসেছে যে সে যা পেয়েছে তা খাঁটি নয়, আসল নয়, পরগতপ্রাণ-মন। তার মূর্খতার আরও বড় প্রমাণ এই যে সে যদি সোজাসুজি আমাকে দীপক-উপাখ্যান জানতে চাইতো তা হলে যা হাসি-ঠাট্টা-আনন্দের উপকরণ হতে পারত, তাই এখন প্রাণঘাতী হয়ে আমাদের দ্বৈত জীবনকে ছন্দছাড়া করে দিল। সন্দেহ বাতিকগ্রস্থ এইসব পুরুষ স্বামী হবার অযোগ্য হয়েও লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মেয়েদের বিয়ে করতে চায়। এদের বাস্তববোধ এবং জীবন-ধারণা এতই কূপমণ্ডুক যে এরা বর্তমান সমাজের চেতনাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত হবার যোগ্যই নয়!

এবং সেই চিঠি, যার কথা সে বার বার উল্লেখ করেছে, সেই চিঠি কখনই আমাকে দেখায় নি। এমন কি সে চিঠিতে কি আছে তা পড়ে শোনায় নি, সবটা মুখেও বলে নি। যতটুকু যখন দরকার ততটুকুই তখন উল্লেখ করেছে এবং আমার চরিত্র, জীবনযাত্রা এবং মূল্যবোধ নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে। আমি উত্তেজিত হয়েছি, ক্ষতবিক্ষত হয়েছি এবং এক সময়ে প্রত্যাঘাত হেনেছি। আর তখনই তার পৌরুষে আঘাত লেগেছে। এই আহত 'পুরুষ' তখন আমার বিষয়ে আমার মা-বাবার বিষয়ে এবং অন্যান্যদের বিষয়ে আরও 'তথ্য' সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। আমার বাবার পরিচিতি অনেক, ভালমন্দ সব মিলিয়েই তার সম্পর্কে প্রচার। বাবা জীবনে অর্জন করেছেন প্রভূত অর্থ, বিদ্যা, সম্মান এবং সম্পত্তি। শুরু করেছিলেন অত্যন্ত নিম্ন ভিতে, অত্যন্ত সাধারণ বলতে যা বোঝায় তারও নিচের স্তরে। পূর্ববঙ্গের ভাগ্যতাড়িত একটি পরিবার হৃতসর্বস্ব সম্ভাবনাহীন পর্যুদস্ত। তাকে সেই গভীর খাদ্ থেকে নিজের চেষ্টায় বুদ্ধিতে এবং অধ্যাবসায়ে তিনি অনেকের চাইতেও অনেক উপরে স্থাপন করেছেন। তাই তার শত্রুও যেমন অনেকে, মিত্রও তেমন বহু।

আমার স্বামী সেই সব সূত্রের সন্ধান করে 'রসদ' বা তথ্য সংগ্রহ করলো যারা বাবার শত্রু। এবং এই সংগৃহীত রসদ সে অবলীলায় আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে লাগলো। মা-বাবা আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধে এইসব অসত্য অপপ্রচারের আঘাত আমার মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে দেরি করে নি।

কিন্তু এমতো অবস্থাতেও আমি আমার স্বামীকে নির্ভর করেছি, তাকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, নোতুন করে সব ঠিক করে নিতে বলেছি। যখন মনে হয়েছে এক সঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয় তখনও আমি তার বিরুদ্ধে কোনও সম্ভাব্য action নিতে বাবাকে নিষেধ করেছি। কারণ স্বামী হিসেবে এই লোকটির অসহায় মানসিকতাকে আমি উপলব্ধি করেছি এবং একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে বলে বিশ্বাসও করেছি। বিশেষ করে যখন আমাদের মাঝে একটি সন্তান এলো তখন তো তীব্রভাবেই বিশ্বাস করেছি যে এবারে বোধহয় আমাদের দ্বৈত-বিরুদ্ধতার মধ্যে একটা জীবন্ত সেতুবন্ধনের মতো আমাদেরই সন্তান তার হাসি, আনন্দ আর চাঞ্চল্য দিয়ে ভরাট করে দেবে। আমার বাবা বললেন একটা পবিত্র শিশু অনেক অপবিত্র মানসিকতাকে ধুয়ে মুছে একাকার করে দিতে পারে। আমাদের কষ্টের দিনের অবসান আর বিলম্বিত নয় বলে তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন, আশ্বস্ত করলেন।

কিন্তু তা হতে হতেও হয়ে উঠলো না। সেই শাশুড়ি, সেই আত্মীয়স্বজন। স্বজনদের মধ্যে একজন তো তার মনোনীত মেয়েকে বিয়ে দিতে না পেরে আমার উপর একেবারে খড়্গহস্ত। কারণ আমার জন্যেই নাকি সেই মেয়েকে আমার স্বামী অপছন্দ করেছিল! কে জানে! কিন্তু তার ফলস্বরূপ আমার বিরুদ্ধাচরণ করাটাই তার চানক্য-প্রতিজ্ঞা হয়ে আমাদের পরিবারে সব সুখ-শান্তি নষ্ট করতে নিযুক্ত ছিল। আর আমার ক্ষতি করতে গিয়ে আমার সঙ্গে আরও অনেকেরই ক্ষতি হয়ে যেতে লাগল।

বাপের বাড়িতে বসে আমি আমার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললাম। আমার দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের একটা দীর্ঘ প্রায় দৈনন্দিন সমস্যা, অনুভব, অভিজ্ঞতা কষ্ট, যন্ত্রণা আর বঞ্চনার ইতিহাস লিখে ফেললাম। যদি আমাকে ওরা হত্যা করার চেষ্টা করে, যদি আমাকে একেবারেই ত্যাগ করার পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে যেন আমার বাবা বিভিন্ন স্থানে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমার হাতের লেখা অভিযোগ বিবরণীও পেশ করতে পারেন। এই ব্যাপারে অনেকদূর গড়াল। সমস্যা এতো দিনে পরিবারের মধ্যেই সীমিত ছিল। পাড়ার ছেলেদের সেই আক্রমণের দিন থেকে আর এটা পরিবার গণ্ডির মধ্যে রইল না। তাছাড়া আমার বাবা ওদের বোঝাতে না পেরে ওদের নিকট আত্মীয়দের কাছে কিছু একটা করার আবেদন জানালেন, মৌখিক এবং লিখিত।

এবারে ওদের অহংকারে ঘা পড়ল। সকলেরই। সামনে যাঁরা কিছু একটা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁরাও মনে মনে ওদের দলে যোগ দিয়ে আমার অবস্থাকে সংকটাপন্ন করে তুললেন। যাদের বিচারক্ষম বলে মনে হয়েছিল, যাঁরা আমার উপর সহানুভূতিশীল বলে আমার সামনে এবং বাবার কাছে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং অবশ্যই ওঁদের দোষত্রুটিগুলো ঐতিহাসিক এবং সাময়িক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে উদ্ঘাটন করেছিলেন, আসলে তাঁরাও ওদের clan-mentality থেকেই এসব করছিলেন। ওরা সকলেই একই গোষ্ঠীর; আমি, আমরা, বাইরের। তাই ওরা-ওরা তলে তলে এক, আমরা আলাদা। এই শ্বাসরোধকারী অবস্থায় আমার দিন কাটছিল।

তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার নামে যত চিঠিপত্রই আসতো তার সবই আমার স্বামী খুলে আগেই দেখে নিতেন। হয়তো বা অনেক চিঠি আমার পাওয়াই হয়নি। কে জানে! তাছাড়া, ওঁরা আমার বাবাকে, বা আমি যখন বাবার ওখানে থাকতাম তখন আমাকে প্রায়

কোনও চিঠিই দেয়নি। বাবাকে দাদাদিদিকেও নয়! এবং কোনও চিঠিতেই ঠিকানা বা তারিখ থাকতো না, যখন চিঠি নেহাতই দিতে হত। এবং ওরা যে অত্যন্ত document conscious হবে পড়েছিল প্রায় প্রথম থেকেই তা আমার মনে হয়েছে ওদের দু-একটা টুকরো কথা থেকে। চিঠির এই অশালীন censure বিষয়ে আমাকে নোতুন পাঠ নিতে হয়েছে। আমার স্বামীর কাছ থেকে। স্ত্রী তো আর পর নয় তাই স্ত্রীর চিঠি স্বামী দেখতেই পারে? স্বামীর চিঠি? না সেখানে পরিবারের অধিকার, তাই স্ত্রীর অধিকার নেই। Personal right? ওরকম কিছু আধুনিকাদের থাকতে পারে গৃহের বধূদের থাকতে পারে না। তুই চিন্তা করে দেখ্ তাপসী, এসব কথা কি সপ্তদশ শতকের মতে না তারও আগের tribal সর্দারদের মতো মনে হয়?

যাক্। আবার ফিরে আসি সেই শ্বাসরোধকারী অবস্থার কথায়। ওরা আমাকে বাবার কাছে ক'দিন থেকে আসতে বলল। পরে বুঝেছিলাম সেখানেও ওদের অভিনয় ছিল নিখুঁত। বাইরের পরামর্শ ছাড়া, কোনও direction ছাড়া এমন অভিনয়, সুপরিকল্পিত পর্বে পর্বে বিন্যস্ত অভিনয় সম্ভব নয়। পরিবারে কিছুদিন যাবত শান্ত অবস্থা। ভাল কথা আর ভালবাসার বাতাবরণ, বেড়ানো, এটা ওটা কেনাকাটা এবং বাড়ির জন্যে মন কেমন করে কিনা? তাহলে বাবাকে লিখে দাও, কদিন সেখান থেকে আসবে। সরল মনে সে কথাই বাবাকে বললাম। কিন্তু মনের টানে বাবা চিঠি পাবার আগেই চলে এলেন। শুনে বললেন শ্বশুরের এই অবস্থায় তোমার দূরে যাওয়া উচিত হবে না। এবং সেদিনই রাত্রে মৃতপ্রায় বাবাকে nursing homeএ পাঠানো হল!

আমার নিজের কথা বলতে বলতে সেই অক্ষম ক্রমশ জীর্ণ বৃদ্ধের কথা বলতে ভুলেই গেছি। বৎসরাধিককাল ধরে তিনি ক্রমশই জীর্ণ থেকে জীর্ণ হচ্ছিলেন। তার সচেতন অস্তিত্বে থাকা প্রায় কখনই সম্ভব হচ্ছিল না। অচেতন একটা ঘোর অবস্থার মধ্যে তার দিন কাটছিল। কিন্তু তাঁর নাম করে আমাকে অনেক সমালোচনা শুনতে হচ্ছিল। আমি জানতাম তিনি সে সব কথা বলেন নি; কারণ বলার মতো শরীর-মন তাঁর ছিলই না। তবুও ওঁরা বলতে ছাড়তেন না। তারপরেও তিনি প্রায় দুই মাস রোগশয্যায় থেকে, পুঁজ-রক্তে-প্রস্রাবে মাখামাখি হয়ে এবং পচনশীল মাংসের একটা জীবন্ত দলা হয়ে বেঁচে রইলেন। এবং মারা গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল যে আমার জন্যেই তিনি মারা গেলেন। সহ্য করতে না পেরে চলে গেলেন। অথচ ওরা সকলেই জানে যে বিয়ের আগে থেকেই তাঁর রোগ। ক্রমশই, যদিও অত্যন্ত ধীরে, খারাপের দিকে যাচ্ছিলেন। ডাক্তার, কলকাতার specialist, এবং সকলেই জানে, এই রোগের পরিণতি; এঁরাও যে না জানতেন তা নয়। তবুও আমার নামে সকলেই দোষারোপ করতে লাগলেন।

সব শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে আমার স্বামী আমাকে বাবার কাছে রেখে গেল। মাকে রাখা হল দাদার ওখানে। আবার অভিনয়। এবারে আর্থিক অনটনের কথা তোলা হল। সদ্য বাড়ি করেছে। কিন্তু দেনা ছিলই। তার উপর শ্বশুরের মৃত্যু এবং শ্রাদ্ধ। সুতরাং সামলে নেবার জন্যে ও একা থাকতে চায়। খরচা বাঁচাতে চায়। আবার সরল বিশ্বাসে তার সঙ্গে সহযোগিতা করলাম। তাছাড়া বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে শাশুড়ি গেলেন আমার যাবার আগেই। সন্দেহের কোনও কারণই ছিল না। কিন্তু আমাকে রেখে যাবার সময় পরিষ্কার করেই আমার স্বামী বলে গেলেন আর স্বামীগৃহ নয়। যা করার করে নিও। বড়লোক বাবার কাছে ভালই থাকবে ..... ইত্যাদি।

আমি পরিত্যক্ত হয়ে ত্যাজ্য হয়ে মেয়েকে নিয়ে একা হয়ে গেলাম। আমি বজ্রাহত হয়ে মূক হয়ে বসে ছিলাম। বাড়িতে বাবা ছিলেন না। প্রায় ফাঁকা বাড়িতে আমার স্বামী আমাকে যার পরনাই হেনস্থা করলো, দুর্নাম দিলো এবং চলে গেলো।

বাবাকে সব বললাম। আশ্রয় চাইলাম। এবং চোখের জলে আর রুদ্ধকণ্ঠে বাবার কাছে সমাধান চাইলাম। বাবা অনেকক্ষণ ভাবলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং ধৈর্য ধরতে বললেন। আমার প্রতিটি মুহূর্ত মেয়ের ভবিষ্যত ভাবনায়, আমার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় কাটতে লাগল। অনিশ্চয়তা সবদিকে আমাকে ঘিরে ফেলল।

বাবা সকলের সঙ্গে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেন। মানব চরিত্র, যৌবন, তাৎক্ষণিক তাড়িত-সিদ্ধান্ত, মানসিক বিচ্ছিন্নতা বোধ এবং জৈবিক বঞ্চনাবোধ — সব বিষয়েই আলোচনা করলেন। কিছু সময় দিতেই হবে আবেগের তীব্রতা কমে যাবার জন্যে, বললেন। এবং জানালেন একটা reasonable সময় পার হলেই একমাত্র বিষয়টা নিয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে। ওদের প্রকৃত মতলব কি তা জানা দরকার। আত্মীয়স্বজন বা শাশুড়ির নির্দেশে যদি এরকমটি ঘটেও থাকে তাহলেও সময় দিতে হবে জামাইকে ভেবে দেখার, পুনর্মূল্যায়ন করার এবং স্থির বুদ্ধি জাগ্রত হবার। তার পরে যথাকর্তব্য নিশ্চিত করা যাবে।

দিন সপ্তাহ মাস ঘুরে যায় প্রাকৃতিক নিয়মেই। আমার অশান্ত মন নিশ্চয়তা আর আশ্রয় খুঁজে পায় না। আমি বাবার উপর ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠি — কেন তিনি কিছু একটা করছেন না। [illegible] ব্যগ্রতা বাঁধ মানে না। আমার অহংকার পীড়িত হয়। আমি এদের সব কাজে ত্রুটি দেখতে পাই, সহানুভূতির অভাব দেখতে চাই। এরা যেন আমাকে চায় না, আমার সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা বলে মনেই করে না! ওদের ব্যবহারে আমি আমার মেয়ের প্রতি অবহেলা দেখতে পাই, আমার প্রতি অনাগ্রহ পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। আমি ওদের মধ্যে থেকেও যেন ক্রমশ ওদের থেকে আলাদা হয়ে পড়ি, হারিয়ে যেতে থাকি।

এমনি যখন অবস্থা তখন একদিন আমার এক দেবর আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং আমার মেয়ের খবর নিতে আসে। দু'চার বার সে এলো। তার সঙ্গে অনেক কথা হল। এই আমি প্রথম আমার বাবার কাছে আমার কথা গোপন করলাম। আমাকে গোপন করতে বলাই হল। এবং ফলে আমি বাবার কাছ থেকে ক্রমশই দূরে সরে যেতে থাকলাম আর আমার স্বামীর সমূহ কলকাতা আসা এবং তার নৈকট্য পাবার সম্ভাবনার হাতছানি অনুভব করতে লাগলাম। এই গোপনীয়তার মধ্যে আমার এবং আমাদের পরিকল্পনা হতে লাগল। আবার সরল মনে, আগ্রহের আতিশয্যে আমি ওঁদের ফাঁদে পা দিলাম। অবশ্য এবারে আমি আমার চিরশত্রুভাবাপন্ন দিদির অত্যন্ত কাছে চলে এলাম। গোপনীয়তার প্রতিজ্ঞা করিয়ে আমি তাকে অনেক কথা বললাম। সে আমাদের পরিকল্পনায় সায় দিল। সে আমাকে স্বামী নির্ভরতার কথা নোতুন করে বোঝালো। স্বামীর সঙ্গে তিনদিন কলকাতায় বাস করলাম। সব ঠিক করে এবারে পিতৃগৃহ ত্যাগের পরিকল্পনা পাকা করে ফেললাম। বাবাকে কিছুই জানালাম না। স্বামীই তো আপন? সে যা বলবে তাই তো স্ত্রীর কর্তব্য? বিয়ের পরে বাবা তো কখনও সখনও-র ক্ষেত্র? আমি গিলে ফেললাম। আমার তৎকালিন মানসিক অবস্থায় এবং দিদির বুদ্ধিতে এসবই আমি উচিত বলে মনে করলাম।

তাপসী, যদি এতটুকুতেই আমি ক্ষান্ত হতাম তাহলে আজ তোকে এই চিঠি লিখতে বসতাম না। আমি যে আরও কিছু করে বসে আছি। আমার স্বামীর ষড়যন্ত্রের জালে একেবারে জড়িয়ে পড়লাম। আমি মনে করেছিলাম স্বামী আমাকে আমার ভালর কথা ভেবেই, ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তলে তলে যে তার অন্য মতলব ছিল তা আমি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারিনি। আমাকে যা যা বলেছে আমি অন্ধের মতো তাই করেছি। উপরন্তু স্বামীর বিশ্বাস জোরদার করার জন্যে অধিক কিছুও করেছি। আমি বাবার ডায়েরির ক'একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়েছি। আমার মনে হয়েছে বাবার নিজের হাতের গোপন লেখা দেখতে পেলে আমার স্বামী আমার উপর

খুশি হবে। আমার বাবার বিরুদ্ধে আমার স্বামীর অনেক ক্ষোভ জমা আছে। সেই ক্ষোভের, অহংকারের আগুনে ঘৃতাহুতি দেবার মতো উপকরণ ভেবে আমি আরও কিছু কিছু দলিল সংগ্রহ করে নিয়ে গেলাম। তাছাড়া আমার সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাবার একটা স্বতন্ত্র file আছে। সেই file থেকেও বহু পৃষ্ঠা একসঙ্গে তুলে নিলাম। এবং বাবার কানে যথাসময়ে পৌঁছে যাবে এমন ভাবে আমি আমার এক কাকিমাকে বলে এলাম 'যা করার করে যাচ্ছি, আর ফিরব না!'

কেন এমন করলাম, করেছিলাম? নিজেকে এতো ছোট করে ফেললাম কি করে তা এখন ভাবলে অবাক্ হয়ে যাই। আমার বিবেকে, শালীনতায় কি এতোটুকু আঁচড় কাটল না? কাটে নি তার কারণ আমার একরোখা জেদ, আমার অহংকার, আমার অভিমান! তাপসী, সত্যি করে বল, একটা ছন্নছাড়া ভয়, আক্রোস আর একগুয়েমী যখন আমার ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসেছিল তখন আমাকে দিয়ে আমার স্বামী যা করিয়ে নিলো,আমি নিজে থেকে যা করে ফেললাম, তা কি কখনও কেউ ক্ষমা করতে পারে?

এবং মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো বাবাকে একটা চিঠি লিখে ফেললাম। বাবা আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে এলেন। কিছুই টের পান নি। মনটাই আমাদের বেশ ভার। আমার মেয়েকে স্বাভাবিকভাবে যত্ন দিয়ে, আদর করে নিয়ে এলেন। আর বাবা see-off করে যাবার সময় তার হাতে সেই বিষ-পত্রটি তুলে দিলাম। বললাম বাড়ি গিয়ে পড়বে। তখনও যদি আমার একটু সম্বিৎ ফিরে আসতো তা হলেও হত। তা হল না। সেই চিঠিতে বাবাকে যথেচ্ছ আঘাত করার চেষ্টা করেছি। তাঁর সঙ্গে যে আমার আর কোনও সম্পর্ক রইল না তা পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছি। মা মারা গেলে বাবা হন তালুই, বলেছি। বাবা থাকা-না-থাকা সমান, ঘোষণা করেছি। কেন দাদার সর্বনাশ করব না তা জানতে চেয়েছি। দাদার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ করেছি সেই চিঠিতে। বাবাকে অমানুষ বলে বিবেকহীন পিতৃত্বহীন অন্ধ বলে ধিক্কার দিয়ে সেই চিঠি লিখেছি। এ-সবই তখন করেছি মনের জ্বালা মেটাতে। একেই আমি আমার মানসিক আত্মহত্যা বলে বলেছি।

আমার কি হবে তাপসী? শ্বশুরবাড়িতে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করি। স্বামীর দেওয়া দুর্নাম সহ্য করতে না পেরে মারামারি করি। স্বামী ত্যাগ করে গেলে বাবার কাছে কেঁদে আশ্রয় চাই। আর বাবাকে ত্যাগ করে সেই স্বামীকে পেতে চাই! এ-সবই আমার দুর্বুদ্ধির কারণে ঘটে। কিন্তু সুবুদ্ধি কোথায় পাব? আমার জেদ, অহংকার, রূঢ়তা আমাকে সংক্ষুব্ধ করে অমানুষ করে ফেলে, আর তখনই আমি একের পর এক ভুল করতে থাকি। এই ভুলের বোঝা সারাজীবন বয়ে বেড়ানোই মনে হয় আমার বিধিলিপি।

এখন আমার মনে হয় আমার সামনে তিনটিমাত্র সম্ভাবনা রয়েছে। এক, ওদের সংসারে slave হয়ে থাকা। দুই, ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন, পিতৃহীন (ত্যাগ করেই এসেছি) আমার আবার আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া। এবং তিন, ওদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে নতুন পথের সন্ধান।

ওরা জানে যে আমার সব শক্তির উৎস প্রধানত আমার বাবা। বাবা অর্থবান, বুদ্ধিমান এবং প্রভাবশালী। তাই এখন বাবার গৃহ এবং সব থেকে বিচ্ছিন্ন আমি একেবারেই শক্তিহীন। [ওদের হাতে আমাকে black-mail করার মতো রসদ তো আমি নিজেই তুলে দিয়েছি; তাছাড়াও আছে প্রদীপ, প্রদীপের চিঠি] এই শিকড়হীন, শক্তিহীন একটা আমাকে ওরা এবারে পিষে দলে নির্জীব করে slave করে রাখতে চাইবে। দ্বিতীয়ত, আমার স্বরূপ জেদ এবং অহংকার আমাকে আবেগের সংক্ষোভে তাড়িত করলে আমি তো আবার বিষ খেয়ে নিতে পারি। তখন বাবা সংবাদ পাবার

আগেই ওরা সব শেষ করে ফেলতে পারবে। আর বাবার সঙ্গে যোগাযোগহীন হয়ে পড়ায় তিনি তো আমার চলমান বর্তমানের কোনও খবরই পাবেন না! এবং সব শেষে যদি আমি নিজেই নিজের জন্যে একটা পথ খুঁজে নিতে পারি আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতার।

আমি তাই এখন মৃত্যুফাঁদে আটকা পড়ে হাহুতাশ করছি। ভবিষ্যতের কাছে আমার নিজের কোনও দাবি নেই, চাওয়াও নেই। স্বহস্তে তা আমি নষ্ট করে এসেছি। আমার বর্তমান নেই। ছিন্নভিন্ন মাত্র। তাই আমি অতীতের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে চাই। সেই অতীত যেখানে তুই আছিস, তোরা আছিস। যদি কখনও জানতে পারিস্ আমি আর নেই তা হলে আমার জন্যে না হলেও আমার মেয়ের জন্যে অন্ততঃ দুফোঁটা চোখের জল ফেলিস।

আর যদি জানতে পারিস, আমি পথ খুঁজে পেয়েছি তাহলে একবার সময় করে আমার বাবাকে বলে আসিস্! পারবি তো, তাপসী?

তোদের আত্মনির্যাতিতা আমি।

তনিমা বিয়ে করবে না

তনিমাকে আপনারা অবশ্যই দেখেছেন। হয়তো চেনেন, হয়তো চেনেন না। অনেকেই আপনারা তনিমাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পেয়েছেন, অনেকেই পান নি। কিন্তু আজকের নারী আন্দোলনের দিনে, নারী স্বাধীনতার বাতাবরণে আর সর্বত্র চাকরি বাকরির খোলামেলা সামাজিক পরিবেশে কখনও না কখনও তনিমার দেখা পেয়েছেন অথবা তনিমার কথা শুনেছেন। জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে, সমাজের বিচিত্র সমস্যা নিয়ে আর ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার স্বাতন্ত্র্যের বিষয়ে এরা পরিষ্কার এবং নির্ভিক মতামত পোষণ করে, ব্যক্ত করে এবং প্রতিপক্ষের মতামতের বিশ্লেষণ, 'ডিসেকশন' এবং মূল্যায়ন করে।

তনিমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল, সে ওর বিয়ে না করা বিষয়ে। তনিমা অবশ্য বিষয়টিকে ব্যক্তিগত রাখে নি, সামান্যীকরণ করেই কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে, বোধহয় এ ধরনের একটি প্রশ্ন বা সমস্যা দিয়ে আমার মতো বৃদ্ধের সঙ্গে আলোচনার কোনও যাথার্থ্য আছে কি না তা চিন্তা করে নিয়ে, বেশ চ্যালেঞ্জের মতো করেই পাল্টা প্রশ্ন করেছিল: 'কেন করব বলতে পারেন?'

প্রথম পরিচয় বলেছি এই জন্যে যে সেই প্রথম আমরা সামনাসামনি বসার সুযোগ পেয়েছিলাম। আসলে ওর বিষয়ে নানা জনেব কাছে নানা কথা শুনেছি। তনিমা অত্যন্ত তাজা প্রাণ, এ্যাডভেঞ্চারাস কাজে এবং খেলাধূলায় ভীষণ আগ্রহী, তর্কে নবদ্বিপের নৈয়ায়িকদেব মতো চুলচেরা, ওর বুদ্ধিও নাকি ক্ষুরধার। একমাত্র দোষ তনিমা ঝোঁকে চলে। অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং নিজের বিশ্বাসে আব সিদ্ধান্তে অত্যন্ত গোঁড়া। ওর বাবা আমাব দীর্ঘদিনের সহকর্মীবন্ধু। আমার বাড়িতে তনিমার বাবার, আর ওদের বাড়িতে আমার যাতায়াত মোটামুটি রকমের সহজ। তবে স্বল্পসময়ের সেই দেখা সাক্ষাৎ-এ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়েছে প্রায় ক্বচিৎ কখনও। পরিচয়ের পর্যায়ে পৌঁছায় নি। তাছাড়া প্রজন্ম-বিভেদ? তরতাজা উঠতি প্রাণ কিশোর যুবকদের কাছে পড়ন্ত বেলাব বিদায়ী ব্যক্তিদের জন্যে যথেষ্ট সময় থাকে না। ভদ্রতাব সভ্যতার সম্ভাষণমাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাই তনিমার বাবা যখন বলেছিলেন, 'একবার তুমি কথা বলে দেখতে পার, যদি মত বদলায়, যদি রাজি হয়!' কথা দিয়েছিলাম, 'সুযোগ হলে দেখব।'

তনিমা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম এ করেছে, শিক্ষকতা বিষয়ে বি এড্ করেছে এবং স্পোর্টর্স-এন্ড-গেমসে নিজেব স্থান করে নিয়েছে। 'শিক্ষকতা করার মন নিয়ে অপেক্ষায় আছে। ইতিমধ্যে কোনও একটি প্রাইভেট্ 'কন্সার্নে' চাকরি করে। সেখানে অর্থের চাইতে অনর্থ বেশি, তৃপ্তির চাইতে হতাশা বেশি আর নিজের বলে যে সময় তার চাইতে অফিসকে বেশি সময় দিয়ে দিতে হয়। এই চাকরি অনিবার্য শয়তানের মতো বয়ে চলেছে — 'নেসেসারি ইভিল'। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হস্তগত না হলে কোনও ব্যক্তি স্বাধীনতার মানসিক স্বাতন্ত্র্যের আর চিন্তার মুক্তির সম্ভাবনাই থাকে না। তাই বেশ কঠিন মূল্য দিয়েই ও অনেকটা বাঁচাতে চাইছে; পণ্ডিতের মতো অর্ধেক পর্যন্ত ত্যাগ করতে ও রাজি।

আমার প্রশ্নের জবাবে আর একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে ও এমন করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যেন আমি কাঠগড়ায়, ঘেরাটোপে আটকা পড়ে গেছি। তনিমা কালো কোটের সুরক্ষায় মৃদু হাস্যময়ী! বুঝলাম প্রতিপক্ষ সহজ নয়। মার্জার নিজেই নৈয়ায়িক ছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বোঝাতে পারেন নি। আমার সামনে যে মার্জার যে সত্যিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যায়নকৃত,

এবং নিজের বক্তব্য নিজেই উচ্চারণ করবে। আর আমি কোনও বঙ্কিমচন্দ্র নই, বরং সহজেই বঙ্কিম না বাঁকা, বেঁকে যেতে পারি। তাই স্থির করে ফেললাম যে যথেষ্ট হুঁশিয়ার হয়েই পদক্ষেপ নিতে হবে।

বললাম — বাঃ রে? সবাই বিয়ে করে, তাই তুমিও করবে। তনিমার চোখে একটু কুঞ্চন দেখা দিল। বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ করার জন্য কি? বলল — আপনার বক্তব্যের মধ্যে তিনটি বিষয় একসঙ্গে ঢুকে পড়েছে। একটা হল আপনার আবেগিয় অবস্থা, আপনার বিস্ময়বোধ। এটা যুক্তির সঙ্গে সংযোগহীন। তাই বাদ গেল। দ্বিতীয় একটা পূর্বস্বীকার। আপনি ধরে নিয়েছেন যে সকলেই বিয়ে করে। এই ধরে নেওয়াটা ঘটনা দ্বারা সমর্থিত নয়। এবং আপনার ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটিও — 'বিয়ে করে, সঠিক নয়। ভুল বা অসমর্থিত পূর্বস্বীকারে দাঁড়িয়ে যে কোনও সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত হবে। আর তৃতীয় বিষয় আপনার সিদ্ধান্তটি। সকলেরই বিয়ে করা উচিত বা সকলেই বিয়ে করবে। এরকম না করে আপনি সিদ্ধান্ত করলেন 'তুমি করবে. এটা কেমন তরো হলো? একটা চতুর্থ বিষয় এখন না হয় নাই তুললাম। সেটি পরে অবশ্যই আপনার জন্যে তোলা রইল। সংক্ষেপেঃ 'হয়' থেকে 'ঔচিত্যে' গেলেন কি করে? অথবা 'করে' থেকে 'করা উচিত-এ'?

প্রমাদ গুণলাম। মার্জার শুধু দুটি ঘটনা তুলে ধরেছিল। দুধের উৎস মঙ্গলা, দোহক প্রসন্ন। তা থেকেই সম্রাটকে ঘায়েল করে দিয়েছিল। অধিকারের প্রশ্নে তিনি ধরাশায়ী হয়েছিলেন। আর এখানে তো একেবারে ঔচিত্যের প্রশ্ন পর্যন্ত উঠে পড়ল।

আবেগ ত্যাগ করে সমাজ-বিজ্ঞানের চত্বরে দাঁড়ালে কেমন হয়? যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। বললাম, মানুষ মাত্রই তো সামাজিক। সমাজ বলতে ব্যক্তি সমন্বয়। আর এই ব্যক্তি সমন্বয় বলতে সমাজ একক বা পরিবার। বিয়ে না করলে পরিবার কেমন করে হবে? সমাজ টিকবে কি করে? এক থেকে বহু হওয়াটা তো কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই ব্যাপার নয়, ব্যক্তি মানুষেরও তো সেটাই সত্য। তাহলে?

তনিমা এমন করে হেসে দিল যে আমার বিজ্ঞান-ভিত্তিক দৃঢ়তাবোধ কেমন যেন হঠাৎই পলকা বলে মনে হল। হাসিটা কি আমার যুক্তির দুর্বলতার কারণে না কি আমাকে মানসিক ভাবে দুর্বল করে দেবার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত? বেশ একটু নড়ে চড়ে প্রস্তুত হয়েই উৎকর্ণ হলাম। তনিমা আমার গোটা বক্তব্যটাকে একবার বলে নিয়ে জানতে চাইল সে ঠিক বুঝেছে কিনা। আমার সমর্থন করা ছাড়া পথ নেই। ওর প্রখর স্মৃতি। এবারে তনিমা জানাল, "আপনার বক্তব্যের মধ্যে তিনটি বিষয় তুলেছেন—সমাজ, বিজ্ঞান এবং বহুত্ব-প্রক্রিয়া। এবং এই তিনটিকেই কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করেছেন। যুক্তির প্রক্রিয়াগত নিয়মে যুক্তিশৃঙ্খলের যে কোনও একটি 'পাদ' বা ধাপ বাতিল হয়ে গেলে গোটা যুক্তিজালটাই পপাত ধরণীতলে হতে বাধ্য। প্রাণিজগতে সমাজ আছে, বহুত্বপ্রক্রিয়াও সচল কিন্তু 'বিবাহ' নেই। এবারে? পপাত?"

বুঝলাম উপস্থাপনায় কোথায় আমার ত্রুটি ঘটে গেছে। সেই ফাঁক গলে ও আমাকে ধরাশায়ী করার সুযোগ পেয়ে গেছে। নিজের কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সে যে মাঠে নেমেই হার স্বীকারের তুল্য হবে — একেবারে প্রথম রাউণ্ডেই! তাই গুছিয়ে পুনরুত্থাপন করতে সচেষ্ট হলাম, দেখ তনিমা, হয় আমার প্রস্তাবনা সঠিক হয় নি, না হয় তুমি তাকে সুযোগ মতো তরল করে নিয়েছো। প্রাণিসমাজের তুলনায় মানব-সমাজ গুণে পরিমাণে এবং উদ্দেশ্যে আলাদা। ওদের সমাজ প্রবৃত্তি নির্ভর, আমাদের সভ্যতা প্রবৃত্তির অস্বীকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ওদের সমাজে ব্যষ্টি গড়ে আমাদের সভ্যতায় ব্যক্তি গড়ে। যে সকল পরিবর্তন এইসব প্রভেদের মূলে, এই গুণ-পরিমাণ উদ্দেশ্যের সূতিকাগার তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান উপকরণটিই হল পরিবার-সম্বন্ধ, পরিবার-ঐক্য এবং

পরিবার-বোধ। আর এই উপকরণটি একটি সামাজিক সংস্থা — সোশ্যাল ইন্‌স্টিটিউশন। পরিবারের অধ্যাত্ম-আত্মস্থতা যদি ভিত্তি না হয় তাহলে শৃঙ্খলা, মানসিক ঐক্য আর ভাবাত্মক সমন্বয় কখনই উৎসারিত হত না। যেমন হয় না প্রাণিসমাজে। এবারে বোধহয় আমার উপস্থাপনার মূল সুরটি এবং যুক্তির মূল সূত্রটি তোমার কাছে পৌছে দিতে পেরেছি।

তনিমা এবারে বেশ গম্ভীর। বলল, — এবারে বেশ আঁটোসাঁটো করে আপনি আপনার বক্তব্যটি পেশ করেছেন। হয়তো বলা যেতো যে কিছু ব্যক্তি যদি পরিবার গঠনের জন্যে বিবাহের সংস্থাটি গ্রহণ না-ই করেন তা হলেও সমাজের বৃহৎ দেহে কোনও ইতর-বিশেষ ঘটবে না। কিন্তু এ যুক্তি আমি দেবা না। কারণ আপনার উপস্থাপনাকে নস্যাৎ করার পক্ষে এই 'কিছু ক্ষেত্রে'-র যুক্তি যথেষ্ট হবে না। বরং 'বিবাহ' 'পরিবার' এবং 'অধ্যাত্ম আত্মস্থতা' বিষয়ে কিছু বলব। হিন্দু ধর্মে মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকর্তারা আট প্রকারের বিবাহের নির্দেশ ও বর্ণনা করেছেন। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপ্য, আসুর, গান্ধর্ব্য, রাক্ষস এবং পৈশাচ। প্রত্যেকটি পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ অপ্রয়োজনীয়। কোন প্রকার বিবাহের কথা আপনি বলতে চাইছেন যা কিনা সামাজিক 'ইনস্টিটিউশন' যা অধ্যাত্ম আত্মস্থতার জন্ম দেবে? এই আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে দানের কথা আছে, আবার দানের উল্লেখ মাত্র নেই। বিবাহ হয়, দেয়, করে এমনকি জোর করে কেড়ে নিয়ে গিয়েও সংসার করা যায়। কিছু দেখছি মানব-সম্ভব কিছু পাশবিক। তা হলে? এবারে রইল 'পরিবার'। যৌথ না একক পরিবার? যদি যৌথ হয় তাহলে কত ব্যাপক এবং ক'ধাপের যৌথ? আর যদি একক বলেন, যেটা অত্যাধুনিক সমাজের 'মটো' — সে পশ্চিম থেকে ধার করাই হোক আর আমাদের সনাতন ক্ষেত্রে উৎসারিতই হোক — তাহলে এই একক 'কতদূর' একক হতে পারে? চার দেওয়ালের সীমার মধ্যে নারী-পুরুষ — তাকে স্বামী-স্ত্রী বলুন বা বন্ধু-বান্ধবী বলুন বা ক্ষণস্থায়ী জীবন-সঙ্গী বলুন — একত্র সহাবস্থান কি অনিবার্য? স্বামী দূরে, এমন হতে পারে বিদেশে, স্ত্রী সন্তান লালন পালন করছে দেশে। এই অবস্থাটা পুরুষ এবং নারী বলে প্রকাশ করলে কোন পাঁচালি অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আমি অবাক্ হয়ে ওর বক্তব্য এবং তা প্রকাশের নিশ্চয়তার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম। মনে মনে বুঝতে পারছিলাম যে ও আমার সংশোধনাত্মক বক্তব্যের অণুপরমাণু বিশ্লেষণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে যাতে আমি আর খেই খুঁজে না পাই। তাই ওরই আগের ব্যবহৃত অস্ত্রটি সজ্ঞানে সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে মন দিলাম। একটু একটু করে লুকিয়ে হাসছি; ওকে দুর্বল করে তুলতে না পারলে আর এগুনো যাবে না। কিন্তু বাধা দেই নি; মাঝখানে নিয়মবহির্ভূত কথা ঢোকাই নি; হাসিটাকে 'মুচকি'-র পর্যায় থেকে একটু দিঘল করেছি মাত্র। তাতেই কাজ হল। ওর অসীম বক্তব্য - যাত্রায় সীমা পড়ল। বলল, "বলুন তাহলে বিবাহ অনিবার্য্য? হলে, কোন্ বিবাহ?"

আমাদের আলাচনা অনেক দূর ছড়িয়ে যাচ্ছিল বুঝতে পারলাম। দোষ তনিমার নয়। বললাম, তুমি যদিও আলোচনাকে বিষয়-মুখী করে রেখোছো, কিন্তু সেই করতে গিয়ে প্রসার ঘটিয়ে ফেলোছো অনেক। দোষ তোমার নয়, কারণ প্রসারিত হবার উৎসটি আমার বক্তব্যকে নাড়াচাড়া করতেই ঘটে গেছে। এবং প্রাসঙ্গিকই হয়েছে। কিন্তু এমন দুটি বিষয় তুমি উত্থাপন করেছো যা বিস্তারিত হওয়া দরকার। এক যৌথ জীবন, নারী-পুরুষের দ্বিমাত্রিক জীবন-চলন এবং দুই, যৌন জীবন। দ্বিতীয়টি হয়তো আমাদের আলোচনার গতিপথে অনিবার্যভাবেই এসে পড়বে। কিন্তু সেই পর্যায় আসার আগেই বোধহয় যৌথ জীবন বিষয়ে আর একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার।

তনিমার চোখে মুখে বেশ উৎকর্ণ শ্রোতার একাগ্রতা দেখছিলাম। প্রতিপক্ষকে পরিমাপ করা, পূর্বাহ্ণেই সম্ভাব্য বক্তব্য বিষয়ে সঠিক অনুমান করার ক্ষমতা না থাকলে যে বিপাকে পড়ার সমূহ

সম্ভাবনা তা বোধহয় ও ভাল করেই জানে। তাই আমার পরবর্তী অস্ত্র বিষয়ে ও বেশ উচ্চকিত ছিল। বোধহয় নিজের প্রস্তুত মনের ঠিকানা দেবার জন্যে অথবা আমাকে বাধা দিয়ে কিছু সময় হাতে পাবার জন্যে ও বলে উঠল, যৌথ জীবনই বলুন যৌন জীবনই বলুন — কোনটাতেই আমার অনাগ্রহ নেই। যৌথ জীবন বলতে আপনার প্রস্তাব বলুন।

শিশুরা মাতৃক্রোড়ে সুন্দর। শৈশবে দুষ্টু। কৈশোরে চপল। যৌবনে বিদ্রোহী। প্রৌঢ়ত্বে স্থিতধী। আর বার্ধক্যে অপেক্ষায় একাগ্র। এই দীর্ঘ এবং পরিবর্তনশীল জীবনে একটা বিষয় কিন্তু সর্বক্ষণই একইভাবে জীবনের আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে। সঙ্গী। শিশুর সঙ্গী তার মা, শৈশবে খেলার সাথী, কৈশোরে বন্ধু, যৌবনে প্রিয়জন, প্রৌঢ়ত্বে স্ত্রী আর বার্ধক্যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভগবান। সঙ্গী বা সাথী না হলে জীবনের অধেকটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। সর্বত্রই সংখ্যাধিক্য প্রাণের কাছে কাঙ্ক্ষিত ; যৌবনে কিন্তু একপ্রাণ এক গান একতা — একজনকে কেন্দ্র করেই প্রাণের স্পন্দন বাড়ে। রক্তের চাপ ওঠানামা করে, অকারণ আনন্দের বিষাদের মরুদ্যান মরুভূমি সৃষ্টি হয়। যূথবদ্ধ জীবন প্রাণি জগতের মূল মন্ত্র ; মানুষের ক্ষেত্রে সেই যূথবদ্ধতা 'ক্যানভ্যাসের' মতো কাজ করে মাত্র, যে ক্যানভ্যাসে জীবনের রং তুলি প্রতিনিয়ত যৌথজীবনের ছবি আঁকে। মনের মিল অনেকের সঙ্গেই হয় ; প্রাণের মিল হয় একজনের সঙ্গে, একজনের জন্যে। সমস্ত উৎকণ্ঠা পুঞ্জীভূত হয়ে একাগ্র চিত্ত হয়ে অপেক্ষা করে। কেউ পায়, কেউ পায় না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা সকলের মনেই উৎসারিত হয়, অংকুরে পল্লবে পুষ্পে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে চায়। এই আকৃতিই বিদ্রোহীকে গৃহমুখী করে, প্রাণের স্পন্দনকে জীবনমুখী করে তোলে। এটা মিথ্যা নয়, অসত্য নয়, অন্যায়ও নয়। আর এই মিলনকেই সর্বজনস্বীকৃতি দেবার নাম বিবাহ। কাঙ্ক্ষিত যৌথ জীবনকে একসূত্রে বাঁধার জন্য আছে যৌথ মন ; সেই বন্ধনকে স্বীকৃতি দেবার নামই তো বিবাহ। পুস্তক পাঠ করার জন্যে মলাট আবশ্যিক নয় ; ময়লা হবার হাত থেকে আবর্জনার আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই তো আবরণ। যৌবন সুন্দর বিবাহে, যৌথ জীবন মহান সৃষ্টিতে। বলতে বলতেই ভাবছিলাম এবারে তনিমা বেশ মুশকিলেই পড়বে। বেশ কবি সাহিত্যিকের মতো করে বলাটা হচ্ছিল, ভাষাও মোটামোটি 'সাথ' দিচ্ছিল। ভাবলাম বোধহয় একটা স্বীকার যোগ্য স্থানে তনিমাকে আনা যাবে। কিন্তু আমি থেমে গেলেও তনিমা কিছুই বলছে না দেখে ওর দিকে বেশ গুছিয়ে তাকালাম। ওর চোখের তারায় বিদ্যুতের ঝিলিক্ ! কেন ?

"আপনার এই বিজ্ঞানের কঠিন প্রান্তর থেকে কাব্যের সরস সুগভীর অঞ্চলে অবগাহন আমার বেশ ভাল লাগল। কাব্যের মহা সুবিধা এই যে তা মনকে যতটা নাড়া দেয় বুদ্ধিকে ততটা উত্তেজিত করে না। জীবনের এই যে ছবি ছবি বর্ণনা আর রং-তুলির আঁচড় দিয়ে তাকে সরস-সজীব আর প্রাণবন্ত করা এসবই সভ্যতা আর সংস্কৃতির দান। মানুষের নিজস্ব সৃষ্টির সম্পদ। প্রাণিজগতের মধ্যে যদি ওদের ভাষায় কাব্য-সাহিত্য লেখার মতো কোনও কবি-সাহিত্যিক থাকতো তাহলে দেখতে পেতেন আপনার বলা সব কথা সব ছবি ওদের জীবনেও কতখানি সত্যি। মানুষ নিজেকে নিয়েই কথা বলে, সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করে ; প্রাণীদের নিয়ে যে ক'জন কবি সাহিত্যিক লিখেছেন, তারা কিন্তু ওদের জীবনেও সেই সব জীবন পর্যায়গুলোই দেখতে পেয়েছেন। ওদেরও মাতৃক্রোড় আছে, চাপল্যঘেরা শৈশব আছে, বন্ধু অন্বেষী কৈশোর আর বিদ্রোহী যৌবন আছে। ওদের চোখেও একসময়ে কাজলের ছোঁয়া লাগে। যৌথ জীবনের আর্কষণে যূথবদ্ধ হয় এবং একটা 'মহান ভবিষ্যতের' মধ্যে নিজেরা হারিয়ে যায়। ওদের পছন্দ অপছন্দের এলাকা আমাদের মতো সুপরিসর নয়, ইন্টারন্যাশনাল নয়, ইন্টারকাস্ট নয়। মনের এই সার্বভৌমিকতা পেতে আমাদের অনেক দড়ি-দড়ায় টান পড়েছে, অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে, ঘটেছে অনেক বিচ্ছেদ, বিষাদ আর বিপন্নতা।

ওদের ক্ষেত্রেও দেখুন ইন্টারন্যাশনাল চিড়িয়াখানায় বন্য জগতের স্থির নিয়মগুলো কেমন অ-স্থির হয়ে যাচ্ছে। আপনি বলবেন, 'সে তো মানুষের জন্যেই, মানুষের সাহায্যেই হচ্ছে। আমি বলব হওয়াটাই প্রকৃতিস্বীকৃত অন্যথা প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে ছাড়তো না। প্রকৃতির অন্তঃস্যূত নিয়ম আর নীতির পরিপন্থী কোনও ঘটনাই ঘটতে পারে না। প্রকৃতি নিজেই কি পারে সেরকম কিছু ঘটাতে? তনিমা অনেকক্ষণ কথা বলে বোধহয় নিজেকে গুছিয়ে নিতে একটু সময় নিচ্ছিল। আমার মনে হল ও ইচ্ছে করেই আমার বক্তব্যকে বেশ কায়দা করে অগোছালো, এলোমেলো করে দিতেই এতো বিস্তার করে চলেছে। সাবধান হওয়া দরকার — মনে মনে ভাবলাম। তবুও ওর বক্তব্যের শেষাংশের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত' বলেই মনে হল। তবে একেবারে মৌন শ্রোতা পেলে ওর ধার বেড়ে যাবে ভেবে বললাম, "প্রকৃতির অন্দরমহলের এতো খর উপস্থাপন আর প্রাণিজগতের এতো বিস্তার করে তুমি কি সিদ্ধান্ত করতে চাও সেটাই বল।

"মোহগ্রস্থ করা, ভোলানো, ধোঁকা দেওয়া। এই একটি কাজ ইতিহাসের গোড়ার কথা। যারা শক্তিশালী, যারা সক্ষম তারা অন্য সকলকে ছলে বলে কৌশলে পরাধীন রাখতে চায়। প্রয়োজনে পাশব শক্তির প্রয়োগ করে, প্রয়োজনে ভজনা, প্রশংসা, নৃত্যগীতাদি ভঙ্গিমা এবং সম্ভব ক্ষেত্রে কথার পৃষ্ঠে কথা যোগ করে কাব্য, সাহিত্য, গান, সৃষ্টি করে একেবারে মনমোহন তোষামোদ। প্রাণি জগতেও তাই যৌথ বলে কোনও জীবন নেই; মানুষের সমাজেও তাই, ঋতু পাল্টাতে সময় লাগে কিন্তু মন পরিবর্তনের জন্যে কোনও সময় লাগে না। নারী কেন্দ্রিক যত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে সমাজে এক এক করে তাদের সবগুলো বিশ্লেষণ করে দেখুন! দেখবেন আষ্টে পৃষ্ঠে নারী সমাজকে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক এবং আত্মিক স্বাতন্ত্র্যকে রজ্জুবদ্ধ করায় কী অসীম প্রচেষ্টা চলে আসছে। কখনও কঠিন নিয়মের নিগড়, কখনও প্রশংসার বেলুনে বাঁধা, কখনও কর্তব্যের শৃঙ্খলে কখনও মূল্যবোধের মহতী ভাবনায়। ছলের এবং কলাকৌশলের অবধি পাবেন না। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই পুরুষ তার নিজের জন্যে কোনও দরজা, কোনও পথই রুদ্ধ করে নি। নারীর জন্যে শুধু প্রবেশের দ্বার খোলা, নির্গমের পথ হয় বন্ধ, নয়তো কন্টকাকীর্ণ। পুরুষ সহস্রাক্ষের মতো যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই মুক্তির পথ পায়। প্রাণিজগতে প্রকৃতির নিয়ম চলে, তাই সেখানে বিভেদ নেই ব্যতিক্রম নেই। মানুষের সমাজে, পুরুষ দ্বারা নিয়ম সৃষ্ট বলে নিজের কোলে ঝোল টানার সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সমাজব্যবস্থায় এমনিতেই মেয়েরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শৃঙ্খলিত। বিবাহের মার তো শাকের আঁটি নয়, প্রস্তর-লগুড়ের আঘাত। মানসিক মৃত্যুর তুল্য। পরাধীনতার সব থেকে বড় জ্বালা তো মানসিক জ্বালা। বিবাহ সেই মানসিক জ্বালা, পরাধীনতার যন্ত্রণার প্রবেশ পথের সামাজিক নাম মাত্র!

আমার সামনে বসা তনিমাকে আমি একেবারেই লাল দেখলাম। না, ওর চোখের কথা বলছি না। বিপদ সংকেত, ডেঞ্জার সিগন্যাল। ও যেন শিকড় ধরে উপড়ে ফেলতে চায়। তাই বিরুদ্ধাচরণ না করে ওর সঙ্গে হেঁটে চলাই সহজ হবে বলে ওর কথাতেই, ওর কথা দিয়েই যাত্রা শুরু করা মনস্থ করলাম। বললাম তুমি প্রকৃতির কথা বলেছো। প্রকৃতির নিয়ম তো একটা নয়। জড় প্রকৃতিতে জড়ের নিয়ম জৈব প্রকৃতিতেও জীবনের নিয়ম, মানব প্রকৃতিতেও তো তাহলে কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। থাকতেই হবে। আর একাধিক নিয়ম ততক্ষণই একই সঙ্গে পাশাপাশি চলতে পারে, যতক্ষণ তাদের মধ্যে বিরুদ্ধতা না থাকে। বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্রই নারীর জন্যে কিছু স্বতন্ত্র কাজ আছে যা পুরুষের নয়, বিপরীত ভাবে পুরুষের জন্যে কিছু কাজ আছে যা নারীর নয়! প্রাণিজগতে সত্য, মানুষের সমাজেও সত্য। সেখানে তো তোমার কোনও প্রতিবাদ নেই? নারী সন্তান জন্ম দেবে, পুরুষ সুরক্ষা দেবে। প্রথমটি পুরুষের, পুরুষ থাকা অবস্থায়, সম্ভব নয়; দ্বিতীয়টি চেষ্টা করলে

নারীরা ব্যবস্থা করতে পারে, তবে প্রাকৃতিক কারণে দুর্বল থাকাকালিন কখনও নয়। যেমন গর্ভধারণ কালে, সন্তান লালন পালন কালে এবং আরও কিছু কিছু সময়ে। প্রকৃতির নিজের রাজ্যপাটে এই ধরনের ভাঙ্গাচোরা ব্যবস্থা চলে না, যেমন চলে না রাজ্য-শাসনের ক্ষেত্রে। সিংহাসন কখনও শূন্য থাকতে পারে না। তেমনি সুরক্ষার কোনও ছুটি হয় না, 'নো হলিডে ইন সিকিউরিটি।'

বাধা পেলাম তনিমার কাছে। 'এক অথবা দুই, ব্যাস' এর আমলে আমাদের নোতুন করে ভাবতে হবে উভয় বিষয়ই, সন্তান ধারণ এবং প্রতিরক্ষা দুটোই। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বাদে ভারতের ছিয়াশী কোটি দ্বিগুণিত হয়ে হবে একশো বাহাত্তর কোটি — সে দিনই টেলিভিশনে দেখলাম এবং শুনলাম —। তাহলে আইন করে — যেমন চীন দেশে কড়া ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে — 'একও নয়, ব্যাস'— এর ঘোষণা হতে বেশি বিলম্ব আছে বলে মনে হয় না। আর যদি সমাজের স্বার্থে নারী প্রকৃতির প্রধান সীমাবদ্ধতাটুকু উঠে যায় তাহলে দুর্গা ব্যানার্জীদের সংখ্যা শুধু আকাশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। ভারোত্তলনে বাঙ্গালীকন্যা, অথবা তীরন্দাজীতে অথবা ফুটবল ক্রিকেট মাঠে, অফিসে-কাছারিতে ক্যারাটে-জুডোতে এবং প্রধানমন্ত্রীত্বে — সর্বত্রই যদি নারীদের সমান যোগ্যতা থাকে তাহলে সুরক্ষার কবজটি কেন মাত্র পুরুষের বাহুবন্ধে আটকা থাকবে? আর তাছাড়া ক'জন পুরুষ সুরক্ষকের দায় বহন করতে সক্ষম? পলায়নপর ক্ষীণ দেহ, নতমন পুরুষের সংখ্যা কতো? মেয়েদের থেকে কম না বেশি? পরিসংখ্যান সঠিক নেওয়া আছে? এক ট্রেন পুরুষ কে কি দেখি না দু'তিনজন গুণ্ডার কাছে অবলীলায় নত হতে? স্ত্রীকন্যার সম্ভ্রম সম্মান, গয়নাগাটি, টাকাপয়সা সবইতো এইসব সুরক্ষাকারীর দল অত্যন্ত সহজেই হস্তান্তর করে দিতে পারেন নিজের প্রাণ বাঁচাতে? পাড়ায়-পাড়ায় প্রতিটি মহল্লায় আমাদের অভিজ্ঞতা কোন পরিসংখ্যানের দিক-নির্দেশ করে? তাহলে? সুরক্ষাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে স্বামী না বেছে নিয়ে 'বডি-গার্ড' নিয়োগ করলে অধিকতর ফলপ্রসূ হবে না কি? সে ক্ষেত্রে বিবাহ নয়, নিয়োগ পত্রই বিধান নয় কি?

"তুমি তো বেশ জ্বালাময়ী হয়ে উঠছো; এমন ঝাঁকে ঝাঁকে তথ্য, পরিসংখ্যান আর নারী সাফল্যের তীর ছুঁড়েছো যে আমার এখন শরসজ্জা ঘটে যাবার কথা। আমার দায় যুক্তির বিশ্লেষণে, পারিবারিক কোনও প্রতিজ্ঞা আমি করি নি এই যা বাঁচোয়া! তোমার কথার শেষ থেকে শুরু করি কারণ সেখানেই তোমার ধারণাগত গবাক্ষ-দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। সুরক্ষা না বলে একে পারস্পরিক নির্ভরতা বললে বোধহয় বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহু সমস্যা একে একে বা ঝাঁক বেঁধে হাজির হয়। তাদের অনেকগুলো ছোট অনেকগুলো বড় আকারের এবং প্রকৃতির। তাদের মোকাবিলা করতে প্রায়শই আমাদের কাছের লোকের কথা মনে হয়। অনেক সকারণের এবং অনেক অকারণের ভয় ভাবনা সমস্যা একটুখানি সহনুভূতির স্পর্শ পেলেই সহজ হয়ে যায়। সমাধানকে কাছে এনে দেয়। যে একা থাকে তার একাকিত্বই একমাত্র যন্ত্রণা নয়, সে 'আপন মনের' ছোঁয়া না পেয়ে দিশেহারা বোধ করে। একটা অভাব বোধ, একটু শূন্যতা একটা হৃদয়বিদারী বেদনার হাহাকার সমস্যাজর্জরিত একা-একা জীবনের প্রধান নিঃস্বতা। এই মানসিক ফাটল, মানসিক 'গ্যাপ' পূরণ করতে মনের মতো মানুষের সাহচর্য কি কাঙ্ক্ষিত নয়? বিবাহ তো সেই কাঙ্ক্ষিত জনকে সেই আপনজনকে জীবনের সুখ-দুঃখে, হাসি-আনন্দে-বিষাদে পারস্পরিক করার প্রক্রিয়া। যে নামেই তাকে ডাক না কেন বিবাহের প্রয়োজন এবং মাধুর্য কি তাতে বিন্দুমাত্র কমে বাড়ে?"

এবার আমার বক্তব্য যেন অনেকটাই বক্তৃতার মতো হয়ে গেল। নিজেই বুঝতে পারছিলাম। তনিমার আক্রমণাত্মক উপস্থাপনাই বোধহয় আমাকে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। তাই ওর চোখে আবার

সেই ঝিলিক দেখলাম। নিজেকে সংযত করে ফেললাম। 'ম্যাটার অব ফ্যাক্ট' হতেই হবে। তাই বললাম, —"পরিসংখ্যান যা দেয় তা অঙ্কের হিসেব। জীবনের অনুভব, অভিজ্ঞতা আর অসহায়তার কোনও পরিসংখ্যান হয় না। বহু পুরুষ যেমন ক্ষীণ দেহ, নুব্জ প্রাণ, সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, তেমনি অসংখ্য নারীরাও 'লতের' পরনির্ভর। তোমাদের মতো ডাঁটো-মন, সচেতন, বিচারশীল এবং দৃঢ়-চেতা মহিলারাও যেমন বাস্তব সত্য ঠিক তেমনিই সত্য শালপ্রাংশু মহাবাহু, ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল, পুরুষের অস্তিত্ব। অপরের জন্যে প্রাণদান করে অমরতা পায় এমন ব্যক্তিরাও যেমন সমাজে দুলর্ভ নয় — বিজন সেতুর উপর দিয়ে যেতে গিয়ে সে কথা কি কখনও ভুলতে পার? তেমনি ট্রেনে-বাসে-রাস্তাঘাটে কার আগে প্রাণ নিয়ে পলায়ন তারি লাগি কাড়াকাড়ি ঠেলাঠেলিরও তো অন্ত নেই! অতীত সভ্যতার যুগে যুগধর্মের কারণেই শিভ্যালরি যেমন ছিল পুরুষের স্বভাবের মধ্যেই, বর্তমান সভ্যতার ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিকতা, গতি-প্রাবল্য আর প্রতিনিয়তর প্রতিযোগিতার যুগে, সেই যুগধর্মের গুণেই সকলেই স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষেই পলায়নপর মানসিকতার শিকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু অভিযোগ শুধু পুরুষের প্রতিই সোচ্চার কেন? এই কারণে যে তাদের একসময়ে শক্তির, ব্যক্তিত্বের আর দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি হিসেবে আমরা জেনে এসেছি। বৃহৎ এর পতন সর্বাগ্রেই নজরে পড়ে। ছোট ছোট গাছপালার অভাব ঘটলে দৃষ্টি পড়ে না, বনস্পতির পতন কিন্তু নজর এড়াতে পারে না।"

প্রায় হাততালি দেবার মতো করে একটুখানি হেসে তনিমা আমাকে পুরুষের সার্থক প্রতিনিধি বলে বাহবা দিল। শুধু যুক্তি দিয়ে নয়, শুধু কথাবার্তা আর আলোচনার সাহায্যেই নয়, এ মেয়ে দেখছি যুদ্ধের সকল অস্ত্রই সপাটে ব্যবহার করতে জানে। আপনার বক্তব্যে ধার আছে, যাথার্থ্যও আছে। প্রয়োজনমতো উপস্থাপনায় আর কৌশলগত নৈপুণ্যেও তা ঈর্ষাযোগ্য। স্তব্ধ হয়ে শুনতে হচ্ছে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাব এক প্রধান অস্ত্র তাকে প্রশংসা করা, তার বক্তব্যের গুণগান করা। এবং যখন সেই প্রতিপক্ষ জয়ের সম্ভাব্য হাতছানিটি দেখতে পেয়ে একটু অসচেতন আরামের বাতাবরণে সহজ খোলামেলা হবেন তখন তাকে ধরাশায়ী করা অনেক সহজ। তাই মনটাকে টানটান করেই সম্ভাব্য আঘাতের জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। তনিমা বলল — পুরুষের বিচার করতে গেলে অবশ্যই তার ইতিহাসটাও কম জরুরী নয়। অতীত দিনের সেই সব বড় মাপের পুরুষরাও নেই, তাই বড় মাপের ত্যাগ, মহত্ত্ব এবং শৌর্য-বীর্যও হারিয়ে গেছে। সত্যি। কিন্তু ইতিহাসের যে পরিচ্ছেদ থেকে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয় তার পরের পরের পরিচ্ছেদগুলোও সেই ইতিহাসেরই অংশ! নারীদেব লতার সঙ্গে তুলনা করা, তাদের কেড়ে তুলে চুরি করে এবং জোর জবরদস্তি করে নিয়ে যাওয়া, তাদের বস্তু হিসেবে ঘোষণা করা — এইসব বড় মাপের 'ন্যায়'গুলোও তো সেই ইতিহাসেরই অঙ্গ? 'কন্যা-দানের' ইতিবৃত্ত তো মনু প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিরাই প্রথম ঘোষণা করেন? 'দান' কথাটা বস্তু-সম্পদ-জিনিসপত্র বিষয়েই প্রযোজ্য নয় কি? মনের 'দান' হয় না দেওয়া-নেওয়া হয়; একটা পারস্পরিকতা আবশ্যিক। কিন্তু দানে? যেখানে দেখছি দ্রব্য থেকে প্রাণিজগতে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। গো-দান, এবং তার পরেই 'কন্যা-দান'। তাহলেই বুঝুন 'তুলিটা' পুরুষের হাতেই ছিল কিনা; কলম যার জগত তার। নারী সমাজের ছবি যা কিছু অঙ্কিত হয়েছে তা তো পুরুষের তুলিতেই, পুরুষের কলমেই। ঐতিহাসিক সেই সব মহান ঋষিরা অবশ্যই অনেক বুদ্ধি, কৌশল আর প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিরূপণ করেছেন যাতে তুলি-কলম হাতছাড়া না হয়। সভ্য সমাজে তো কোথায়ও, 'পুত্র-দান' ব্যাপারটি দেখা যায় না। অথচ সেই আদি কাল থেকেই তো ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারটা সমাজে চলে আসছে। পুত্রের পিতা অর্থমূল্যে পুত্রকে বিক্রয় করছেন আর কন্যার পিতা সেই অর্থেরই মূলে 'জামাতা'-কে ক্রয় করছেন। তাহলে 'দান' নয় 'ক্রয়বিক্রয়' কথাটাই সত্যের কাছাকাছি ছিল। এবং 'কন্যা' সেইসব ঐতিহাসিক বাক্যের কর্তা স্থলে না বসে 'পুত্র' শব্দটির প্রতিস্থাপন কেন হল না এই

দীর্ঘ এবং মহান ইতিহাসের যুগ-যুগ ব্যাপী সময়ের পরিসরে? সেই তুলি আর সেই কলম নয় কি?"

আমি আমার তূণের গায়ে হাত বুলোতে লাগলাম। তনিমার শর-সন্ধান যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে আমাকে বেশ গভীর অন্বেষণে ঠেলে দিল। আমার এই ইতি-উতি অন্বেষণ সম্ভবত ওর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই অস্ত্রহীন প্রতিপক্ষকে অস্ত্রের সন্ধানে সময় দিতেই বোধহয় তনিমা উঠে গেল, — আপনার জন্যে এক পেয়ালা চা-এর ব্যবস্থা করে আসি! আমি ফর্সা নই; গালের বর্ণ-বিপর্যয় অপরের দৃষ্টি গোচর হবার কথা নয়। তবে তনিমার চঞ্চল পদক্ষেপে জয়ের ধ্বনি যেন রিনি রিনি বেজে উঠলো। কিছুক্ষণ যেন শূন্য এক অসহায়তার মার খেলাম। এই এত্তোটুকু একটা মেয়ে, হলই বা ত্রিশের কোঠায়, আমার অর্ধেকই তো মাত্র! নিজেকে গুছিয়ে নিতে সচেষ্ট হলাম।

নিজে তনিমা চা পান করে না। চা টা করে কিন্তু অপূর্ব। টি পট থেকে চা ঢেলে দিতে দিতে আড় চোখে আমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। 'কি কিছু পেলেন? কোন অস্ত্রের সন্ধান?' চা'টি যেমন উপভোগ্য লাগল তেমনি ওর এই তির্যক শব্দ-সন্ধানের মধ্যে ওর আশু জয়ের স্বাদে উদ্বুদ্ধ মনটাকেও আমার বেশ সরস বলে মনে হল। বললাম — "পেয়েছি, তবে পথটি বঙ্কিম। ঘাড়টি ঈষৎ হেলিয়ে দিয়ে চুলের গোছাটিও বাঁ হাতে সামনে বুকের উপর ছুড়ে দিয়ে চোখ কুঞ্চিত করে বলল, 'বঙ্কিম? সে কেমন? প্রকাশে প্রাঞ্জল হয়ে পড়ুন।"

বলতেই হল — শব্দ তত্ত্ব বিষয়ে অবহিতির উপরে আমার শরক্ষেপ নির্ভর করছে। কমলাকান্তের এক ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিজ্ঞা করার ব্যাপারটা উল্টে গেছিল। তা তুমি জান। এবারে নিজের মস্তিষ্ক ঝাঁকিয়ে দেখ জান কিনা যে আমাদের কাব্য-সাহিত্য-দর্শনে অনেক শব্দ আছে যাদের উৎস দ্রব্যমুখী, জড়-কেন্দ্রিক। কিন্তু চলে আসছে বলেই তারা মানসিক গুণের প্রকাশ মাধ্যম হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যক্ষ নিয়ে বার্টাণ্ড রাসেলের বিদগ্ধ আলোচনা আছে, আছে অন্যান্য অনেক অতীত এবং বর্তমান দার্শনিকদের। 'জড়-উৎস শব্দের মন-সম্ভব ব্যবহার আমাদের 'হেরিটেজ'। তুমি যে মন 'দেওয়া-নেওয়ার' কথাটা বলেছিলে তখন একবারও ভেবেছিলে যে মন কোনও বস্তু নয় যে 'দেওয়া' বা 'নেওয়া' যাবে? কবি কি একবারও দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছিলেন যখন 'কার আগে প্রাণ যে করিবে দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি' লিখেছিলেন, প্রাণ কি 'দান' করার বিষয়, আর তা নিয়ে কি 'কাড়াকাড়ি' ক্রিয়াপদের ব্যবহার 'বাস্তব-সম্মত'? রক্ত বর্ণ চক্ষু দেখে এবং মুষ্টিবদ্ধ উত্তোলিত হাত দেখে আমরা 'দেখতে' পাই সে ব্যক্তিটি রেগে গেছে; চোখের সামনে বরফ দেখেই তা ঠাণ্ডা 'দেখি' আর রক্তবর্ণ উত্তপ্ত লৌহ-খণ্ডে গরম দেখি। তাহলে? 'দান'-শব্দের ব্যবহার উল্লেখ করে যে তোমার ওজঃস্বিনী বক্তব্য প্রবাহিত হল তা কি এখন প্রশমিত হল? তুমি আমাকে যে অমৃত-কল্প চা'টি পান করালে সে তো তোমার দান। তুমি আমাকে তৃপ্তি 'দান' করেছো। অস্বীকার করতে পার? চা নয় — চা তো বস্তু, সুতরাং দান-যোগ্য; কিন্তু তৃপ্তি?

বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম তনিমা নরম হয়ে পড়ছে। দু'হাতে বুকের উপর ছড়িয়ে থাকা অবিন্যস্ত চুলের রাশিকে বাগ মানানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত, দৃষ্টি অধিকাংশ সময়েই সেই চুলের সদা পরিবর্তিত অবস্থায় আর অবস্থানে। এবারে স্বাদের হাওয়া একটু একটু করে ঘুরছে বলে মনে হল। সম্ভাব্য জয়ের স্বাদ! ছেড়ে দিলে চলবে না তাই লোহা গরম থাকতে থাকতেই আবার ঘা দিলাম, সেই 'দান' যদি কন্যা না হয়ে পুত্রের হত তাতে এমন কি ইতর বিশেষ হত? সেই রুটি ভাগ করার গল্প স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যে বন্ধু ভাগ করল সে অন্যকে কম অংশটি দিল, নিজে বড় অংশ

নিল। বঞ্চিত বন্ধু বলল যে সেই ভাগই শ্রেষ্ঠ যেখানে ভাগকারী কম অংশ নেয়, এবং অন্যকে বেশিটা দেয়। শুনে প্রথম বন্ধু বলল, 'তাহলে তো মিটেই গেল ; তুই ভাগ করেছিস ধরে নে!' যে দানে একপক্ষের মর্মব্যথা অসম্মান আর বস্তু-স্বভাব ঘোষণা করা হয় সেই দানই অন্য পক্ষের ক্ষেত্রে তো আর অন্যথা হবার নয়! এক 'দানে' যে দুটি জীবন গ্রথিত হয় 'একপ্রাণ একতায়' সেই দানেই যদি ত্রুটি তাহলে কথা আলাদা ; কিন্তু 'দান' যদি স্বীকার করেই নিতে পারি, অন্যার্থে ভাবলে আর ক্ষোভ কেন?

তাছাড়া আমার মূল বক্তব্য বিবাহ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে নয়, যৌথ-জীবন যাপনের সমাজ-স্বীকৃত ব্যবস্থায়। গোলাপকে দরকার হলে অন্য নামে ডাক না ; আপত্তি করব না ; আপত্তি করব যদি সেই গন্ধের বিষয়ে প্রতিবাদ কর, সেই বর্ণদ্যুতির সৌন্দর্যে আক্রমণ কর, আপত্তি করব যদি আক্রমণ কর তার পেলব-নরম-মধুর অস্তিত্বের দ্যোতনায়! ছাতনা তলায় যাওয়াটা অনিবার্য নয়, অনেকেই যায় না ; মন্দিরে-চার্চে যেতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। যত মত তত পথ শুধু ঈশ্বর প্রাপ্তিতেই নয় ; জীবনের সকল সুন্দরকেই কোনও পিচ্‌-ঢালা পথে প্রাপ্তব্য এমন কথায় আমার সায় নেই। বিবাহ একটা সম্বন্ধ, একটা সম্পর্ক, একটা নৈকট্য। তাকে না পেলে, গ্রহণ-স্বীকার না করলে জীবনটাই তো একা-একা হয়ে যায়। বিবাহ একটা মনকে অন্য একটা মনের সম্বন্ধে সম্পর্কে নৈকট্যে আপন করে ফেলে। অনুষ্ঠানটা বাদ দিয়ে সেই 'আপন-করা'টাকে যদি সত্য বলে মেনে নিতে পার তাহলে 'যা অবশিষ্ট থাকে তা ঐ অনুষ্ঠানটি, সে কথা আলাদা করে আলোচ্য।

তনিমার দিকে তাকিয়ে আমার মনে তির তির করে একটা প্রতিদান খুনসুটি বাসনা জেগে উঠলো, — তুমি তো চা খেলে না, একটু সরবত খাবে? তনিমা অসি ঝলসানো চোখে আমার দিকে তাকাল। পরক্ষণেই হেসে ফেলে বলল, — নাকের বদলে নরুন আর চা-এর বদলে শরবত? পাশার দান কিন্তু একবারই ওল্টায় এমন কথা নেই! একটা ঝির ঝিরে হাল্কা বাতাসের প্রাণস্পর্শে আমরা দুজনেই আবার সজীব হয়ে উঠলাম। তনিমা কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। টেবিলে কনুই রেখে বলল, স্বামী যখন স্ত্রীর মাথায় আঘাত করে (অথবা পৃষ্ঠ দেশে, বা চুলের মুঠি ধরে আকর্ষণ করে) তখন কিন্তু এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির উপরই কেবলমাত্র পাশবিক অত্যাচার করে না। সেখানে সম্পর্ক সম্বন্ধ সবই অস্বীকার করে বসে। এ-ধরনের সম্পর্ক অস্বীকারের ঘটনার জন্যে পাশবিক — শারীরিক শক্তির প্রয়োগ-প্রয়োজন হয় না, মানসিক যাতনা এবং চিন্তা-ভাবনা-অনুভবের পীড়নও যথেষ্ট বলে গণ্য হওয়ার কথা। দুটি প্রাণের 'আপন' হয়ে ওঠাটাই যদি বিবাহ-রূপ অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমার প্রশ্ন দ্বিবিধ: এক, পুত্রার্থে কথাটা কেন চালু হল এবং কন্যাসন্তানেরা কেন এখন পূর্বাহ্নেই বিনষ্টির পথে, এমনকি বিজ্ঞানের সহায়তায়? এখানে কি নারীরা ব্যবহৃত নয়? সব মায়েরাই কি এক অর্থে সারোগেট মাদার নয়? আমাদের দেশীয় গাভী যেমন ব্যবহৃত হয় শংকর প্রজাতি তৈরি করতে? আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সেই 'আপনত্বের' বিষয়ে সংসারে। আপন ভাব, আপন-বোধ, যতদিন থাকবে ততদিনই স্বামী-স্ত্রী ; যখনই যে ভাবেই হোক, সেই ভাব সেই বোধ অবসিত তখন কেন সেই বিড়ম্বনাকে বয়ে বেড়াতে হয়? তখন অবশ্য 'তালাকের' ব্যবস্থা আছে, আছে 'ডিভোর্সের' বিধান। কিন্তু কেন ছেলেরাই মাত্র তালাক দিতে অধিকারী? কেন ডিভোর্সের জন্যে আইনকানুনের এতো দড়াদড়ি? তাহলে জেনে বুঝে সেই একদ্বার গুহামুখে কেন প্রবেশ করবে নারীরা যেখানে পুরুষের সহস্র পথ খোলা?

তনিমা যখন ঝুঁকে পড়ে টেবিলে তার কনুই দুটি রেখে বক্তব্য রাখল তখন বোধহয় ও বোঝাতে চাইল: প্রতিপক্ষের জন্যে এবারে ধরা-শয়ন অস্ত্র ক্ষেপন করবে। যদি পার সামলাও!

কিন্তু যখন শেষ করল ওর ক্ষুরধার প্রশ্নদ্বয়কে দিয়ে তখন আমার মনে আনন্দের প্রথম 'ফ্ল্যাশ' টের পেলাম। ওর চোখে চোখ রেখে মিটি মিটি হাসছিলাম। ওরই পূর্বব্যবহৃত অস্ত্র — তখন যেন তনিমা হঠাৎই ব্রেক টেনে দিল। সময়ের বিন্দুমাত্র অপব্যবহার না করেই বললাম, তুমি যখন প্রথম আলোচনায় বসেছিলে তখন কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝেছিলাম যে সূচ্যাগ্র জমিও তুমি বিনা যুদ্ধে আমাকে ছাড়বে না। মনে মনে শংকাও হয়েছিল। তোমার মতো তাজা প্রাণ, সচেতন মনের এক অসমবয়সী তার্কিকের সামনে এই পড়ন্ত বেলায় আমি হালে পানি পাবো তো? যদি তোমার কাছের বয়স থাকত তা হলে অনেক আগেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে জয়ী হতাম! তা এখন দেখছি তুমি আমাকে স্থানচ্যুত না করে অর্ধেক জমি ছেড়ে দিলে! তোমার প্রতিবাদ এখন আপন-করা যৌথ জীবনের সপ্তপদীতে নেই, তা এখন একদিকে অনুষ্ঠানের রীতি-নীতিতে এবং অন্যদিকে আপনত্ব-হীন দ্বিত্ব জীবনকে টেনে টেনে বেড়ানোর অসম্মানে গিয়ে ঠেকেছে। অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি বিষয়ে আগেই বলেছি, যত মত তত পথ। সেতো ছিল, আছে এবং থাকবেও। তাই সেখানে স্বাধীনতার এলাকা সুপরিসর। তাহলে রইল তালাক-ডিভোর্সের দড়াদড়ি কড়াকড়ি আর পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি। আমার উপস্থাপনায় তনিমা যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। ও আমাকে বাধা দিতে চায়, বোধহয় বলতে চায় 'সে কথা আমি বলি নি' কিন্তু কি কথা যে বলেছে তা গুছিয়ে নিতে পারছিল না বলে কিছু বলতেও পারছিল না। প্রতিপক্ষকে 'কনফিউজড়' অবস্থায় কখনও সময় দিতে নেই — এই নীতিতে আমি আক্রমণ জারি রাখলাম:

—সমস্যাকে এড়িয়ে গেলে, সমস্যা থেকে দূরে পালিয়ে গেলে কখনই কি সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়? সংগ্রাম, সংঘর্ষ অনিবার্য হলে তার মুখোমুখি হওয়াটাই সমাধানের পথ। অন্য গোলার্ধে নারীদের নাগরিক অধিকারই ছিল না, তাদের ব্যক্তি বলেই মনে করা হত না। আমাদের ইতিহাসে নারীরা সমানাধিকার পেয়েছে, ভোগ করেছে। যদিও পরিমাণের দিক থেকে তা যৎসামান্য। ব্যতিক্রম তো নিয়মকেই প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সর্বত্রই তো সংগ্রাম চলছে, চলেছে, চলবে। নারীরাই একমাত্র বঞ্চিত নয়; বঞ্চিত কালো গাত্রবর্ণের ব্যক্তিরা বঞ্চিত বর্ণাশ্রম-বিভক্ত বিরাট জনগোষ্ঠী, বঞ্চিত আর শোষিত ধিক্কৃত জীবন আর পর্যুদস্ত অস্তিত্ব নিয়ে বহু গোষ্ঠী, বহু সম্প্রদায় শক্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধিকার অর্জন করেছে করছে করবে। নারীত্ব কোনও একক শোষিত অস্তিত্ব নয়। দারিদ্র শোষিত, নিম্নবর্ণের জন্ম শোষিত এমন কি বহু পুরুষ শোষিত বহু বর্ণ-উজ্জ্বল জাতিও শোষিত। শক্তির অপব্যবহার অন্যায়ের প্রাদুর্ভাব, সত্যের অপলাপ আর সুন্দরের ধর্ষণ কোনও জাত-বিচার করে না, ব্যক্তি বিচার করে না, গোষ্ঠী বিচার করে না। মানুষের ইতিহাস যেমন আবিষ্কারের ইতিহাস, উন্নতির ইতিহাস, জ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস, ঠিক তেমনই তা দুর্বলের নিপীড়নের, দরিদ্রের শোষণের, শ্রমজীবীদের ঠকানোর আর নির্যাতনের ইতিহাস, বলতে পার। এটাও তো শ্রেণী সংগ্রাম। তাহলে? বিবাহ যদি সেই সংগ্রামের নাম হয়, যুদ্ধের রণক্ষেত্র হয় তাহলে সেই সমানাধিকারের যুদ্ধে শ্বেত-পতাকা উড্ডীন করা বা রণক্ষেত্র ত্যাগ করার মধ্যে আর যাই থাক স্বাজাত্যাভিমান থাকে না, ব্যক্তিত্বাভিমান প্রকাশ পায় না। আইন-কানুন রীতি-নীতি যদি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত না হয়ে থাকে তাহলে তাকে পরিবর্তন করার জন্যেও তো মুখোমুখি হতে হবে।

জয়ের সম্ভাব্য আনন্দে কখন যে নিজে হাতেই তনিমার তূণে অস্ত্র তুলে দিয়েছি তা একেবারেই খেয়াল হয় নি।আমার কথা শেষ হল না, তনিমা বলে বসল, — সেই যুদ্ধই বলুন সংগ্রামই বলুন আর সংঘর্ষই বলুন, তার জন্যে তো ছাঁদনাতলার হলুদ গায়ে মাখা অনিবার্য নয়, রেজিস্ট্রি অফিসের সই-সাবুদও নয় আবশ্যিক। যুদ্ধ করতে সিপাহী হতে হয়, ঘোমটা দিতে হবে এমন তো কোন কথা

নেই। আমি সেই যুদ্ধেরই সৈনিক। সমস্যাকে এড়িয়ে যাচ্ছি না, এড়িয়ে যাবার প্রশ্নই নেই। কাউকে যদি আপন বলে মনে হয় এবং সেও যদি আমাকে আপন বলে মনে করে, যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার সম্পর্ক, সম্মানের নৈকট্য ঘটে তা হলে তাকে তো আমি উর্ধ্ববাহু হয়ে আবাহন করব। সামাজিক শৃঙ্খলের জাতপাতের সপ্তপদী বন্দনরজ্জুটি কি এতোই কিছু মহৎ? মনের মিল যেমন শূন্যতাকে দূর করে, তেমন কি কোনও সামাজিক ডেনড্রাইড বা কুইকফিক্সে সম্ভব। শরীরের জোড় এবং জোর কোনও কাজের কথাই নয়। কাজে কাজেই সেই শৃঙ্খলমোচনের জন্যে কাঁধে কাঁধ মেলাবার মতো কাঁধ পেলেই মা ভৈঃ। তাছাড়া চারদিক খোলাচোখে এবং খোলা মনে তাকালেই দেখতে পাবেন বিবাহ ছাড়াই সহস্রপদ যাত্রার কোনও বিঘ্ন ঘটছে না। স্বাধীনতা ব্যাপারটাই বেশ মজার। যদি থাকে তাহলে তার ব্যবহার না করলেও কষ্টের কারণ থাকে না; আর যখন থাকে না তখন প্রতি পদে পদেই মনে হয় বন্ধন দশাটা কত কষ্টের কতই যন্ত্রণার; যখন থাকে তখন কোনও কিছু না করেও বেশ আনন্দে সময় কেটে যায়; যখন থাকে না তখন বারে বারেই মনে হয় 'এটা করতে পারছি না, ওটা করতে পারছি না।' যেন কত কিছুই করে ফেলতাম। অর্থাৎ স্বাধীনতা একটা মনের অনুভব। বাইরের দড়াদড়ি সমাজের আচার-আচরণ পরিবারের নিয়মকানুন সব একসঙ্গে নারীদের বিবাহোত্তর জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকে দিতে চায়, শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো বাতাসেরই অভাব ঘটিয়ে দেয়। আর ট্রাজেডি কোথায় জানেন? সব বীরপুরুষ পুত্ররাই তখন বিনয়ের অবতার, সামঞ্জস্যের দেবদূত আর গুরুজন-মানস হয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে পরিবারের একমেবাদ্বিতীয়ম্ ক্ষেত্রটি হয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়ে পড়ে। এসবই পুরুষ প্রধান সমাজব্যবস্থার অনুদান-উপঢৌকন। পুরুষেরা সানন্দে উপভোগ করে চলেছে, নারীরা চোখের জলে আর জীবনের শ্রেষ্ঠতম মূল্যে বয়ে বেড়াচ্ছে। তাই সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করব, কিন্তু রান্নাঘরের চারদেওয়ালে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে মন যাবে না। এমন তাকাল তনিমা যেন আমি মেঝেতে লেপ্টে গেছি, একেবারে যাকে বলে ধরাশায়ী! সেই যে জমিটা ও আমাকে দিয়েছিল তার বাইরে একেবারে যেন সীমানাছাড়া করে ফেলেছে — এমন একখানা ভাব ওর চোখে আর ভুরুর বঙ্কিমে।

'এ অসম্ভব, অসহ্য' মনে মনে এরকম একটা তীব্র ভাব এলো! এবারে তাহলে বাছাধনকে মূল্যবোধের সংকীর্ণ কোণে ঠেলে নিয়ে যেতেই হবে। সেখানে ছটফট্ করবে, এক পা এদিক ওদিক করতে গেলেই হয় সুন্দরের ফাঁসী দিতে হবে না হয় সত্যের গলা টিপে ধরতে হবে। যেমনি ভাবা অমনি কাজ। বললাম, দেখ তনিমা, তোমার মুক্তপক্ষ অত্যাধুনিক জীবন-সত্য উদ্ঘাটনের মধ্যে তুমি বোধহয় 'লিভিং টুগেদারের' বিষয় উল্লেখ করেছো। একেবারে বাধাবন্ধনহীন মানসিক নৈকট্যের স্বাধীনতা অবশ্যই সেই যৌথ জীবন পরিকল্পনায় উপস্থিত। সমাজ-পরিবারের নিয়ম-নিগড় নেই, তালাক-ডিভোর্সের প্রশ্নই অবান্তর। কিন্তু যেটা একেবারেই বাস্তব তার বিষয়ে তুমি কতটা সচেতন তা আমার জানার আগ্রহকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে? তোমাদের এই নবলব্ধ স্বাধীন যৌথজীবনের ভিত্তি হল মনের মিলন। যতদিন দুই মনে দুহু কাঁদে, যতদিন এই প্রকৃত যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম অবস্থানটি স্থায়ী ততদিনই 'একত্র জীবন'। এটা যদি ঠিক হয়, আর এর সঙ্গে জীবন যদি পদ্মপত্রে নীর হয়, জীবন একটি সদাচঞ্চল সদাপরিবর্তনশীল স্রোতের নাম হয়, মন যদি দুটি মুহূর্তে একরকম অবস্থায় অবস্থান না করে তাহলে অনুসিদ্ধান্তটি কি হবে ভেবে দেখেছো? যতদিন ভাললাগে ততদিন একসঙ্গে থাকার স্বাধীনতা তোমাদের রইল। কিন্তু 'দিন' কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য কি? সেকেন্ড-মিনিট-ঘন্টা-সাল-বছর এদের সীমায় পরিমাপ করবে তো? সকালের যদিদং যদি বিকেলে হারিয়ে যায়? দুঁহু-র দুটি প্রান্তেই যদি উন্মুক্ত জন-দুকূলের স্রোতের টান লাগে? পাল-ছেঁড়া, হাল-ভাঙ্গা হয়ে মরু সাহারায় অগ্নিদগ্ধ হতে হবে না তো? আর যদি,

যুক্তিকে তার সম্ভাব্য প্রান্ত সীমায় টেনে নেওয়া যায়, সকালে বিকেলে সপ্তাহে মাসে মনের মিল হারিয়ে হারিয়ে আবার খুঁজে খুঁজে পাওয়া যায়? কোনও স্ববিরোধ নেই তো এই সম্ভাবনায়? তাহলে ব্যক্তিজীবনের যে অপচয় হবে তাকে তো কোনও মূল্যমানে বিচার করা যাবে না; সে যে সমাজের জীবন্ত আস্তাকুঁড়ের মধ্যে প্রবেশের প্রত্যয়ন পেয়ে যাবে? তাহলে? আর যদি বল যে যাকে মনের মানুষ বলে মনে করব সে চিরদিনই মনের মানুষ থাকবে, তাহলে আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাকে। এক, মানুষ সম্পর্কে এধরনের বিশ্বাস তোমার হল কি করে? যদি এই বিশ্বাস হয়েই থাকে এবং যদি তার কোনও ভিত্তি থেকেই থাকে তাহলে দরজা খোলা রাখার প্রচেষ্টা কি স্ববিরোধী নয়? আর যদি সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ থাকে, থাকাটাই স্বাভাবিক, তা হলে সে যখন তোমাকে ছেড়ে যাবে, অথবা তুমি তাকে ত্যাগ করবে তখন তোমার এই গুণে-পরিমাণে-তাৎপর্যে পরিবর্তিত 'তুমি'-কে নিয়ে তুমি কি করবে? আবার মনের মানুষ খুঁজবে? অনন্তকাল ধরেই চলবে? দুটি পদ্ধতির মধ্যে — সামাজিক বিবাহ আর 'একত্র-জীবন-যাপন' — কি মাত্র পরিজনগত, সংখ্যাগত প্রভেদই একমেব প্রভেদ নয়? স্থান-কাল-পাত্র তো সেভাবে তফাত নয়। গ্রামে বাস করতে পারবে না, মানসিক চাপ পড়বে, শহরেব ভিড়েব মধ্যে হারিয়ে গিয়ে এই 'একত্র-জীবন' অবশ্যই সম্ভব। তা হলে কি 'লুকিয়ে' জীবনকে উপভোগ করার ব্যাপার ঘটবে না? যদি ঘটে তাহলে সে কি নিজের কাছেই বেশ শ্রদ্ধার ব্যাপার হবে? অনেক কথা বলতে পেরে বেশ হাল্কা মনে হচ্ছিল। মনে হল আবার আমি তনিমার সামনে চেয়ারে স্থাপনা করতে পেয়েছি নিজেকে।

"এবারে আপনি ভীষণই রেগে গেছেন। আপনাব এতক্ষণের ভাবার সঙ্গে এখনকার প্রকাশের বেশ মাত্রাগত তফাত দেখতে পেলাম। তাই বুঝে গেলাম, আপনি রেগে গেছেন। আমার জন্যেই আপনার এই পরিবর্তন। তাই দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু বিষয়টাই তো যেন কেমন, তাই না?" প্রথমে ভেবেছিলাম বয়সে ছোট তাই বোধহয় বিনয় স্বতঃস্ফূর্ত। পরে একটু চোখে চোখ ফেলতেই বুঝলাম ভীষণ চতুরের মতো পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমি যে ওকে কোণঠাসা করতে মনস্থ করেছি তা-ও বুঝে গেছে!

"যদি রেগেই না যেতেন তাহলে নিশ্চয়ই মানসিক সংবেদ্যতার সঙ্গে দৈহিক আকর্ষণকে গুলিয়ে ফেলতেন না। মানসিক তৃপ্তি আর স্বাধীনতার সঙ্গে দেহগত নৈকট্য আর স্বেচ্ছাচারিতার প্রভেদ আপনার তীক্ষ্ণ বিচারে অবলুপ্ত হত না। আর শুধু কি তাই? আপনি তো নরনারীকে যন্ত্রের মতো মনে করে বসে আছেন, যন্ত্রণার উৎস হিসেবে দেখেন নি। একটা যন্ত্র যেভাবে চলে সে ভাবেই চলতে থাকে তার স্বাধীনতা কোথায়; অন্যভাবে নোতুন করে চলার? সেই অভিজ্ঞতারও কোনো স্থান নেই যন্ত্রের জীবনে। কিন্তু নরনারীর জীবনে অভিজ্ঞতা আনন্দ আনে যন্ত্রণারও কারণ হয়। আর সেই সব অভিজ্ঞতার আলোকে তারা তাদের অনাগত দিনগুলোকে নোতুন করে তৈরি করে নেয়। তাই 'মাক্রো' বিশ্লেষণের প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অন্তত মানুষের ক্ষেত্রে 'মাইক্রো' পরিসরে সত্য নাও হতে পারে। যুক্তিকে একভাবে বিন্যস্ত করলে ছিলে-ছাড়া তীর কোনও দূরত্বই অতিক্রম করতে পারে না কারণ প্রত্যেক একক দূরত্ব যেতে হলে তাকে, তার পূর্বে সেই এককের অর্ধাংশ পার হতে হয়, এবং এই প্রক্রিয়ায় যুক্তিকে সচল করলে যা হয় তা বাস্তবসম্মত নয়। জীবন যুক্তি বা যুক্তির জাল নয়; জীবন বাঁচার বিষয়; চলমান ধাবমান এবং অনুভব-উপলব্ধি আর ধারণা ইত্যাদির নির্দেশিত পথে প্রত্যেকটি জীবনই স্বতন্ত্রভাবে যাপন করে নিতে হয়। তাই অশ্রদ্ধেয় অবস্থায় পৌছানোর কোনও কার্যকারণ সম্বন্ধ এখানে একমাত্র উত্তেজিত হলেই দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে অনেক বিবাহিত ব্যক্তি, অবিবাহিত অথবা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া স্ত্রী বা স্বামীরা স্বভাবের তাড়নাতেই বিন্দু-জীবন বা ক্ষণ-সুখ জীবন সন্ধান করে থাকে। লিভিং টুগেদার-এর সঙ্গে

যেমন নেই তার কোনও সংস্রব বিবাহের সঙ্গে তেমন নেই কোনও সম্বন্ধ। প্রত্যেকের জীবনের মূল্যবোধ মোক্ষ বা তৃপ্তি প্রত্যেকের নিজের। আর সখ্যতা বিষয়ে তো সেই সর্বজনস্বীকৃত সেক্স লেখক সিগমণ্ড ফ্রয়েড বলেছেন যে তা আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অস্বীকারের দ্বারাই অর্জন করে থাকি। নরনারীতো পাথর বা 'মার্বেল' নয় যে গড়ালে নিচু বা ঢালু জমিতে গড়িয়ে নিচে নেমে যাবে!

যে পরিস্থিতির মধ্যে তনিমাকে আটকানো যাবে ভেবেছিলাম সেই অবস্থানেও সে যে পঙ্কজের মতো মাথা তুলে নিজেকে পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যে সংস্থাপন করলো তা দেখে একদিকে আমার আনন্দ হল, অন্যদিকে ভয়ও হল। আনন্দ হল এই ভেবে যে চিন্তার এবং অনুভবের মধ্যে একটা স্পষ্টতা না থাকলে এই উত্তরণ সম্ভব নয়; আর ভয় হল এই জন্যে যে সম্ভবত শেষবারের মতো চা'টুকু তনিমাই পরিবেশন করবে! আমি সাতপাঁচ ভাবছি, কিন্তু দক্ষ উকিলেব মতো ম্রিয়মাণ প্রতিপক্ষকে হাতছাড়া করে নবজীবন অনুসন্ধানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতেই যেন তনিমা বলে উঠল—

"যৌথ জীবন বলতে আপনিও দুটি নারী-পুরুষের মনোনির্ভর একীভূত জীবনকে বুঝিয়েছেন। অথচ বিবাহের মধ্যে সামাজিক স্বীকৃতির কারণেই একাধিক জীবনের যোগের অনুসিদ্ধান্তটি সংযুক্ত করে চলেছেন। অন্যেরা 'ক্যানভাস', সেই ক্যানভাসে জীবনের বহমান বর্তমানগুলো সদাসর্বদা আত্মপ্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সেই বহুজনের প্রতিবেশে, বহুমনের টানাপোড়েনটিও অনস্বীকার্য। সহায়ক না হয়ে পরিপন্থী হয়ে দেখা দিতে পারে, দিয়েই থাকে সেই দ্বৈতজীবনের বহু-ক্ষেত্র প্রতিস্থাপনে। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্যেই ব্যক্তি সচেতন যুগে বহুর সঙ্গে যোগাযোগ কাঙ্ক্ষিত হলেও সেই বহুত্বের আরোপ সর্বাংশে আরামদায়ক প্রার্থিত এবং কাঙ্ক্ষিত নয়। যত মন তত জটিলতা, যত প্রত্যাশা ততই হতাশা; যত বেশি স্বার্থ-কেন্দ্র তত বেশি বিভেদ-সংঘাত। যদি বলেন আপনজনের সকলকে সামঞ্জস্যের, ভালবাসার আর প্রীতির বন্ধনে সামিল করা তো স্ত্রীর বা সুগৃহিণীর কর্তব্য, তাহলে সেই যুক্তিকেই 'ম্যাক্রো' প্রেক্ষিতে টেনে নিয়ে বলব: বিশ্বমানবতাই সেই মনোভবের সমাপ্তিস্থল, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব-প্রেম। তার আগে থামার কোনও যুক্তি আপনার তূণে অবশ্যই খুঁজে পাবেন না। আর যদি এই যৌক্তিক অবস্থানকে মেনে নিতে পারেন তাহলে এক, দ্বৈত জীবন এবং একমাত্র দু'জনের নিবিষ্ট জীবনই কাম্য, একক হিসেবে, মূল-ভূমি হিসেবে। দুই, এই জীবনে বাইরের বন্ধন, 'স্যাংশন' বা আরোপ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী, এবং তিন, উভয়ত স্বাধীনতা স্বীকৃত বলেই কোনও অকারণ পীড়নের সম্ভাবনা, হাই-হ্যাণ্ডেড-নেসের সুযোগ উভয়ত অনুপস্থিত থাকছে। 'আমি তোমার স্বামী' — বলে আস্ফালনের যেমন কোনও সামাজিক ব্যক্তিক ক্ষেত্র থাকছে না ঠিক তেমনি 'রহিল তোমার এ-ঘর দুয়ার' বলে 'মাইকে' প্রস্থানেরও কোনও কারণ ঘটছে না। আমরা স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে আগেই জেনেছি, বলে নিয়েছি। স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ তো আর স্বাধীনতা নয়, মানসিক মুক্তির অনুভব বিশ্বাস এবং স্বীকৃতিকেই তো আমরা স্বাধীনতা বলে মেনে নিয়েছি। বন্ধন থাকবে না তা আমি বলছি না; কিন্তু শুধু বলতে চাই যে সেই বন্ধন বাইরের আরোপ হবে না, সচেতন ব্যক্তি-অস্তিত্বের গভীর প্রত্যয় থেকে উৎসারিত হবে মাত্র। পরিবারের 'এটা কর, ওটা কর না' সমাজের লোকে কি বলবে এবং আইন কানুনের দলিলদস্তাবেজ সদা সর্বদাই মানুষের ব্যক্তিমনকে ক্ষুদ্র করে দেয়। ডিটারমিনিজম্ নয়, ইনডিটারমিনিজম্ নয়। আমার বক্তব্য সেলফ্-ডিটারমিনিজিম। যেন বলতে পারি আমার মুক্তি তোমার মুক্তির আলোয় আলোয় — নারী পুরুষকে এবং পুরুষ নারীকে।"

তনিমার সব কথা আমি মন দিয়েই শুনছিলাম। ওর বক্তব্যের মধ্যে যে যুক্তির ক্রমপর্যায় ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছিল আমি শুধু তো সেই যুক্তিকেই অনুসরণ করছিলাম না, ভিতরে ভিতরে পাশে পাশে যে উপলব্ধির অনুরণনটি সর্বক্ষণই বেদনার মতো বেজে চলেছিল তাকেও তো আমি আমার অন্তর দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করছিলাম। তাই এখন আমি আর ওকে প্রতিপক্ষ বলে মনে করছিলাম না। জীবনের প্রায় সবটা পথ পার হয়ে এসে অতীতের ঘটনাগুলো এখন অনেকটাই সমতল হয়ে এসেছে আমার কাছে। সমসাময়িক আনন্দের ঢেউগুলো, আর বেদনার কণ্ঠকাঘাতগুলো প্রায় সবই তাদের তাৎক্ষণিক তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছে। তনিমার জীবন বর্তমানগুলোকে দু'হাতে জড়িয়ে সরিয়ে আর সমসাময়িকতায় মাখামাখি হয়ে এগিয়ে এসেছে, সংস্কার, বিশ্বাস আর উচিত অনুচিত বোধের নিরিখে, তনিমারা যদি সেইসব তেমনি করে মেনে নিতে না পারে তাহলে ওদের দোষ দেব কোন অধিকারে? তাই ওকেই প্রশ্ন করলাম, "তনিমা তোমরা কি অতীত ব্যবস্থার মধ্যে কোনও ভালকে দেখতে পাও না, কোনও শুভকে?"

খিল খিল করে হেসে উঠলো তনিমা, "এবারে আপনি মোক্ষম ঘুঁটি সাজালেন, মাত করার মতো একটা চাল এতক্ষণে আপনি দিলেন বটে! কোনও সমাজ কি বেঁচে থাকতে পারে যদি তার আচার-বিচারে, তার রীতি-নীতিতে তার বিশ্বাসে-সংস্কারে ভালর আর শুভের উপস্থিতি না থাকে? সব প্রচলিত ব্যবস্থাই প্রয়োজনের তাগিদে শুভের উদ্দেশ্যে এবং সুন্দরের সাধনায় প্রবর্তিত হয়। এইসব রীতি-নীতি সংস্কার-বিশ্বাস আচার-বিচারগুলো সমাজব্যবস্থায় প্রাণের সঞ্জীবনী ধারার মতো জীবন প্রবাহকে সুন্দর, গতিশীল আর সার্থকতা এনে দেয়। কিন্তু সমাজ, সমাজের শক্তি এবং প্রভুত্বের প্রতিনিধিরা স্বার্থরক্ষার জন্যে অনেক আবর্জনা, অন্যায় আর অবিবেচনা-অধর্মকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভাসিয়ে দেয় সেই প্রবাহে। 'পলুউশন' অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যা প্রথম থাকে সুপেয়, প্রাণদায়িনী তাই ক্রমশ হয়ে ওঠে অপেয় প্রাণঘাতিনী। দৈনন্দিন স্বার্থপরতা আর সুযোগসন্ধানী মানসিকতার কারণে অনেক কাঙ্ক্ষিত অতীতই অনাকাঙ্ক্ষিত বর্তমানের জন্ম দেয়। সম্ভবামি যুগে যুগেই বলুন আর সেই দার্শনিকের কথায়ই বলুন সভ্যতাকে যদি সভ্য রাখতে হয় তাহলে অতীতের পুনর্মূল্যায়ন মাঝে মাঝেই হওয়া দরকার। অতীতকে ধ্বংস করে সেই ধ্বংসাবশেষের অন্তর থেকে সম্পদ আহরণ করেই একমাত্র অর্থবহ বর্তামান গঠন সম্ভব। কথাটা যেমন সৃষ্টির আনন্দ, তেমনিই আবার সৃষ্টির বেদনা। আনন্দ আর বেদনা দুটোই সমান ভাবে সত্য!"

তনিমা কি যেন ভেবে থেমে গেল। মনে হল ওর চিন্তার 'পয়েন্টস-ম্যান' বোধহয় দিক এবং লাইন পরিবর্তনে আগ্রহী। আমি তো আগেই স্থির করেছি ওকে বাধা দেবো না। খোলা জানালায় অনেকদূর দৃষ্টিপ্রসারিত করে যেন নোতুন দিগন্তের সন্ধান পেল। বলল, অনেক তত্ত্বকথা আলোচনা হল; এবারে আপনাকে ক'একটি তথ্যের ভিত্তিতে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম! ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবে নাকি? তৎক্ষনাৎ ভয় কেটে গেল, কারণ তনিমার রুচিবোধ এবং পরিমিতিবোধ যথেষ্টই উচ্চস্তরের। "গ্রাম দেশে কন্যাদের লাল কাপড়ে লপেটা করে, চন্দনচর্চিত ললাটে যারা বৌ করে ঘরে নিয়ে যায় তারা তো 'দাস' বা 'ভূমিদাসের' মতো করে গৃহকর্মনিপুণা অবৈতনিক একটি ঝি-রাধুনী-সংখ্যাবৃদ্ধিকারিণী প্রাণীকে সংগ্রহ করে নেয়। কিন্তু শহরে কি অন্যরকম হয়? কম বেশি মানসিকতা কি একই রকম নয়? শিক্ষিতা, সঙ্গীতজ্ঞা, ফর্সা ইত্যাদি ইত্যাদি সর্বগুণান্বিতকে যে বন্ধনে আবদ্ধ করা হয় তা কি সেইসব পূর্ব নিশ্চয়কৃত গুণাবলির পরবর্তী পরিশীলনের মানসে? স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা শিক্ষা দীক্ষা চেতনা-অনভুব সবকিছুই তো ধীরে

কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সংসারের রন্ধনশালার অথবা পরিবারের খিদ্‌মদ্‌গারিতে সর্বথা নিয়োজিত। তাহলে সেই সব শিক্ষাগত গুণাবলি কেন বাজার দর ধরে? ব্যক্তি অথবা পরিবারের সম্মান, 'প্রেস্টিজ' নয় কি? অন্যথা অনেকেই চাকরি করাতে চান, অথবা চাকুরিরতা খোঁজেন। কেন? সেই একই কারণে নয় কি যে কারণে বাংলাদেশের ঘোষেরা দেশী গাভীর বদলে 'জারসী'তে আগ্রহী? আবার অগ্নিদগ্ধ জীবনান্ত! কেন? অর্থের সংগ্রহে অসমর্থ অথবা পুরুষের উদ্দেশ্যসাধনের অন্তরায়? যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন মূল কথাটি সেই পুরুষপ্রাধান্য! যতদিন এই সমাজ-শক্তির এবং পরিবার-শক্তির কেন্দ্রটিতে পুরুষের অবস্থান থাকবে ততদিনই এই অত্যাচার, শোষণ আর অন্যায় সমাজে চলতে থাকবে। অতীতেও ছিল এখনও আছে। তখন জানার মাধ্যম ছিল না, এখন আছে, অবশ্যই আংশিক। আপনাদের আইনের ধারাতেও আছে কিন্তু কখনও শুনেছেন প্রতিকারের জন্যে কোনও স্ত্রী বিচারের দ্বারস্থ হয়েছে? স্বামীর বিরুদ্ধে বলাৎকারের অভিযোগ আইনসিদ্ধ, 'বৃত্তি'-তে লাগানো বা 'বৃত্তিসম্ভব ভাবে ব্যবহার গর্বিত! কিন্তু শতসহস্র গৃহে ঘটেছে, ঘটছে। কিছু কিছু ঝলক আপনারা গল্পে সাহিত্যে খবরের কাগজে, সিনেমা থিয়েটারে দেখে থাকেন। কিন্তু পুরুষ সমাজে নারী কেন স্বাধিকার মানস হয়ে উঠতে পারে না? পারে না তার কারণ দড়াদড়ির বন্ধন, মানসিক শৃঙ্খল, আর বিচারকের আসনে অপরাধীরাই জাঁকিয়ে বসে আছেন যে! কার কাছে দাঁড়াইবে বিচারের আশায়, প্রতিকারের প্রার্থনায়? অন্যায় যে করে, যারা করে, দহন তাদের বিধিলিপি নয়, যে সেই অন্যায় সহে দহন তারই কপাল লিখন!

এইসব অত্যাচার অবিচার আর শোষণ ধর্ষণের ইনডিয়া গেটের নাম 'বিবাহ'। অত্যন্ত মিষ্টি অত্যন্ত মোহময় এবং বাজি বাজনা ফুল মালায় শোভন শালীন একটা প্রক্রিয়ার নাম বিবাহ। সতীদাহের সময়কার ব্যবস্থাপনাও অনুরূপ হট্টআনন্দের সমারোহেই হবার ব্যবস্থা ছিল। সেখানেও আগুন, বিবাহ-যজ্ঞেও আগুন! প্রতীক একই, প্রত্যয় আলাদা! উদ্দেশ্য প্রায় এক — 'প্রায়' এই জন্যে যে এক ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের অবসান অন্যক্ষেত্রে মানস-স্বাধীন-জীবনের।"

সম্ভবত তনিমা আমার প্রতিক্রিয়া বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পারছিল না। হয়তো তথ্যোদ্ধারের এই ভিড়ে আমার বয়স্ক মন কি ভাবতে পারে তাই একবার ভেবে নিচ্ছিল। মনস্থির করে আবার বলতে শুরু করল, সব নেশাই প্রথমে আরামদায়ক বলে শুনেছি, এমন কি সর্বাধুনিক নেশাগুলোও। কোথায়ও না কোথায়ও কোনও না কোন আকর্ষণ আছেই অন্যথা লোকে নেশা করবে কেন? নরনারীর প্রকৃতির মধ্যেই একটা নেশার বীজ, জৈব অস্তিত্ব জনোই, মূলীভূত অবস্থানে অপেক্ষমান থাকে। সময়ে সেই নেশার টানে, ছলনায়, মোহে প্রত্যেকেই সমাজের শক্তিকেন্দ্রদ্বারা প্রসারিত প্রস্তাবিত বিবাহ-জালে ঢুকে পড়ে জড়িয়ে যায় আর মুক্তি অসম্ভব জেনে কপালে করাঘাত করতে থাকে। আপন চিন্তার গভীরে মুক্তির উপায় না খুঁজে আপন অন্তরের অনুভবে চেতনার সত্যকে অন্বেষণ না করে, আমরা প্রত্যেকেই সহজ পথে প্রবৃত্তির হাতছানিতে আর সমাজের বড়শিতে নিজ নিজ স্বাধীনতাকে গিঁথে ফেলি। আর তারপরে বাকি জীবন নারীরা ছটফট করে নান্যপন্থা অনুশোচনায় আয়ু কমাতে থাকি; অন্যদিকে পুরুষেরা নিশ্চিত বড়শি-বিদ্ধ-মীন-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আয়েশ করে হুঁকোয় বা গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিতে থাকেন; গুড়ুক-গুড়ুক!

তনিমা থেমে গেল। ভাবলাম ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। তনিমা ভাঙতে চায়, গড়তেও চায়। ও যখন গড্ডালিকাপ্রবাহী নয়, তখন ওর নিজের পথ ওর জীবন 'রাডারে'ই চলতে দেওয়া সমীচীন। তাই বললাম, "এবারে যদি একটু কফি কর তাহলে আমরা দুজনেই ভাগ নিতে পারি।" তনিমা চা পান করে না তবে কখনো সখনো কফি পান করে থাকে। "তথাস্তু" বলে উঠে গেল এবং অচিরেই হাসি মুখে উষ্ণ ট্রে-সহ ফিরে এলো। আমরা আপন মনে আপন আপন তৃষ্ণার পাত্রে মন দিলাম।

অনিমা বিয়ে করবে

অনিমা বিজ্ঞানের ছাত্রী। ওর দিদি, তনিমার সঙ্গে ওর অনেক বিষয়েই দ্বিমত। স্কুলজীবনে বড়জন, তনিমা, কাব্য-সাহিত্য আর মননশীল বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ যতটা করেছে পাঠ্যপুস্তকের প্রতি ততটা কখনই করে নি ; আর অনিমা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সিলেবাস আর কারিকুলার কাজকর্মে মনোযোগ দিয়েছে। বড়টি বাইরের টানে পিতৃ-মুখী। ছোটটি বাস্তবের হাতছানিতে মাতৃমুখী। তনিমা রবীন্দ্রসংগীতে অত্যন্ত মনোযোগী আর ছোট বিবিধ ভারতীতে। স্বভাবে, প্রকৃতিতে দেহেব গঠনে আর মানসিক ঝোঁকে তাই দু'জন একেবারে বিপরীত মেরুর অধিবাসী। তাই দেখতে পাই বড় দর্শনশাস্ত্র নিয়ে সাম্মানিক অধ্যয়নে ব্রতী হলে, ছোট বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে। বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছোটজনকে যতটা প্রীতির চোখে দেখল, বড় জনকে ততটা নয়! এখন বিজ্ঞানের যুগ বলেই কি এই প্রভেদ? বড় রবীন্দ্র-নজরুলের ছবি সংগ্রহ করে বাঁধিয়ে ঘরেব দেওয়ালে টাঙায়, কবিতা উপন্যাস আর দর্শনের বই কেনে। ছোট তাব প্রাকটিক্যাল খাতাখানাকেই ছবির মতো সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে, গাছ-পাতা জীবজন্তুকে নিয়ে কাটা ছেঁড়া কবে আর পরিসংখ্যানের চাক্ষুস বিবরণ নানান ঢঙের ও বর্ণের 'গ্রাফের' সাহায্যে বাঙময় করে রাখে।

অর্নাস পরীক্ষা শেষ করে বড় ঘোষণা কবে যে সে প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার শেষ না দেখে জীবনের শুরুর বিষয়ে কিছুই ভাববে না ; সেই একই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে ছোট বিপরীত ঘোষণা করে ; সংসার জীবনের প্রাথমিক প্রবেশের বয়স এবং যোগ্যতা বাইশ-চব্বিশেই শ্রেষ্ঠ অবস্থানে থাকে। বিয়ে দিলে তার ব্যবস্থা তখুনি করা উচিত, এম এস সি তে ভরতির পরে নয়।

এই বিরুদ্ধ প্রত্যয় এবং সিদ্ধান্ত বিষয়ে ওদের মা-বাবা বেশ বড় রকমের সমস্যায় পড়ে যান। ওদের পিতা আমার সহকর্মী। তাঁর যন্ত্রণা আর সমস্যার কিছু অংশ আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে তিনি অভ্যস্ত ; বন্ধুত্বের নৈকট্য—জন্যেই এটা ঘটেছে। বড় মেয়ে তনিমার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। একদিন ছোটকে একা নিষ্কর্মা পেয়ে বিবাহ-বিষয়ে ওর মতামতের রূপরেখাটি জানার আগ্রহ প্রকাশ করলাম ঃ "তুমি এখুনি বিয়ে করতে চাও কেন?" বিস্ময়ে চোখ গোল গোল করে বলে উঠলো, "তাহলে কখন করব?" একটু যেন কিন্তু কিন্তু ভাবে বলব-কি-বলব-না ভাব করে যোগ করল, "ঠাকুমার বয়সে বিয়ে করা আমার পোষাবে না!" বলেই চোখ নিচু করে মেঝের মধ্যে কি যেন অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে গেল।" "আপনি কিছু মনে করলেন না তো? আলোচনাকে বাস্তব সম্মত আর বৈজ্ঞানিক রাখতে গেলে কিন্তু আমাকে একটু বেশি সামাজিক স্বাধীনতা দিতেই হবে!"

"একটু কেন? তোমার মত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাকে দিতেই হবে। অন্যথা আলোচনা তো গতি ও শক্তি পাবে না। স্বাভাবিক হবে না।" বলেই মনে হল অমার প্রশ্নটাকে একটু খোলামেলা করে পর্বে ভাগ করে দিলেই বোধহয় ওর সুবিধা হবে। তাই বিশ্লেষণ করে জানালাম যে আমার প্রশ্নের মধ্যে তিনটি পর্ব আছে। এক 'তুমি-র' অংশ। জোরটা তোমার ব্যক্তিগত বিষয়ে। তোমার দিদির সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। বেশ দীর্ঘ আলোচনা। তার মত বিবাহের বিরুদ্ধে। তা তুমি জান। তাহলে তুমি কেন এবং কি কারণে একই পরিবেশ পরিস্থিতিতে, বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করলে। দুই, জোর 'এখুনি'-র উপর। অর্থাৎ সময় নির্বাচন বিষয়ে। এ বিষয়ে তোমার বিচার-বিশ্লেষণে আমার জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছি। আর তিন, বিবাহ করতে চাও কেন? কেন এই সামাজিক এবং সংস্কারসিদ্ধ অনুষ্ঠানটি তুমি মেনে নিতে চাও। আমার প্রশ্নের এই ত্রিবিধ এলাকায় তোমার মতামত অপেক্ষিত।"

"দেখুন ছোট্টবেলায় আমাকে সকলেই নাকি আমার 'ঠাকুমার' বাহন বলে মজা করতো শুনেছি। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি 'বুড়ি ঠাকুমা' বলে আদর পেয়েছি। যখন খেলাঘরের কোণটাকে অত্যন্ত আপন করে নিয়েছি তখনও সেই সনাতন গৃহিনীটিই হয়ে উঠেছিলাম। আমার নিজস্ব সংসার বেশ বাড়বাড়ন্ত ছিল; অনেকেরই ঈর্ষার কারণ ছিল আমার সন্তানসন্ততিরা, তাদের সুখের জীবন, উপযুক্ত ঘর-বর দেখে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি, ছেলেদের জন্যে বৌ এনেছি। সারা বছরই সেই আমার সংসারে কোনও না কোনও অনুষ্ঠান লেগেই থাকত। একেবারে ছোট্ট বেলায় মিছি-মিছি লুচিতরকারি, রসগোল্লা সন্দেশ দিয়ে সকলেরই ভরপেট খাবার ব্যবস্থা করতাম। একটু বড় হয়ে ঠাকুমার আর মায়ের কাছে পীড়াপীড়ি করে, মিষ্টি-বাতাসা-নকুলদানার ব্যবস্থা করতে পারতাম। তাহলেই বুঝুন আমার মধ্যে একটা মা প্রথম থেকেই কেমন কবিতার পিতার মতো লুকিয়ে ছিল। প্রকাশের জন্যে ওত পেতেই ছিল।"

অনিমা যখন কথা বলছিল তখন যেন ও নিজের অতীতের দিনগুলোকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। একটা বর্ণনাত্মক বিস্তার ওর কণ্ঠের উপস্থাপনাতেও সদাই যেন ওর কথাকে একটা স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেই চলেছিল। "কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলোতে আমার স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলো যেন অনেক নোতুন সত্য, তথ্য আর তাৎপর্য বয়ে আনত। সাহিত্যের অনেক বিষয় যেসব আমি জীবনের তাৎপর্যে অর্থবহ দেখতাম, বিজ্ঞানের অনেক তথ্যও তেমনি আমার জাগ্রত চেতনার কাছে অনেক বাস্তব প্রশ্নের সমাধান বয়ে আনত। এই সময়ে আমি ঠাকুমার নৈকট্য তো পেতামই, অনেক আপন করে মাকেও কাছে পেতাম। আমার মধ্যের সেই সনাতন নারী প্রকৃতিকেই আমি বহমান দেখতে পেতাম যা আমার ঠাকুমা-দিদিমা-মা-মাসি হয়ে সভ্যতার অগ্রসম্পন্নতাকে স্নেহ বারিসেচনে সমৃদ্ধ করে চলেছে। লেখাপড়া শেখাটাকে আমি মস্তিষ্ক-বুদ্ধির পরিশীলনের মাধ্যম বলে মেনে নিয়েছিলাম; মেনে নিয়েছিলাম যে চেতনাকে কর্ষণ না করলে, চিন্তাশক্তিকে 'প্রোসেসিং' না করলে তার উন্নতি ঘটে না বলে। বাবা বলতেন শিক্ষিত হওয়াটা কোনও তোতার পেটের মধ্যে বই-পত্রের ঠেসে দেওয়া নয়, যুক্তি বুদ্ধি আর প্রত্যক্ষকে শানিত করার একটা প্রক্রিয়া মাত্র। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই যে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে প্রতিনিয়তর সমস্যা সমাধানে, শিক্ষা সেই অস্ত্র তৈরি করে, শানিত করে, উজ্জ্বল করে।" এইসব আমাকে আমার আমি-টি উপহার দিয়েছে। আকাশের দিকে তাকালে আমার ভাবালুতা আসে না, নীল-কে দেখতে পাই, মেঘের আনাগোনা বাস্তব ঠেকে। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আমার মনে ভূমার আকর্ষণের চাইতে ছোটবেলায় পড়া পৃথিবী গোলাকার তত্ত্বের প্রমাণ অন্বেষণ দানা বেঁধে ওঠে। জীবন আর প্রাণের স্বরূপে আমি অনাগত প্রজন্মের পদধ্বনি শুনতে পাই। বাস্তবই আমার চোখে আমার প্রত্যক্ষে স্বাভাবিক ঠেকে। সামাজিক অবস্থানকে আমি সর্বজনের স্বীকার অস্বীকারের তৌলে মেপে দেখি। আমার মধ্যেকার আমিটা তাই মা-ঠাকুমার পথটাকেই সনাতন বলে মনে করে।"

একটু থেমে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নপর্বটিকে বোধহয় মনে মনে স্মরণ করে.নিল : 'এক্ষুণি কেন' — বিষয়ে আমার বক্তব্য বিজ্ঞানভিত্তিক হবে। শরীর বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান উভয়েই মানুষের জীবনকে পর্বে-পর্যায়ে ভাগ করেছে। প্রথমটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উন্নতির এবং 'কোষে'র বিভক্তিকরণের চরিত্রে ভিত্তি করে আর দ্বিতীয় বিজ্ঞানটি করেছে মানসিক চেতনার আর প্রবৃত্তির প্রকাশের ভিত্তিতে। এমনকি আমাদের সনাতন সমাজ-চেতনাও মানবজীবনের সমগ্র গতিপথটিকে চারটি পর্বে বা আশ্রমে ভাগ করেছে যথাযোগ্য যাপন করার নির্দেশ দিয়ে। সবক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান কাজের জন্যে সময় বা বয়স নির্দেশ আছে। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের সময় পর্যন্ত গৌরীদান প্রথা চলে এসেছে। তখন অরক্ষণীয়ায় যন্ত্রণা ছিল। সেটা ছিল সামাজিক

রীতি। কেন ছিল সে সমস্যায় যাচ্ছি না; তবে গৌরী দান হলেও 'সংসারে প্রবেশ' ছিল অনেক বিলম্বিত। এখন টেলিভিশনেও যে 'কাঁচা-হাড়ি ভেঙ্গে' যাওয়ার বাঞ্জনায় আঠারো বছরের কথা জনগণের অবগতির জন্যে প্রতিনিয়ত ঘোষণা করা হচ্ছে, অথবা সংসদে আইন করে একটা সময় নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে তার বহু কারণের মধ্যে শরীরবিজ্ঞানের নিয়মটাও কম গ্রাহ্য নয়। মানসিক চেতনার অভিব্যক্তিতে যখন একটি নারী সংসার-আশ্রমের যোগ্য হয়ে ওঠে তখন তার সেই যোগ্যতার মধ্যেও একটা যোগ্যতম সময় থাকে, 'পিরীয়ড থাকে'। সময়কে অবহেলা করলে সময়ই সব থেকে বড় আঘাতটি দেবে, দিতে বাধ্য। আজকাল যারা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার যুক্তিতে বিলম্বে বিবাহ এবং সন্তান-স্বাগত করে তারা অনেক মূল্যেই অবসরজীবনে শিশুসন্তানের ঠাকুর্দা-স্বরূপ-পিতৃত্বের যন্ত্রণায় সময়ের হাতের মার নিজেরাও খান শিশুসন্তানদের জন্যেও যথেষ্ঠ পরিমাণে সেই মারের ব্যবস্থা করে রেখে যান। তাই আমার দৃঢ় মত আমি ব্যক্ত করেছি; শ্রেষ্ঠ সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ 'এক্ষুণি'। অবশ্য এই এখুনি'টাকে যদি আরও ক'এক বছরের মতো পেছিয়ে নেওয়া যেত তাহলে তিন বিজ্ঞানের নির্দেশেই যথাযথ হত; কিন্তু শিক্ষার পর্বটি শেষ করে না নিলে — পিতৃগৃহে থেকেই — সে আর বাস্তবায়িত হবার সুযোগ পায় না — পতিগৃহে। তাই এই প্রতিযোজনা, এই মানিয়ে নেওয়া। শরীর-মন-সমাজ তিনজনেই তো ডাক দিয়ে যায় সেই ষোড়শী অবস্থানেই!"

প্রশ্ন করেই যেন আমি ছাত্র হয়ে গেছি। আমার ভাগে শোনার অংশ আর অনিমার ভাগে বলার। ত্রি-পর্ব প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত না হলে তো আমি আর কোনও প্রশ্ন করতে পারছি না। অপেক্ষাই করতে হল বাকি উত্তরের জন্যে।

"বিবাহ বিষয়ে আমাদের বর্তমান সময়ে বেশ বিতর্কের সূচনা হয়েছে। বিতর্কের বিষয়ও এটা। কিন্তু আমি গরিষ্ঠ দলের পক্ষে। বেশির ভাগ লোক যা করে তাই স্বাভাবিক, ন্যাচরাল বলে আমি মনে করি। তাই সামাজিক অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ আমার কাছে বেশ গ্রাহ্য। তাছাড়া ভাব-ভালবাসা করেই হোক আর অভিভাবকদ্বারা নির্দ্ধারিত পাত্রই হোক, বিবাহের অনুষ্ঠানে বেশ একটা আনন্দ আছে, একটা যেন ভি. আই. পি বোধ আছে আর জীবনের পর্ব পরিবর্তনের সময়ে সকলের দেওয়া উপহার আশীর্বাদ যেন অনেকটা পাথেয় সংগ্রহ করে দ্বৈত জীবনকে সহজ করে দেবার ব্যাপারও আছে। আমার খুবই ভাল লাগে ব্যাপারটা।" হঠাৎই থেমে গেল। যেন দিকপরিবর্তন করার পূর্বাভাস দিয়ে বলল, "আমার কথাগুলো বেশ হালকা মতো হয়ে যাচ্ছে। একটু গুরুগম্ভীর করে বলা উচিত ছিল। প্রত্যেক বিবাহে থাকে দুটি জীবন — বর ও কনে। তারা নর এবং নারী। প্রত্যেকটি ব্যক্তির চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, ভাললাগা মন্দ লাগা সুন্দর অসুন্দর বিষয়ে ধ্যানধারণা স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। সেই বিচিত্র পরিসর জীবন অপরের পক্ষে যথাযথ জানা প্রায় অসম্ভব। তার মধ্যে আবার আছে পরিবর্তনশীলতা। পরিবেশ, পরিস্থিতি, বয়স, প্রত্যক্ষ এবং আরো কতো শতো কারণ। অপরের কথায় কি প্রয়োজন? কজন মানুষ নিজেকেই যথাযথ জানতে পারেন? ভাব ভালাবাসার পরিচয়েও তো ব্যক্তি স্বরূপ অচেনা অজানা থেকে যায়। সব মানুষই সমান আবার সবাই আলাদা। যাপন করতে করতেই আমরা প্রত্যেক জীবনের গতিপ্রকৃতি এবং নিজের নিজের বিশিষ্টতাকে জানি বা আবিষ্কার করি মাত্র।

অজানা-অচেনা স্বামীর ঘর করতে অভ্যস্ত নারীরা যে সকল সমস্যার মুখোমুখী হয়েছেন অতীতে আমরা হয়তো ঠিক ঠিক সেই সব সমস্যার সামনাসামনি হব না; কিন্তু তাতে অবস্থার কোনও গুণগত তফাত হয়েছে বলে মনে হয় না, পরিমাণগতও নয়। একদিক থেকে একথা অনস্বীকার্য। অতীতেও পুরুষের প্রাধান্যকে মেনে এবং মানিয়ে চলতে হয়েছে নারীকে; এখনও

তাই করতে হয়। অতীতেও ঘর সংসারের যাবতীয় দায় দায়িত্ব নারীকে বহন করতে হয়েছে, এখনও হয়। মাছের মুড়োটা দইয়ের সরটা তখনও পুরুষের জন্যে ধার্য ছিল এখনও তাইই আছে। কিন্তু তখনও নারী এবং পুরুষ মিলে সংসার করেছে এখনও তাই করছে। আবার তফাত হয়েছেও অনেক ক্ষেত্রে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গেছে, যাচ্ছে। তাতে গুণগত অর্থাৎ সমস্যার প্রকৃতিগত প্রভেদ দেখা দিয়েছে এবং সুতরাং পরিমাণগত তফাতও হাজির হয়ে গেছে। তখন বহুজনের মধ্যে অনেকেই সমস্যার তাপ সহ্য করতেন এবং আনন্দের অংশ ভোগ করতেন। এখন দু'তিনজনে সেই সমস্যাই সহ্য করেন, সেই আনন্দই উপভোগ করেন। বিবাদ-বিসম্বাদে তখন মধ্যস্থের সহায়তা পাওয়া যেতো এখন তা প্রায় অবসিত। সন্তানরা স্বল্প পরিবেশে স্বল্পতর সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে, অনেক বেশি মা-বাবার আদর পায়। ফল শুভ এবং অশুভ দুই-ই হয়ে থাকে। বিস্তারিত না গিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা সেই মানিয়ে নেওয়ার। এটা প্রাণিজগতেও যেমন সত্য মানুষের জগতেও তেমনি সত্য। বিবাহ তো একটা বন্ধন। সেই বন্ধনকে মেনে না নেবার কোনও জৈবিক, মানসিক বা সামাজিক কারণ তো দেখি না। এরকম বন্ধন বা সম্পর্ক তো আমাদের আরও কতো শতই রয়েছে। সে সবই মেনে নিতে পারছি, সকলেই পারছি ; যারা বিবাহকে স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করেন তারাও তো পারিবারিক বন্ধন, নিয়ম কানুন, রীতিনীতি করণীয় অকরণীয় নির্দেশ মেনে নিতে কষ্ট বোধ করে না। তাহলে পিতা-পুরুষ কাকা-জেঠামশাই পুরুষদের এবং আরো আরো পুরুষ প্রাধান্য যদি মেনে নিতে পারি তাহলে স্বামী বেচারি কি দোষ করল ? বিশেষ করে শরীরের এবং মনের একটা বিশেষ পর্যায়ে যখন প্রিয়জন-বন্ধুজন-সখাজনের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্রভাবেই অনুভূত সত্য তখন এই আংশিক বিদ্রোহ কি যুক্তি সিদ্ধ ?

অনিমা অত্যন্ত বাস্তব একটা সাধারণ-বোধের দ্বারা তার মনোভাবকে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে চলেছে। কিন্তু আমার প্রশ্নের ত্রিপর্ব উপস্থাপনায় ওর প্রতিক্রিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গেই অনুধাবন করছিলাম। প্রথম পর্বে ও অত্যন্ত বিষয়ীগত — 'সবজেক্টিভ' অংশের উত্তর দিয়েছে : 'তুমি' অংশের। তাই জানতে চাইলাম, "তুমি তো শুধু তোমার নিজের ব্যক্তিগত বিষয়েই বলেছো। সেই একই কথা কি সকলের, বেশির ভাগ মেয়েদের বিষয়ে সত্য হবার কারণ আছে ?" সঙ্গে সঙ্গে অনিমার উত্তর যেন তৈরিই ছিল, "না, কেবলমাত্র আমার একার কেন হবে, সকলেরই ঐ এক কথা, অন্তত প্রায় সকলেরই। " 'এ্যাবসল্যুট অল' বলে বিজ্ঞানে কথা বলা হয় না, সেখানে সম্ভাব্যতার, প্রোবাবিলিটির, শতকরা হিসাব ধরা হয়। কার্যকারণ অনুসন্ধানে এখন তো পরিসংখ্যানের ভাষাই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। বলতে পারি প্রায় নিরানব্বই শতাংশ ভারতীয় নারীই সনাতন গৃহ-পরিবেশে বেড়ে ওঠে, ব্যক্তিত্ব গঠনে 'সকলেরই' তাই সেই পুতল-ঘরের প্রভাব পড়ে, মা-ঠাকুমার ভবিষ্যৎ কল্পনায় 'বরের' গুণাগুনের বর্ণনা তাদের মনকে, অবচেতনে এবং একটু বড় হলে সচেতন পর্যায়ে রাঙিয়ে তোলে। প্রায় সকলেই একটা বিশেষ বয়স পেলেই সলজ্জ-সচেতনতা দ্বারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আর মনে মনে পাল্কিতে চড়া, ঘোড়ায় সওয়ার অথবা মোটরে বাহিত অনাগত বরের আগমন বার্তাটির ছন্দময় পদধ্বনি শুনতে পায়। পরিবার-পরিবেশ, আত্মীয়-সম্পর্কিত জনেদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যেমন এরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবই দেখে, বোঝার চেষ্টা করে, তেমনি উত্তর বিবাহ জীবনের আনন্দঘন নৈকট্যের হাতছানিতে এদের মনের গভীরে প্রতিনিয়তই সমুদ্রের গুরু গুরু দূরাগত গর্জনের মতো বেজে ওঠে। সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে এদের স্বাভাবিক পরিমার্জন যেমন হতে থাকে হতে থাকে, যাকে আপনারা বলেন 'সাবলিমেশন', ঠিক তেমনি ভিতরে ভিতরে নারী হৃদয়ের যৌবনপদ্মটি কুঁড়ি থেকে পদ্মে রূপান্তরিত হয়ে পুরুষ ভ্রমরের অপেক্ষায় নিরন্তর উন্মুখ হয়ে ওঠে। কারো আগে কারো কিঞ্চিৎ বিলম্বে এই উন্মীলন ঘটে, কেউ বিচিত্র-বিভিন্ন সাবলিমেশনের প্রয়োজনে

এই উন্মেষকে সাময়িক নিরুদ্ধ রাখে, কেউ বা তাকে প্রকৃতির এবং যোগাযোগের উপরই ছেড়ে দেয়। জীবনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ প্রভৃতি 'সাবলাইম'-বিষয় বা এদের বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিতি অনুপস্থিতি, নারী হৃদয়ের এই ভ্রমর অপেক্ষাকে পরিচালিত করে থাকে। কাজেই এটা একমাত্র আমার বা তার কথা নয়; এটাই সার্বিক নিয়ম; বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত এতই কম যে তা নিয়মকেই প্রমাণ করে মাত্র।

একটু পরিষ্কার করে নেবার জন্যে জানতে চাইলাম, "তাহলে যাকে এই 'ভ্রমর-আকাঙ্ক্ষা বলেছো, মনের মানুষের জন্যে প্রতীক্ষা বলে ব্যাখ্যা করতে চাইছো তা একেবারেই প্রকৃতিজ, প্রবৃত্তিজ এবং সুতরাং জান্তব বলে মনে হচ্ছে না? প্রত্যেক প্রাণীর জীবনেই তো এই 'সময়টাই' প্রধান হয়ে স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে একটা নৈকট্য, একটা ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়ে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে কি ব্যাপারটা ঠিক তেমনিই অনিবার্য?"

অনিমাকে যেন একটু উত্তেজিত মনে হল, "আমার কথা যে আপনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন নি তা বোঝা গেল। অথবা এমন হতে পারে যে 'ভেতরের আকাঙ্ক্ষা আর বাইরের সিদ্ধান্তকে, প্রাপ্তির অপেক্ষাকে' আপনি গুলিয়ে ফেলেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে প্রকৃতি আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই একই নিয়ম সৃষ্টি করেছে, প্রাণীর জন্যেও, মানুষের জন্যেও; মানুষও তো এক শ্রেণীর প্রাণী, যেমন প্রাণীদের মধ্যে বহু বিভিন্ন শ্রেণী আছে। সুতরাং প্রাণী সম্বন্ধিত সকল প্রাকৃতিক নিয়মই মানুষ সম্পর্কেও সমান সত্য। এতে লজ্জিত হবার কোন কারণই নেই। মানুষের স্বাতন্ত্র্য সেই সব প্রবৃত্তির সাবলিমেশনে, 'রিডাইরেকশনে'। মানুষ তাই অনেক বেশি অর্জনে সক্ষম; আর এই অর্জনের সামাজিক নাম 'সভ্যতা'। এর ব্যক্তিগত সংস্করণকে আমরা বলি ব্যক্তি-চরিত্র, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিসত্ত্বা। বিজ্ঞানী ফ্রয়েড যে 'প্রবৃত্তির অস্বীকারের মূল্যে সভ্যতার জন্ম' বলেছেন তাকে আপনারা শব্দার্থে নিতে পারেন না, গূঢ়ার্থে তাৎপর্যময় তাঁর বক্তব্যের বাইরে আমি যাচ্ছি না। শব্দার্থে নিলে আমাদের সমাজের অগ্রগতি এতোদিনে রুদ্ধ হয়ে যেতো কারণ সকলেই, প্রবৃত্তি অস্বীকারের কারণেই, স্ব স্ব বংশের শেষ বাতিটি হাতে করে, সন্ন্যাসী হয়ে পাহাড়ে-পর্বতে বনে জঙ্গলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন। পুন্নাম নরক থেকে বাঁচানোর জন্যে সেক্ষেত্রে তাদের কেউ থাকত না এবং সুতরাং নরকেই সমাজের গন্তব্য শেষ হত। তাই অত্যন্ত পরিষ্কার করেই বলেছি যে আমাদের ভিতরে ভিতরে সময়ের অঙ্কুর উদ্গমের জন্যে সদা-গতিশীল থাকলেও আমাদের মানুষী সামাজিকীকরণ এবং বিচিত্র বিভিন্ন সাবলিমেশন-রিডাইরেকশন প্রক্রিয়ার চাপে এবং প্রয়োজনে সেই উদ্ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা 'অপেক্ষার' বেড়াজালে বিলম্বিত হয়। অগ্র-বা-পশ্চাৎ অঙ্কুরোদ্গম ঘটনাটি নানান মাত্রার প্রভেদে গ্রামে অগ্রে শহরে পশ্চাতে ঘটে থাকে, বস্তিতে আগে সংস্কারের ঔজ্জ্বল্যে পরে আসে বা ঘটে। অনেকগুলো 'লজি' এখানে একই সঙ্গে কাজ করে — 'বায়ো' 'ফিজিও' 'সাইকো' এবং 'সোসিওলজি'। এতো জটিলের একত্রাবস্থানকে আপনি নিজগুণে সহজ করে নিন; আমার ক্ষমতার বাইরে জানবেন।"

অনিমাকে আশ্বস্ত করে বললাম, "তোমার বক্তব্যকে তুমি অবশ্যই আশার অতীত সহজ করেই বলেছো। যা কিছু খট্‌কা তা ওই 'সাবলিমেশন আর রিডাইরেকশন' শব্দ দুটোকে নিয়ে। তাই বোধহয় সহজকে সহজ বলে চিনতে পারি নি প্রথমে।"

"তা আগে বলেন নি কেন?" যেন একটি উৎসুক ছাত্র পেয়ে গেছে এমন একটি মুখ করে সাবলীল বলে উঠল, "বাল্যকালে আমাদের খেলাধূলা করারই তো কথা? সেট্যাই স্বাভাবিক, প্রকৃতিসিদ্ধ। কিন্তু দেখুন আপনারা আমরা সকলে মিলে সেই বাল্যকালের প্রবৃত্তিকে বাঁধ দিয়ে, ফ্রয়েডের ভাষায় অস্বীকার করে, বাচ্চাদের বর্ণপরিচয় করাতে এবং আঁকতে শেখাতে বসিয়ে দেই।

এটা 'সাবলিমেশন'। প্রকৃতির শক্তিকে সমাজকাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালনা করানো। আবার মারপিট করাটাও তো প্রকৃতিসিদ্ধ? লাফ-ঝাপ করা, প্রতিযোগিতায় তীব্র দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া যা ছেলেমেয়েরা হামেশা করে থাকে? সেই শক্তিকে বেড়ি পড়িয়ে — নিয়মের আর শৃঙ্খলার বেড়ি পরিয়ে — আমরা খেলাধূলায় নিয়োগ করে দেই। স্পোর্টস-এ্যান্ড-গেমস। এটা রিডাইরেকশন। বলুন এবারে সহজকে সহজ বলে বেশ চেনা যাচ্ছে কিনা?"

অনিমার বাচনভঙ্গি আর চোখের কারুকার্য দেখে বেশ মজা লাগল। বললাম, 'সে তো অবশ্যই চেনা যাচ্ছে, কিন্তু গোল বাধছে অন্য জায়গায়!'

"বলে ফেলুন দেখি আপনার গোলাকার সমস্যায় আমার উত্তর চতুষ্কোন হয়ে দাঁড়ায় কিনা? এ স্কোয়ার পেগ ইন এ রাউণ্ড হোল!" অনিমা একটু রসিকতার লোভ ছাড়তে পারল না! আমি বললাম, "ঐ রান্না ঘরের ব্যাপারটা? সেই বিনে মাইনের ঝি-রাঁধুনী-সেবাদাসী ব্যাপারটাতেই আমার গোল। সেখানে কি তোমার কোনও প্রতিবাদ নেই? পুরুষশাসিত সমাজ-ব্যবস্থা বিষয়ে?"

কথায় বলে বনের বাঘে নয়, মানুষকে খায় মনের বাঘে। কথাটা ঠিক। মনের মধ্যেই যত ভাল তত খারাপ। মনে করলে ঈশ্বর যে ঈশ্বর তাকেও তো নস্যাৎ করে দেওয়া যায়। মানুষের যুক্তি তো একটা হাতিয়ার অস্ত্র। মন তাকে ব্যবহার করে মাত্র। ইচ্ছানুসারে, উদ্দেশ্য-পূরণে, লক্ষ্যে পৌছনর জন্যে। আমাদের দৈনন্দিন মতপার্থক্যের এলাকার, ঝগড়া-তর্কের এবং সব থেকে প্রকৃষ্টভাবে যুক্তির এবং আইনের বা নিয়মের, আপেক্ষিকতা ধরা পড়ে উকিলদের পেশাদারী উতোর-জবাবে। তথ্যও তাই। তথ্যের বা ঘটনার তো সত্য মিথ্যা নেই; সে তো ঘটনা মাত্র। তাকেই বা তাদের যখন মানুষ সাজিয়ে-গুছিয়ে ব্যবহার করে তখন তা আপেক্ষিক হয়ে ওঠে। তথ্য বা ঘটনা তো একই সময়ে প্রবাহিত ঘটনাংশের প্রবাহ। তাকে কবি দেখেন কাব্যের চোখে, বিজ্ঞানী দেখেন বিজ্ঞানের চোখে, দার্শনিক দেখেন অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে। তাহলেই বুঝুন! মেঘ দেখে চাষীর মনে আশা জাগে আর কালিদাসের মনে বিরহ-পত্র-সংযোগের সাঁকো দোলা দেয়! রচনা হয় মেঘদূত! সংসারেও তেমনি। স্বামীর চরিত্রে তেজ ও দৃঢ়তা দেখে অনেক স্ত্রীর মনে গর্বের উদয় হয়, আবার সেই একই কারণে অনেকে 'মাইকে চলে যায়' স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে ক'রে। সেই মনে করাতেই ফিরে ফিরে আসতে হবে!

আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, 'ব্যাস, এইমাত্রই আর কিছু নয়? শুধু মনে করা দিয়েই এতো বিরহ, বিচ্ছেদ এতো যন্ত্রণা, নির্যাতন, এতো পীড়ন আর উৎপীড়ন সবই ব্যাখ্যা হয়ে যাবে? বিজ্ঞানে কি যেন একটা কনজার্ভেশন অব এনার্জীর কথা আছে না, একটা পরিমাণগত সমতা যা কার্য ও কারণের সম্পর্ক বিষয়ে অবশ্য মান্য? সংসার জীবন কি তার প্রয়োগক্ষেত্র নয়? সংসার ক্ষেত্র কি নিপাতনে সিদ্ধ?

"নিপাতনে কেন হবে, সংসার হৃদয়ের উষ্ণতায় সিদ্ধ হয়!" আমার কথাটা পড়তে না পড়তেই যেন লুফে নিল, "অনেকে অবশ্য বলবেন, 'নির্যাতনে অ-সিদ্ধ।' আমি তাদের দলে নই। যা দেখেছি, যা শুনেছি, তাকে মিথ্যে বা অসত্য বলে মনে করব কেন। যা পড়েছি তা না হয় ঔপন্যাসিকের স্বকপোলকল্পনা, কিন্তু আমার চারপাশের জীবনকে বাদ দিয়ে তো আর সমগ্র সামাজিক জীবন হতে পারে না। পুরুষদের দেখছি পরিবারের আর্থিক যোগানের জন্যে জীবন পণ করে দিনের অধিকাংশ সময়টুকুকে বিক্রি করে দিচ্ছে, যাতায়াতের যাবতীয় যন্ত্রণা আর যান-জটকে নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করছে, করেই চলেছে। দেখছি সামাজিক সমস্যায় বিরক্ত-বিভ্রান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে দেয়ালে পিঠ করে সংগ্রাম করে চলেছে। দেখছি পারিবারিক সমস্যাগুলো কেমন করে এদের আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে রেখে দৈনন্দিন শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে চলেছে। এইসব

পারিবারিক-জাগতিক-আর্থিক সমস্যা নিয়ে আমরা মেয়েরা কতটা সচেষ্ট? আর যখন সচেষ্ট হই, তখন সমস্যা কমানোর চাইতে ওদের ঘাড়ে সমস্যার পাহাড় তৈরি করে তুলি। আমাদের মধ্যে আমারা যারা অফিস কাছারি করি তারা স্বাধীনতার সূক্ষ্ম সূত্রটিকে এতই সূক্ষ্ম করে ফেলি যে সচরাচর সেই সীমাটুকু বা বন্ধনটুকু আছে কি নেই তাই বোঝা যায় না! প্রতিবাদের ঝড় উঠবে জেনেও বলছি, এই দলের 'আমরা' অনেক বেশি 'ঈগোকেন্দ্রিক অনেক বেশি ঝাঁঝালো। ব্যত্যয় যা আছে তা নিয়মকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এটা যেমন চিত্রের একদিক, তেমনি এর একটা অন্য দিকও আছে। একটু আত্মদৃষ্টি ফেললে, 'ইন্ট্রোস্পেকশন' করলেই দেখতে পাবো যে আমরা, যারা আর্থিক স্বাধীনতা রেভিনিউ স্ট্যাম্পে সই করে অর্জন করি নি, তারা অনেক স্বাধীনতা ভোগ করে থাকি। বেশিরভাগ গৃহকেন্দ্রিক গৃহিনীরাই কোনও ব্যাঙ্কে সেভিংস একাউন্ট খুলি না, স্বামীর মাস-মাহিনা-বোনাস-পার্কস একাউন্টে যথেচ্ছ 'চেক' কেটে থাকি! জমার ঘরে আগ্রহ নেই, খরচের মাত্রা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিশ্চয় করে দিই। এই 'ডেরিভেটিভ' আর্থিক স্বাধীনতাও মাপজোখের বাইরে। বান্ধবীর জন্মদিনের উপহার থেকে শুরু করে পুজোর সওদা পর্যন্ত আমরাই প্রধান; অর্থের জোগান কোথায়, কতটা এবং সেই সংগ্রামের জন্যে স্বামীকে কতটা ঘর্মক্ষরণ করতে হয়, কতটা মূল্য দিতে হয় সেই আত্মযন্ত্রণার ইতিহাসটুকুতে আমাদের আগ্রহ ততটাই কম যতটা বেশি কি মূল্যের আর মানের উপহার সওদা না করলে আমাদের পারিবারিক সামাজিক সম্মান — প্রেস্টিজ রক্ষা হবার নয়। কাপড়ের মাপে কোট কাটার নীতি কজন গৃহিনীর কাছে গ্রাহ্য? কোটের গুণমান নির্দেশ করা আমাদের অধিকার, কাপড়ের সংগ্রহের দায় পুরুষের স্কন্ধে। অন্যথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চোখের বন্যায় সবই 'টপসি-টার্ভি'!"

পুরুষদের পক্ষ নিয়ে অনিমার এই ওকালতি আমার বেশ ভালই লাগছিল। আত্মতৃপ্তির সুড়সুড়ি লাগছিল গভীর চেতনায়। সারাজীবনই তো আমি 'পেইস্টেড্ ব্ল্যাক', কাল মানিক হয়ে কাটিয়েছি। যোগ্যতা নেই অথচ বিয়ে করেছি, সন্তানদের সাধ-আহ্লাদ পূরণের ব্যবস্থা নেই অথচ ..... শুনে শুনে বারে বারেই পশ্চিমভারতীয় মধ্য-স্ফীত প্রজাতির সদস্য কেন হতে পারি নি, সেই খেদ্ করে এসেছি। এখন তাই এই পড়ন্ত বেলায় কোট কাপড়ের সামঞ্জস্যের কথা শুনে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছিলাম! কিন্তু যুক্তি তো মনের ইশারায় চলার কথা নয়। তাই বললাম, "পুরুষরা তো তোমার তুলিতে এতক্ষণে 'পেইস্টেড্ ব্রাইট'। কিন্তু অফিস-কাছারির বাইরে ওঁরা যখন গৃহে ফেরেন তখন প্রত্যেকে এক একজন 'হিটলার' না হলেও সিংহাসন আরূঢ় মহারাজার মতো যে ব্যবহার করে তা কি তুমি মানতে চাও না? গৃহের কোনও কাজই কি পুরুষের কাজ নয়? সবই নারীর এলাকায়? আমি তো দেখেছি জেনেছি, ভারতীয় পুরুষ স্বামী, গৃহে মাত্র দুটি কাজই সাড়ম্বরে করে থাকেন। এক, চা-পান, এবং সম্ভব হলে বারে বারে। এবং দুই, খবরের কাগজের গভীরে জীবনের পরমব্রহ্মকে অন্বেষণ! এ বিষয়েই বা তোমার মতামত কি? তাছাড়াও পুরুষেরা যাবতীয় সমস্যাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দায়িত্ব-বিন্যাস করে থাকেন বলেও শুনেছি: এক গার্হস্থ্য এবং সামাজিক, দুই ইন্টারন্যাশনাল সমস্যা। প্রথমটির মধ্যে সন্তান লালন-পালন, তাদের দেখাশুনো স্কুল-কলেজ, পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ দেনাপাওনা, দুধওয়ালা জলের ভারী ধোপা ঝি ইত্যাদি ইত্যাদি পড়ে। এবং এই এলাকা স্ত্রীদের ভাগে। অন্যভাগে, নিজের ভাগে বহির্বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা যেমন রাশিয়ার এথনিক প্রব্লেম, গাল্ফ ক্রাইসিস, কোল্ড ওয়ার, নর্থ নর্থ এবং সাউথ সাউথ বিষয়, 'সার্ক' ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা। দুরুহ এবং সাধারণ সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়গুলো স্ত্রীর জন্যে সরিয়ে রাখে। এ বিষয়েই বা তোমার মূল্যায়ন কি?"

অনিমা এতক্ষণে একটা মুক্ত হাসির ঝরনা হয়ে প্রকাশ পেল। হাসলে ওকে যেন প্রকৃতির

সবুজে মাখামাখি বলে মনে হয়। "ব্যাঙ্গ করতে চান করুন। পুরুষ হয়ে পুরুষের ব্যাঙ্গ করারয় আপনার অধিকার অবশ্যই আছে। কিন্তু তির্যক বক্তব্য 'ডিবেটে' কার্যকর হলেও আলোচনায় পরিহার করা হয়। নারীরা যে চা-এ কম আসক্ত তার কিন্তু কোথাও কোন তথ্যগত — পরিসংখ্যান ভিত্তিক সমর্থন নেই। আর খবরের কাগজ? মহিলারা যে যেখানে চোখ খোলেন না সেটা তাদের পক্ষে না গৌরবের না ঔচিত্যের। পরমব্রহ্মকে পাবার বাসনায় না হলেও আদ্যকর দিনের ক্রম-সংকীর্ণ পৃথিবীর প্রেক্ষিতে খবরাখবর অত্যন্ত জরুরী একটা মানসিক 'এলার্টনেস' তৈরি করে। এই পরিবেশ পরিস্থিতি বিষয়ক সচেতনতা না থাকাটা, এই সচেতনতাকে জাগ্রত না রাখাটা অবশ্যই ভাবনার এবং ব্যক্তিত্বের অপমৃত্যুর সমান। তবে জগৎ ও জীবন থেকে পালিয়ে লুকিয়ে থাকার জন্যে যদি খবরের কাগজের আড়ালটাকে ব্যবহার করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে যে না হয় তাও নয়, তাহলে বলব ঐটুকু একটা পাতলা কাগজে রুদ্র বাস্তব জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে আড়াল সত্যিই কিন্তু পাওয়া যায় না। নিজের ছেলেমেয়েরাই, যাদের দৌরাত্ম থেকে বাঁচার কথা আপনার মনে সম্ভবত ছিল, অথবা ঐসব কাগজ-আড়ালদের মনে থাকে, সেই ছেলেমেয়েরাই প্রথম বিধ্বস্ত করে দেয়।"

ক্ষণকাল নির্বাক থেকে মনে মনে স্মৃতিকে মন্থণ করে, আমার প্রশ্নের ঝাঁককে যেন সাজিয়ে নিতে চাইল, "আপনি আরও অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন, একসঙ্গে পুরুষদের আমি অকারণেই উজ্জ্বল রঙে রাঙিয়ে দেখাই নি। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। নারীদের মধ্যে নক্ষত্রের অভাব আছে সে কথা আমি বলি নি, বলতে চাইও নি। স্ত্রী হিসেবে নারীর মূল্যের তুলনায় মা হিসেবে তার মূল্য অনেক বেশি। পুত্র-কন্যাদের সাফল্যের পেছনে যে সর্বদাই একটি মা অবস্থান করেন এ কথা কিন্তু নারীদের পিঠ-চাপড়ানোর জন্যে পুরুষের 'সিকোফ্যান্সি' মাত্র নয়; বৈজ্ঞানিক সত্য। আত্মদম্ভ আর অহংকারের ঈগোচশমার আড়ালে ঐ সত্য ঢাকা পড়লেও মিথ্যা হয়ে যায় না। সংসার বাক্যে উদ্দেশ্য এবং কর্মের মাঝখানে যে ক্রিয়া পদটি আছে সে বাক্যের জীবন মরণের সূত্রধর; সে উহ্য থাকলেও তাই প্রকাশিত হলেও তাই। সংসার যে রমণীর গুণেই সুখের হয় তা দেওয়ালে টাঙানো সত্য নয়, বাস্তবেই বাঙ্ময়। পশ্চিম দেশে স্বামীরা এবং স্ত্রীরা 'শ্রমবিভাজনের' নীতিতে বিশ্বাসী এবং অভ্যস্ত। সংসারকে চালানোর জন্যে গাড়ির উপমায় দ্বৈত ড্রাইভারির পাকা বন্দোবস্ত সেখানে গড়ে উঠেছে। একজন রান্না করেন তো অন্যজন বাসন মাজার কাজটি সেরে ফেলেন। এইরকম। সংসার যে কোনও কারখানা নয়, জীবনের যাপনযোগ্য একটি শান্তির নীড় সে তত্ত্ব ওদের অন্তরে দানা বাঁধে নি। ওরা জীবনকে দেখে সম্পদ আহরণের শক্তি কেন্দ্র হিসেবে, উপভোগের প্রেক্ষিতরূপে। তাই উর্ধ্বশ্বাস দৌড় আর নিয়তর প্রতিযোগিতার মধ্যেই ওরা জীবনকে একদিন অতীত করে ফ্যাল ফ্যাল করে, বার্ধক্যাবাসে ব'সে, পশ্চাৎদৃষ্টিতে অবলোকন করে। আমাদের দেশে জীবনের রস তার গ্রহণের মধ্যেই বলে স্বীকৃত; জীবনকে আমরা ফুল বলে উপভোগ করতে চাই, খোঁপায় গুজে, বুকের কাছে তোড়া করে বেঁধে রেখে আর সুন্দরের অভিষেক করে। আমরা স্ত্রী হয়ে সমান অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে চাই না। রমণীয় হয়ে রমণী হতে চাই। আমরা 'মিসেস' স্বরূপের চাইতে পত্নী বা গৃহিনী — এবং একটু বেলা হলে — গিন্নি হয়ে আঁচলে চাবি বাঁধি। আমরা 'লান্স' নয় দ্বিপ্রহরে আহার গ্রহণ করি দিনান্তে, কারণ সব কাজ সেরে ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা সেরে সংসারের যাবতীয় খিদমদগারি করেই অবেলায় দুটি অন্নগ্রহণের মধ্যে আমার ব্রত-পার্বণ-মুখী মন যেন তৃপ্তির সান্ত্বনা পায়। চড়ুইভাতিতে যেমন অত্যন্ত অবেলায় সম্ভবত অ-সিদ্ধ অভব্য খাদ্য গ্রহণেই অপার আনন্দ উপজয় তেমনি সংসারকে আমরা মহিলারা একটি দিনান্ত চড়ুইভাতির মন নিয়েই অহরহ করে চলেছি। কে বেশি কাজ করল, কে কম, কে কাগজে মুখ ঢেকে ফাঁকি দিল কে দিল না এসকল

বিষয়-বিচার স্বার্থ-চেতনা আমাদের যাদের মন লাল পাড় শাড়ির বেষ্টনে স্পষ্ট-সাদা তাদের মনেই ওঠে না। ভেদ-বুদ্ধি আর অভেদ বুদ্ধির টানাপোড়েনে মানুষরে মন হাঁপিয়ে উঠতে বাধ্য; ভেদাভেদ বোধকে সংসারের অনির্বচনীয় আনন্দের চলমান গতির কাছে হারিয়ে দিতে পারলেই তো বিদুরের সংসার সম্ভব হয়। ক্ষুদ-কুড়োতেই তুষ্টি, স্বল্পেই আনন্দ। বুনো রামনাথের সংসারে সব কিছুরই তো অভাব ছিল, এক অভাব ছিল না জ্ঞানের আর ছিল না অভাব শান্তির, তৃপ্তির আনন্দের। তেঁতুল পাতার ঝোল অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলতেই হবে। তর্কে তর্ক বাড়ে, ঝগড়ায় বাড়ে বিতণ্ডা। ভাগ একবার শুরু করলে ভাগ্যে দুর্দশাই অবশিষ্ট থেকে যায়; কারণ ভাগ সংখ্যার হয়, সংখ্যা অসীম; সুতরাং ভাগেরও শেষ পাওয়া যাবে না। সংসারকে তাই ভাগের মা না বানানোই গঙ্গা পাবার, পবিত্র সুন্দরকে পাবার, পথ।"

"প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই যে কাব্য ওত পেতে থাকে, দার্শনিক চেতনা প্রকাশের পথ খোঁজে, তা সে ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক মনস্কই হোক আর বাস্তব-স্বভাবই হোক, তা আর একবার প্রমাণিত হল" আক্রমণ না করেই বললাম, "তুমি অনিমা যে ভাবে নিজেকে প্রকাশ করলে তা আমাকে বিস্মিত করেছে।"

"তা এর মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে? সকলেই বলেন, এমন কি, আপনাদের বার্ট্রাণ্ড রাসেল সাহেবও তো বলেছেন, ভারতীয়রা জন্ম দার্শনিক। আমরা জানি বাঙালিরা জন্ম কবি, আর মেয়েরা জন্ম গিন্নি। ঠিক কিনা বলুন? আমাদের মধ্যে সেই ছোটবেলা থেকেই তো মায়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে বড় হতে থাকেন! নিজেদের বিয়ে হবার আগেই তো আমরা আমাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে ফেলি। আমরা তো আজন্ম আ-মৃত্যু সংসারী। আপনাদের জন্যে বানপ্রস্থের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের জন্যে?"

বিশ্বাসে অটল এই মেয়েকে মোক্ষম আক্রমণটি করব বলে স্থির করলাম। "এই যে পণ-প্রথা, বধূহত্যা, বধূ-নির্যাতন এ সবও কি তোমার কাছে তৃণ সম সংসারের প্রবাহ বেগে ভেসে যাবে? এ-সবই তো পুরুষের জন্যে, স্বামীদের সমর্থনে এবং সংযোগে ঘটে চলেছে? তা হলে?"

"তাহলে আর কি মাথাটাই কেটে ফেলার ব্যবস্থা দিন!" বলেই ও চুপ করে গেল যেন একটা স্বচ্ছ সমাধান এই মাত্র ঘোষণা করা হয়ে গেল এবং সবই মিটে গেল। আমার চোখে বিস্ময়, বক্র-গ্রীবায় প্রশ্ন ভাসতে লাগল; কিন্তু তাকে কিভাবে প্রকাশ করব ভাবছি এখন সময়ে অনিমা চেয়ারের পেছনে হেলে গিয়ে বলল, "মাথাটা ধরেছে বলে কোনও ডাক্তারকে কখনও শিরশ্ছেদের নিদান হাঁকতে শুনেছেন? দেখেছেন কোথায়ও কোনও বিজ্ঞাপন যাতে এতদ প্রকারের মাথাধরার ব্যবস্থা ঘোষণা করা হচ্ছে? ওটা অবশ্যই অসুখ এবং অসুখকর। যেমন ঐ পণপ্রথা, বধূহত্যা এবং নির্যাতন সামাজিক অসুখ, ব্যক্তিগত 'পারভার্সন', সংস্কৃতিগত কু-লক্ষণ। তাই বলে শিরশ্ছেদ কেন হবে? তাছাড়া প্রকৃতিতে ভূমিকম্প, অগ্নুদ্গার, প্লাবন ঘটে, আছে মৃত্যু আছে মহামারি, দুর্ঘটনা সমানে ঘটে চলেছে, ট্রেনে কলিশন বাসে সংঘর্ষ আর গাড়ির খাদে পতন তো ঘটছেই। তাই বলে কি জনপদ গড়ে উঠবে না, সবুজ ঘিরে রাখবে না গ্রামকে, মানুষ নিশ্চেষ্ট বসে থাকবে ঘরে আর দূরদূরান্ত ভ্রমণকারীদের ঘটবে অভাব? মানুষের ইতিহাস তো প্রকৃতিকে জয়ের ইতিহাস, দুর্নিবার্যকে নিবারণ করার প্রচেষ্টা আর অন্যায়কে দমন করার নানাবিধ পথ অন্বেষণের মধ্যেই মানুষের জয়যাত্রা। প্রথা-হত্যা-নির্যাতন সমূলে উৎপাটন অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য; কিন্তু সেই লক্ষ্যরূপ মাটির কেল্লা রক্ষা করার পণ করে ঠায় বসে থাকলে তো পণপ্রথা ইত্যাদি লোপ পাবে না। সমস্যাকে উপলব্ধি করার মধ্যেই তো সমস্যা সমাধানের উত্তর লুকিয়ে থাকে; যখন ঐ প্রথাগুলো প্রথম প্রচলিত হয় তখন কিন্তু ঐগুলো 'সমস্যা' ছিল না। উদ্ভিন্ন উদ্ভিদের মতো ওরা সমাজ দেহে

গজিয়ে উঠেছিল, অথবা প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্ট হয়েছিল, কাম্য হিসেবেই প্রবর্তিত, পরিপোষিত পরিবর্দ্ধিত হয়ে এসেছে। বাধা পায় নি ; কারণ এগুলোকে সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়নি। সেই চিহ্ন যখন এদের গায়ে এখন সপাটে লেপ্টে গেছে তখন ওদের দিন গণনার মধ্যেই এসে গেছে। এবং তৃতীয় বক্তব্য পরিসংখ্যানভিত্তিক। কতোজন ? শতকরা কতোজন এই দুষ্ট-ক্ষতের শিকার ? নঞর্থক ঘটনাকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই প্রত্যেক্ষে রাখা প্রয়োজন। জীবনকে নির্দেশ দেয় সদর্থক চেতনা। শত সহস্র সার্থক স্বামীস্ত্রীর পরিসংখ্যান যদি সদর্থক না হয় তাহলে সদর্থক উদাহরণ বলতে কি বুঝবো ? রাস্তার পাশে ড্রেন আছে বলে সেই রাস্তাটাই কি আপনার বিচারে পরিত্যাজ্য ? আমি অন্তত সেই মতের মতি নই, সেই পথের পথিক নই !"

"কিন্তু যদি পরিসংখ্যানের শতকরা হিসাব বাহিত হয়ে তোমার স্কন্ধেই সেই 'প্রথা' — ভুতের সিন্দবাদ চেপে বসে ? যদি তোমার বাসটাই খাদে পড়ে ? তোমার 'জনপদই' অগ্নিদগ্ধ হয় ?" প্রশ্নকে ব্যক্তিগত মাত্রায় টেনে আনতে চাইলাম, অনিমার বিশ্লেষণটি জানার আগ্রহে।

বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ না করেই উত্তর দিল : "সেতো হতেই পারে ! তবে এখানে আমার বক্তব্য ত্রিবিধ ; এক অনুসন্ধান, পর্যালোচনা এবং প্রকল্প গঠন, দুই, রক্ষা করার প্রার্থনা নয়, বিপদে যেন না করি ভয় এই মানসিক প্রস্তুতি, এবং তিন মানুষের পরিবর্তনে বিশ্বাস।" বলেই বেশ সরস চোখে আমাকে অবলোকন করল এবং প্রশ্ন করল, "কি ব্যাখ্যা চাই তো ?" আমি বললাম "নিশ্চয়ই, তুমি এতো সংক্ষেপে — ক্রিপটিক্যালি তোমার বক্তব্য রেখোছো যে ব্যাখ্যা ছাড়া — নোট বই ছাড়া আমার পথ কোথায় ?"

"ধরা যাক্ আমি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রেম করছি। এই প্রেমের প্রান্ত-উপান্তে সানাই-এর ব্যবস্থা পাকা হতে চলেছে। তাহলে আমরা দু'জনে প্রেমিক-প্রেমিকা দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে একে অপরকে জানা-চেনার সুযোগ পেয়েছি ধরে নিতেই হয়। সে প্রথম দৃষ্টিতেই হোক আর অনেক শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা পেরিয়েই হোক প্রতিনিয়তই প্রাক-বিবাহ পর্যায়ে, অনুসন্ধান চলেছে, পর্যালোচনা চলেছে এবং সব কিছু সহায়ক মনে হলেই তো ছাত্না-তলার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছে ? যদি এই সময়ে প্রকৃতি শক্তিশালী হয়ে থাকে অথবা চোখের দৃষ্টির চাইতে কাজলের দিকেই বেশি নজর পড়ে থাকে তাহলে অকারণ সমাজকে আর পুরুষকে আর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অদৃষ্টকে দোষারোপ করে লাভ কি ? এবারে আসুন দ্বিতীয় বক্তব্যে : চোখের দেখায় সব দেখা হয়ে ওঠে না, মনের মিলনে ব্যক্তির সঙ্গে হলেও পরিজনের সঙ্গে সর্বদা মিল নাও হতে পারে। প্রেমপর্যায়ে জীবনের যে প্রকোষ্ঠটি জরিপ করা হল সেটাই তো যৌথজীবনের সবটা গৃহ নয়। তাই বিপদ লুকিয়ে থেকে ঘাড় মটকে দিতেই পারে। একজনকে নিয়ে সংসারেও তো অন্ধকারের উপস্থিতি থেকে যেতে পারে ; সেই সম্ভাবনা কি একাধিককে নিয়ে পরিবার জীবনে বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে না ? তখন চোখের জলে আর নাকের জলে করজোড় হয়ে প্রার্থনা তো ভিখারীত্বের সূচক। সম্ভাবনাকে মনে রেখেই তো মনকে প্রস্তুত করার কথা। স্রোতে কুটোটির মতো ভেসে যাওয়া যাদের স্বভাব তারা কূল পাবে কোথায় ? তাই নির্ভয় হয়ে সমস্যাকে সম্মুখ করার মধ্যেই সমাধানকে খুঁজে নিতে হবে। সভ্যতার অপর নামই তো ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত থাকা ; বর্বরতা প্রতি পদেই অপ্রস্তুত।"

না বলে থাকতে পারলাম না, "এতো তোমার কথা নয়, মহাজনের কথা।" অনিমা বলল, "আমাদের কটা কথাই আর নিজের ? আমরা তো সকলেই সেই ছোটবেলা থেকেই অপরের কাছে কথা ধার করে করে চলতে অভ্যস্ত। খাদ্যটা যেখান থেকেই আসুক, হজম প্রক্রিয়ায় যে পুষ্টি সেটা নিজের হলেই হল।" বলতে বাধ্য হলাম যে কথাটা মান্য করার মতোই।

"এবারে আসা যাক্ আমার তৃতীয় বক্তব্যে। জীবন যে নিত্য প্রবহমান নিত্য পরিবর্তনশীল সে

কথা বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে সদাই উচ্চারিত, অপেক্ষার একাগ্রতাকে একটু দীর্ঘতর করলে, একটু ধৈর্যের, কিছুটা সময়ের আর অনেকটাই প্রতিযোজনের সুযোগ রাখলে জীবনের অনেক লক্ষ্যই অধিগত হয়। এই বিশ্বাস প্রদীপের মতো আলো দিতে পারে বিব্রত-বিক্ষুব্ধ-বেপথু জীবনকে। এটাই আমার বিশ্বাস।"

"তোমার উপস্থাপনায় তুমি কেবলমাত্র প্রেম-ভালবাসায় বিবাহের প্রস্তাবটিই মাত্র তুলেছো। সব বিয়ে তো আর প্রেমের পথে ঘটে না! যেখানে অভিভাবকরা বিয়ের ব্যবস্থা করেন সেখানে? সে তো পূর্বপরিচয়হীন 'এক সুন্দর সকালে' চারিচক্ষুর মিলন। তোমার ত্রিপর্ব বক্তব্যের প্রথম পর্ব সেই সব ক্ষেত্রে কেমন করে এবং কতখানি ফলপ্রসূ হতে পারে?"

"সে তো আরও সোজা ব্যাপার!" এমন করে বলে উঠলো যেন জলের মতো সোজা সমাধান! বললাম, "একটু বুঝিয়ে বল তাহলে।"

'সে ক্ষেত্রে যারা অনুসন্ধান, পর্যালোচনা আর প্রকল্প গঠন করেন, সিদ্ধান্ত নেন তাদের চোখে তো আর রঙিন কাচ থাকে না তাই বর্ণচ্ছটায় চোখ ঝলসিয়ে যাবার কারণ আদৌ অনুপস্থিত। তাদের ক্ষেত্রে গঙ্গার ধারের দক্ষিণে বাতাস কোনও প্রভাব ফেলে না, গ্ল্যাণ্ডের কোনও ক্ষরণই মাথা ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে না। আর সিনেমা হলের ঘেরাটোপে সিদ্ধান্তকে সমৃদ্ধ করেও তুলতে সাহায্য করে না। সে সব তাই পাকা-মাথা সিদ্ধান্তই হবার কথা। তবে এদের ক্ষেত্রে, এইসব অভিভাবকদের ক্ষেত্রে, বাস্তব জীবন আর আগ্রহের আতিশয্য কখনও কখনও সিদ্ধান্তকে 'হেস্টি,' ভুল, আর অনাকাঙ্ক্ষিত করে তুলতে পারে। দৈন্য একটি কারণ। ছেলে-মেয়ের স্বভাব এবং মতিগতি আর একটি কারণ। এ-ছাড়াও অনেক 'কনস্ট্রেনটস্' বা আরোপ এদের দিক্-বিদিক্ জ্ঞানহীন করে ফেলতে পারে। সে ঐ ট্রেনে কলিশন হয় মতো সরিয়ে রাখা যায়। এক-আধটা ক্ষেত্রে শতকরা হিসেবে এমনটি হয় বলে নন্দলালের মতো পণ করে বসার কোনও কারণ তো দেখি না।"

আমি অনিমার বক্তব্যের গভীরে মনোনিবেশ করেছিলাম। ভাবছিলাম। তাই বোধহয় আমাকে একটু অন্যমনস্ক দেখে ও বলে উঠলো, "দেখুন প্রকৃতিতেই বলুন আর মানুষের সংসারেই বলুন যা স্বাভাবিক দৈনন্দিন তাকে নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। মোটর গাড়িটা চলতে থাকলে এ প্রশ্ন কেউ করে না যে সেটা চলছে কেন? কিন্তু যদি হঠাৎ থেমে যায় তাহলেই প্রশ্ন থামল কেন? যে ব্যক্তি রোজ অফিসে যায় তাকে কেউ প্রশ্ন করে না সে অফিস যাচ্ছে কেন বা যাচ্ছে কিনা: কিন্তু সোম-শুক্র যদি অসময়ে তাকে বাড়িতে বসে থাকতে দেখা যায় তাহলেই প্রশ্ন ওঠে 'অফিস যান নি?' ঠিক তেমনি আঠারো-আঠাশের কোনও মেয়েকেই কেউ এ প্রশ্ন করে না সে বিয়ে করে নি কেন কিন্তু আরও যত দেরি হবে প্রশ্নের সম্ভাবনা ততই কাছে আসবে এবং স্বাভাবিকই হয়ে উঠবে। বিয়ে করাটাই স্বাভাবিক যেমন সূর্যের আলো দেওয়াটা; বিয়ে না করাটাই অস্বাভাবিক তাই সে ক্ষেত্রেই প্রশ্নটি তাৎপর্যময়!"

আমি বললাম, "তা বটে।"

রায়বাঘিনী

বিনতা আমার অতিশয় স্নেহের পাত্রী। ওর মধ্যে একটা বিচারশীল মনের দেখা পাই বলে ওকে অনেক বেশি ভাল লাগে। একদিন বিকেলে এসে আমার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করল, 'আজ আপনার সঙ্গে তর্ক করব বলে সময় হাতে করেই এসেছি।' আমি অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম, 'তা বিষয়টা কি হবে?' সামনের হাতলওয়ালা চেয়ারটায় বসতে বসতে বলল, 'বিষয় যাই হোক না কেন। বিষয় আপনার ব্যাপার, উপস্থাপনাও আপনার। আমি ঠিক করেই এসেছি যে আমি অন্যপক্ষ নিয়ে আপনার সিদ্ধান্তকে যুক্তির আঘাতে আঘাতে অন্য কোনও ঘাটে, প্রান্তরে বা মরুপথে উড়িয়ে নিয়ে যাব!' বললাম, 'তাতে যদি সত্য মার খেয়ে যায়? যদি যুক্তির যাথার্থ্য নষ্ট হয়ে পড়ে? যদি আমার সিদ্ধান্তই তোমার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে?' বিনতা চোখের কোণটা সরু করে, ভ্রূর বাঁকটা নাকের গোড়ায় কুঞ্চিত করে বলল, 'আজ যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ! তর্কযুদ্ধ।'

বিনতার মনোভাব বুঝলাম। মন্দ-বক্তের উৎস মুখটি খুলবে না, বাক্‌যন্ত্রে শান দেওয়া যাবে, মান অভিমানের সম্ভাবনা থাকছে না অথচ চোয়ালের পেশীগুলোকে যথাসম্ভব অনুশীলন করানো যাবে — এমন ক্ষেত্রটি বেছে নিয়ে অবসর সময়ের অবসন্নতাকে ও উত্তেজনা দিয়ে ভরে তুলতে চায়। বিপথ চালিত করার জন্যে বললাম, 'কেন, আজ কোনও অমল-বিমল-কমলকে পেলে না?' ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকিয়ে চুলের গোছাটা পেছন থেকে সামনে এনে টান্ টান্ ফেলে দিয়ে বলল, 'প্রথম কথা ওদের সঙ্গে দু'পা ফেললেই ওরা কবিতা বলতে শুরু করে, তিন পায়ে অবাস্তব পরিকল্পনার কথা শোনায়, চার কদমে ফুলের শোভা আর আকাশের নীল ওদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, পঞ্চমে সুর তোলে আর সপ্তপদীর জন্যে টলমল্ মন নিয়ে কি করবে তা খুঁজে পায় না। আর দ্বিতীয় কথা স্পষ্ট করে বলাই ভাল ঃ ভবী আজ ভোলার পাত্র নয়! বলেই আবার ঘোষণা, 'বিষয় উত্থাপন করুন, আমার তর সইছে না!'

অনেকদিন ধরেই তনিমা-অনিমার 'বিয়ে করতে চাই না, আর বিয়ে করতে চাই' মামলাটা আমাকে ঘোরে ফেলেছিল। ঐ বিষয়ে কোনও একজন তৃতীয় পক্ষের মতামত নেবার ইচ্ছাটা বেশ প্রবল ছিল। সুযোগ সহজেই হাতে এসে গেল ভেবে বললাম, 'বিনতা, আজ তর্ক নয়; অনেকদিন ধরেই তক্কে-তক্কে ছিলাম, আজ তোমাকে পেয়ে গেছি, এবং বেশ খোলামেলা মানসিক অবস্থাতেই পেয়ে গেছি। বিয়ের ব্যাপারে তনিমা আর অনিমা একেবারেই বিরুদ্ধ মত, বিপরীত বিচার এবং অসম সিদ্ধান্ত করেছে। মন দিয়ে শোন এবং তোমার মতামত দাও। প্রয়োজনে আমি প্রতিপক্ষের ভূমিকা নিতে পারি, পারি মাঝে মধ্যে বোঝার সুবিধার জন্যে প্রশ্ন করতে, প্রশ্ন তুলতে। আমার এই প্রস্তাবকে তুমি নিশ্চয়ই দ্বিতীয় সর্বোত্তম বলে মেনে নিতে পারবে!'

'খোশমেজাজে চাইলাম একখণ্ড তর্ক, আপনি এনে দিলেন একবাটি আলোচনা! আপত্তি করব না, এড়িয়ে যাবার চেষ্টাও করব না। বিরিয়ানী যদি আজ নাই জোটে, মুরগীর ঝোলেই তুষ্ট হব।' বলে মন দিয়ে দুজনের বিশ্লেষণ আর সিদ্ধান্ত শুনল। বলল, 'দু'জনেই তো ঠিকঠাক বিচার-বিবেচনা করেছে। বাদ গেছে অনেক বিষয় যা জরুরী ছিল। দুজনে পুরুষকে এবং সমাজকে দু'টো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছে; দেখেছে মেয়েদের সনাতন দিক থেকে আর একেবারে আধুনিকতার চোখে। তাই ওরা যা দেখেছে ঠিক তাই দেখতে চেয়েছে বলেই দেখেছে। দু'জনেই নিজ নিজ সিদ্ধান্ত

পকেটে করে আলোচনায় বসেছিল বলা যায়; আর তাই সেই সব তথ্য এবং যুক্তি ব্যবহার করেছে যা ওদের সিদ্ধান্তের পক্ষে উপযোগী। তাই ওদের আলোচনা বৈজ্ঞানিক না হয়ে বিষয়ীগত — সাবজেক্টিভ — হয়ে গেছে। আর আপনি তো ভাল করেই জানেন বিষয়ীগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা যৌক্তিক বিরুদ্ধতা নয়; কারণ এই বিরুদ্ধতা একই সঙ্গে সত্য হতে পারে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নৈব নৈব চ।'

'বড়জন, তনিমা, পুরুষদের সামান্যীকরণ করেছে সার্বিকভাবেই। ছোট অনিমা, সনাতন পথে মেনে নিয়েছে তাদের অধিকার, আধিপত্য, অধিকাংশের পরিভাষায়। দু'জনেই তো সরলীকরণ করে নিয়েছে নিজের নিজের মতো করে। পুরুষকে, সমাজকে, সামাজিক অনুষ্ঠানকে। একজন বিবাহকে পরিত্যাজ্য বন্ধন-মাধ্যম দড়ি-দড়া বলে বিরক্তি প্রকাশ করেছে, অন্যজন সানাই-এর পাশাপাশি শাঁখের আওয়াজ আর নহবতের ধ্বনিকে স্বাগত করেছে। একজনও কিন্তু উল্লেখ করেনি পুরুষের লালনকারী মা-ঠাকুরমার কথা, বলেনি রায়বাঘিনী ননদিনী, পুরুষের আশৈশব সঙ্গী মহিলাটির জাগ্রত উপস্থিতির কথা।'

'আমরা, মেয়েরা, একই সঙ্গে বহুরূপে পরিবার আর সমাজে ছড়িয়ে আছি। প্রকৃতির অমোঘ বিধানে আমরা না হলে পুরুষও সম্ভব নয়, মেয়েরাও সম্ভব নয়। সূর্য থাকলেই রোদ হয় না; রোদের জন্যে প্রতিফলনযোগ্য জমি চাই, ধরণী চাই। পুরুষ বা সূর্য আবশ্যিক শর্ত, অনিবার্য শর্ত নয় — এটাই আমার বক্তব্য। সন্তানের মুখে প্রাণের পীযুষ আমরাই পৌছে দিই; তাদের লালন-পালন থেকে মনের গঠন, অনুভবের তরঙ্গ-ভঙ্গ আর চিন্তাভাবনার গতি-প্রকৃতি তো আমরাই, মা-ঠাকুমা হয়ে, তৈরি করে দিয়ে থাকি। আবার দীর্ঘ কম বেশি কুড়ি-চব্বিশ বছর — সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবার স্মরণ রেখে — মা-বাবার সঙ্গে কাটিয়ে, সেই পরিবারের ভাল-মন্দ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কার সঙ্গে করে একদিন কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে অন্য গৃহে, অন্য পরিবারে চলে যাই। যতখানি আমরা চলে যাই তার অনেক বেশি আমরা বোধহয় পেছনে থেকে যাই। আর যতটুকু নিয়ে আমরা নতুন পরিবেশে পৌছোই তার চাইতে অনেক বেশি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মনের আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাই। এ একটা অস্তিত্বের স্ববিরোধ। মাতৃগৃহ থেকে আমরা স্বামীগৃহে যাই; একদিকে যতটা যাই তার থেকে অনেক বেশি নিয়ে পৌছোই; আবার সরে গিয়েও ফেলে রেখে যাই অনেক অনেকখানি অংশ। বর্তমানে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস নিই, স্বামীগৃহে। অতীতে আমরা আমাদের একটা সুবৃহৎ খণ্ডকে রেখে যাই দিক্‌নির্দেশের জন্যে, পিতৃগৃহে। এই দহনে, এই স্ববিরোধে আমরা বাঘিনী হয়ে উঠি, রায়বাঘিনী ননদিনী।'

আবার, আমরাই বিবাহ পূর্বদিনে, মা-বাবার স্নেহের বাতাবরণে, নবাগতা ভ্রাতৃবধূদের বন্ধু, দার্শনিক, পরিচালকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এখানেও দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য এবং অধিকারের খণ্ডায়ন আমাদের চেতনে-অচেতনে তালভঙ্গ ঘটায়। প্রত্যেক পরিবারেই বয়স্কা কন্যাদের একটা বিশেষ স্থান নিশ্চিত থাকে। স্নেহ নিম্নগামী; ভালবাসা একচ্ছত্র দাবিদার। সেই নিম্নগামী স্নেহে ভাগ বসে যায়, নববধূর ভাগ, সংসারের একচ্ছত্র দাবিদার আর একচ্ছত্র থাকে না। এটা যেমন স্বাভাবিক, পুত্রবধূর বা গৃহবধূর স্থান যেমন যেমন স্বাভাবিকভাবেই স্থির হতে থাকে, ঠিক তেমনি স্বাভাবিক, স্বভাবের অনুসারী, গৃহকন্যার ক্রমশ স্থান হারানোর বেদনা, পূর্বস্থানের অবমূল্যায়ন ঘটতে থাকে। ক্রোধ, ক্রূরতা, অধিকারস্পৃহা তাড়িত করে ফেরে গৃহকন্যাকে! 'অপরে' এসে দু'দিনেই, দাদাকে, বাবাকে, মাকে — সকলকেই আপন করে নিচ্ছে, নেবে? দুর্ভাবনায়, দুশ্চিন্তায় ঘুম ছুটে যায় কন্যার; অবচেতনের পীড়নে সে হয় শ্বাপদ, হয়ে ওঠে কুটিল, দু'মুখো সরীসৃপ এবং সবশেষে এই পথের প্রান্তীয় অবস্থান রায়বাঘিনী স্বরূপ।

অবিবাহিতা কন্যাই হোক আর বিবাহিতা কন্যাই হোক, গৃহকন্যারা মাতৃসান্নিধ্যে সকলেই

সফরী — গণ্ডূষজলমাত্রেন — এখানে, স্বগৃহের কুড়ি-চব্বিশ বছরের পরিসরে। মেয়েরা মা-দের বিবেক-থলিকা হয়েই বড় হয়ে ওঠে — 'কন্‌স্যান্স কীপারস্‌'। মা-এর কাছে পুত্রের যদি সাত-খুন মাপ, তাহলে, মেয়ের শত বা সহস্র খুন মাপ হয়ে যায়। তাই খুন করতে, মায়েদের সান্নিধ্যে, মেয়েদের হাত কাঁপে না — সে সূর্যচিহ্নিত কপালই হোক, অথবা চন্দ্রলাঞ্ছিত কপালই হোক্‌। হাত কাঁপে না তার কারণ শত-সহস্র 'চেক-কাটার' — খুনের চেক — অপার অধিকার। গরুর শবদেহ গরুর গাড়িতেই বাহিত হয়! কন্যারূপে হন্তারক নিজেরই বধূরূপ শবদেহে নিজেরই অবচেতনের আগুন দিয়ে দহন করে। সরীসৃপদের কোনও এক প্রজাতি নাকি নিজেই নিজেকে ভক্ষণ করে — ল্যাজ থেকেই শুরু করে। আমাদের সমাজেও কন্যারাই কন্যাদের ভক্ষণ করে, মায়েরা পাশে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস দেয়! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্‌!

'এক কন্যা রাঁধে বাড়ে আর এক কন্যা খায়' — এমন করে ছড়া আছে। কিন্তু বহিরাগতা কন্যা, বধূটি, স্বামীর সংসারে এসে 'মা' পায় কিন্তু 'বিবেকের থলিটি' পায় না; সম্বোধনের অধিকার পায়, কিন্তু মাতৃহৃদয়ের মর্মধ্বনিটি পায় না। সেই থলিটি, সেই ধ্বনিটি নিঃশর্ত তুলে দেওয়া আছে 'আর কন্যার হাতে'! যার কাছে গচ্ছিত আছে সে সেই থলিটিকে, সেই মর্মধ্বনিটিকে সযত্নে, সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখে অধিকারের আঁচলে, আলমারির গভীরে আর বাক্সের অতলে! 'এক কন্যার' নবপ্রেক্ষিত হৃদয়ের মুখে ফুটে ওঠে বিরাট গহ্বর, অসহায়তার হাহাকার। তার মন ছুটে ছুটে খুঁজে ফেরে মাতৃগৃহের অধিকার আঁচলখানি, আলমারির গভীরটুকু আর বাক্সের অতলখানি! স্বামীগৃহে প্রতি পদে শিক্ষানবিশী চলে 'আর কন্যার' সদাজাগ্রত দৃষ্টির আর শাশুড়ির নম্রকণ্ঠ উচ্চারণের সামনে — না, না, না; এটা নয় ওটা নয়; আমাদের এমন, আমাদের তেমন, তোমাদের মতো নয়, — ইত্যাদির পাঠন-অনুবর্তনে। চেতনার সামনে মহান দায় — নিজেদের মতো করে গড়ে নেওয়া, অবচেতনে অঢেল তৃপ্তির তরঙ্গভঙ্গ — গুরুত্বের আর অধিকারের সার্থক প্রয়োগ! হাঁপিয়ে ওঠা মন নিয়ে সারাদিন অপেক্ষাকে একাগ্র করে বসে থাকবে এই 'এক কন্যা' স্বামীর প্রত্যাবর্তনের সময়টুকুকে চোখের তারায় স্থির রেখে; দিন কাটবে 'পরবাসে' — মহিলাদের তাড়নাতেই স্বামী-বাস এতদিনে পরবাস হয়ে উঠেছে — নিজেকে খুঁজে পাবে রাত যখন তার তারুণ্য হারাবে। বিবাহ যে বন্ধনে স্বামী-স্ত্রীকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে সেই বন্ধনের এক প্রান্তে স্বামী অন্য প্রান্তে স্ত্রী। স্বামী একটি অকাট মূর্খ, সংসারের ভালমন্দ সে কিছুই বোঝে না, জানে না এবং নিজের স্ত্রীকে 'শিখিয়ে-পড়িয়ে' নিতে হলে সেই স্বামীই যে শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক এই কথাটি গৃহের মহিলারা কেন বোঝেন না? বিশেষ করে শাশুড়ি এবং ননদ? বিষবৃক্ষের বীজটুকু উপ্ত না করলেই কি নয়? এবং, সুতরাং, প্রথম সুযোগেই এই 'এক কন্যা' মাতৃগৃহে গেলেই সেই ফেলে আসা থলিটি আর মর্মের ধ্বনিটির জন্যে আঁকুপাঁকু করতে থাকে। বিস্ময়ের কোনও কারণই নেই, প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া মাত্র। যে মনটি গড়ার কাজে ব্যাপৃত হতে পারত সে লেগে গেল রূপ পাল্টে রায়বাঘিনী হতে, 'যদৃষ্টম্‌ তল্লিখিতম্‌' নীতিতে সুযোগ পেলেই 'বিবেকের থলিটি' কোলে নিয়ে আত্মার তৃপ্তি, হৃদয়ের শান্তি এবং মনের স্থৈর্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হবে এতে আর অন্যথা কোথায়?

পুরুষের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম? পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে? আমরা, মহিলারা কি আয়নার ব্যবহার করব রূপচর্চার জন্যেই? মনের দর্পণে কি নিজের নিজের অন্তর-প্রকৃতির প্রতিরূপের সন্ধান করব না? মানুষের স্বভাবের মধ্যেই উপ্ত আছে সেই বাসনা যা অন্যায়, অবিচার, দোষত্রুটির জন্যে একে অপরের স্কন্ধ অন্বেষণ করে; নিজেরও যে একটি স্কন্ধ আছে, সেখানেও যে কিছু কিছু বোঝা স্বভাবজ কারণেই এঁটে যাবার কথা সে কথাটি আমাদের মনেই পড়ে না! 'ধরে আন্‌ চোর' বলে যে কোনও 'উত্তীয়কেই' ধরে আনা যায়, অন্তত ঘোষণা করা যায়; তার পরে তার

ফাঁসির ব্যবস্থাটি করে ফেললেই চৌর্যের অবসান! আমরা, মেয়েরা অমল-বিমল-কমলদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সিদ্ধান্ত করব আর কতদিন?

আমরা, মেয়েরা, অনেক বেশি সংসারের ভিতরের খবর রাখি, রাখার সুযোগ পাই। সুযোগ পাই কারণ আমরা একটু বয়স হতে না হতেই মায়ের বন্ধু, সখী, সমর্থক। তার পরে মায়ের একান্ত চোখের জল আমাদের চোখে এবং মনে সহজেই সঞ্চারিত হয়ে যেতে থাকে। সেই অশ্রু সকারণ কি অকারণ সেই বিষয়েও আমরা মায়ের দ্বারা প্রভাবিত। প্রত্যক্ষ তো নিতান্তই আপেক্ষিক — বিশেষ, সেই জটিলতার মূলে সম্পর্কের টানাপোড়েন, লেনদেনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সর্পিল গতি, স্বার্থের ছোটবড় হানাহানি, অধিকার-অনধিকার ভেদাভেদের মন ও মান কষাকষি, এবং অর্থ, যা প্রবাদমতে সব অনর্থের মূল। রাজনীতির পথ যদি হয় অত্যন্ত কূটিল, তাহলে সংসারের নীতি এবং কৌশল ততোধিক জটিল এবং, অবশ্যই, তদপেক্ষা কুটিল। সেই জটিল-কুটিল সুতো টানাটানির ঠিক মাঝ মধ্যিখানে আমরা সংসারের হাতেখড়ি নিয়ে থাকি। মা-দিদিমা, মাসি-পিসি, কাকিমা-জ্যেঠিমাদের মনের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায়, চিন্তার সুতোয়-সুতোয়, আদায়-তাগাদার মান-অভিমানের তরঙ্গ-ভঙ্গে-ভঙ্গে। আমাদের শিক্ষার প্রায় সবটাই হাতেকলমে, প্রত্যক্ষের 'প্রমাণিত' পদ্ধতিতে। পুরুষের মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, দুর্বলতা আমরা যেমন জেনে যাই, তেমনি বুঝে যাই কোথায় কোথায় পুরুষের চিন্তা-অনু-ভব-আবেগের 'স্যুইচ'গুলো ছড়ানো থাকে, লুকোনো থাকে, আর কোথায়ই বা তারা দৃশ্যতই স্বপ্রকাশ।

পুরুষরা যে সংসার নৈবেদ্যে শশার টুকরো, 'টিটুলার হেড' মাত্র তা আমাদের নারীদের, প্রায় আজন্মজ্ঞাত সত্য। প্রকৃতি ঠাকুরানী অবশ্যই আমাদের সমধিক স্নেহ করেন, নিজের অন্দর মহলের যাবতীয় অস্ত্রসম্ভারে আমাদের কুশলী করেন, সমৃদ্ধ করেন। আমরা তাই স্টিয়ারিং-এ হাত না রেখেও সংসার-গাড়িটিকে আমাদের ইচ্ছামতো চালাতে পারি। এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে এতোই স্বাভাবিক, প্রকৃতিজ এবং পুরুষের কাছে এতোই স্পর্শকাতর যে এই 'পাপেট্রি' বিষয়ে কোনও পক্ষই সামনাসামনি হতে চায় না, খোলাখুলি করতে চায় না। এটাও একটা চলছে-চলবে গোছের সহাবস্থান। আমরা যেমন কাগজ পড়তে ভালবাসি না, বিশ্ব জাগতিক সমস্যায় যেমন আমাদের কোনও ইতরবিশেষ থাকে না, রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে যেমন আমরা থাকিই না (সাধারণত) তেমনি আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই সকল বিষয়-ব্যাপার পুরুষের হাতে সর্বসত্ত্ব সম্প্রদান করে দিতে অভ্যস্ত, এবং, সংসারের, পরিবারের, অভ্যন্তরীণ বিষয়-ব্যাপারে একেবারেই হস্তক্ষেপ অসম্ভব করে রাখি। ঝি-চাকর-মালী, দুধ-ঘুঁটে-রাঁধুনী থেকে শুরু করে ছেলেমেয়ের বই-খাতা, জামা-কাপড়, পালপার্বনের ব্যবস্থা, উপহার-'প্রেজেন্টেশন', মায় বেড়াতে যাবার যাবতীয় অনুপুঙ্খ নির্ঘণ্ট সবই তো 'মাকে বল' বা 'মাকে জিজ্ঞেস কর' — যদিও সর্ব ব্যাপারেই অনুদানের দায় বা সর্ব খরচখরচার দায়িত্ব নিরঙ্কুশ পুরুষেরই!

তাই একদিকে অধীত জ্ঞানের এবং প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা স্বগৃহে এবং স্বামীগৃহে ঘুঁটি চালাচালিতে অংশগ্রহণ করি, অন্যদিকে চালের ত্রুটির যাবতীয় দায় পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গৃহকোণে মৌন অভিনয় করে রাত্রের অপেক্ষা করি। মূর্খরাই গলা ছাড়ে এবং নিজের মূর্খতার জালে জড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতিঠাকরুন এই সমগ্র বিশ্বটিকে তার নিয়মের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, অঙ্গুলিহেলনে আর সুতোর টানে সবকিছুকে পরিচালিত করে চলেছেন। অথচ একেবারেই মৌন, মূক, যেন কোথাও নেই এমন একখানা ভাব। আমরা সেই প্রকৃতিদেবীরই তো গৃহদেবী মূর্তি। তাহলে আমাদের অন্যথা হবে কেন? প্রকৃতিতে তাণ্ডব প্রকাশ নেই তা নয়; আমাদেরও প্রয়োজনে তাণ্ডব মূর্তি ধারণ অসমর্থিত নয়, অঘটনও নয়। সে অন্য কথা, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়ার কথা।"

এতক্ষণ একনাগাড়ে নিজের কথা আপন মনেই বলে চলেছিল বিনতা। বাধা দিইনি। এবারে প্রশ্ন করতেই হল, 'এতো কথা থেকে তুমি কি বোঝাতে চাও?'

'একেবারে গোদা বাংলায় বলি?' এমন করে প্রশ্নের সঙ্গে দৃষ্টিটা ছুঁড়ে দিল যেন অনেকভাবেই এবং বহু ভাষাতেই আমার প্রশ্নের উত্তর ওর ঠোঁটস্থ। আমি কি চাই মাত্র তারই অপেক্ষা। বললাম, 'তাইই বল!' 'তাহলে শুনুন! আমরা মেয়েরা, পিতৃগৃহে সহজ-সরল 'পেরেকটি' হয়ে জন্মাই। ধীরে ধীরে সংসারের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর 'প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস' দেখে দেখে ভিতরে ভিতরে প্রত্যেকেই এক একটি 'স্ক্রু' হয়ে বা 'স্ক্রু-র' সুপ্ত স্বরূপ সঙ্গে নিয়ে বড় হয়ে উঠি, শ্বশুরবাড়ি যাই এবং সেখানেও ধীরে ধীরে স্বরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ি।'

আমার অন্তরের গভীর থেকে একটা 'না না' যেন হাউই-এর মতো ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইল — 'না, এ হয় না, এমন ক'রে সামান্যীকরণ করা শোভন নয়, সত্যি নয়, স্বাভাবিক নয়।' তাই বলতেই হল, 'বিনতা, তোমার এই সার্বিক মূল্যায়ন, বরং বলা উচিৎ অবমূল্যায়ন মেনে নেওয়া যায় না। সব মেয়েদের প্রতি এমন একটা আরোপ তুমি কেমন করে করতে পারলে?'

'আমার বিশ্লেষণে আপনি কষ্ট পেয়ে থাকলে সেটা দুঃখের; কিন্তু বেদনাবোধের প্রকৃতই কোনও কারণ নেই। মেয়েরা স্ক্রু হয়ে, কুটিল স্বভাব নিয়ে জন্মায় না; সংসারের ঘেরাটোপের জীবন, প্রচলিত বিধিবিধানের পীড়ন, আর প্রতিনিয়তর মানসিক গড়াপেটার চাপে মেয়েরা ছেলেদের মতো মুক্ত একটা আকাশ থেকে বঞ্চিত হতে হতেই বড় হয়ে ওঠে। তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জীবনের হাতুড়িটি ঘা মেরে মেরে প্রাকৃতিক শক্তির, বুদ্ধির, চেতনার আর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রসারটাকেই পঙ্গু করে দেয়। এই 'কেন'-বিষয়ে আমি কিছু না বলেই ফলাফল বিষয়ে ঘোষণাটি করেছি। তাই আপনার বেদনাবোধ ঘটে থাকবে। দ্বিতীয়ত, সুপ্ত স্বভাবের কথা বলেছি, বলেছি সম্ভাবনাটুকুর কথা, উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই সেই স্বভাব অঙ্কুরিত, পরিস্ফুট হবার সুযোগ পায় মাত্র। বরং বলা উচিত 'অনাকাঙ্ক্ষিত', 'পীড়াদায়ক', সহানুভূতিহীন পরিবেশ পেলেই মেয়েদের 'স্ক্রু'-প্রকৃতি প্রকাশে পল্লবিত হয়ে ওঠে। আর তখনই স্বামীকে সামনে রেখে মেয়েরা পুতুলনাচের কৌশলটুকুকে ব্যবহার করে। তৈরি হয় মন কষাকষি, টান পড়ে সনাতন বিশ্বাস-অবিশ্বাসে, ছিঁড়তে থাকে অনেক সূক্ষ্ম তন্ত্রী। একদিকে পুরোনো দৃঢ়-প্রোথিত মূল মহিলারা — শাশুড়িরা ননদরা এবং যৌথ হলে আরও অনেক অনেক — অন্যদিকে সদ্য উৎপাটিত কিন্তু অন্যতর মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, আচার-বিচার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং আরও অনেক কিছু। ফেলে আসা জীবন, অথবা ফেলে যাওয়া জীবন নিয়ে মেয়েরা টবের স্বল্প-খাদ্য সীমিত-পরিসর জীবনে শ্বাস-বদ্ধ অবস্থায় জীবন শুরু করতে বাধ্য হয়। শাশুড়িরা ভুলে যান তাদের অনেক পুরোনো হয়ে যাওয়া প্রাক্-বিবাহ কষ্টের কথা, বেদনার দিনগুলো। তাই তারা সমর্থনে-সহানুভূতিতে নববধূদের জীবনকে সহনীয় করে তুলতে সাহায্য করেন না। এমনও হতে পারে যে তাদের অবচেতন তৃপ্তি খুঁজে নেয়, শোধ তুলে নেয়, ফেলে আসা চাপ চাপ কষ্টের অনুভবগুলোর! মেয়েরা, ননদরা যেহেতু মায়েদেরই 'বিবেকের অছি' বা 'থলে-ধারক', তাই তারা 'পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'-নীতিতে চিৎকৃত সোচ্চার হয়ে জীবনকে, নবাগতার জীবনকে 'শিক্ষিত' করে তুলতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।'

বিনতাকে আবার বাধা দিতে হয়। বললাম, 'আজকের দিনে মেয়েরা, মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এবং শাশুড়িরা, প্রায় সকলেই শিক্ষিত, অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। জ্ঞান বিজ্ঞানের ছোঁয়ায়, বাইরের জগতের সংস্পর্শে আর নিজ-নিজ চিন্তাভাবনার উন্মেষে তাঁরা সকলেই মনের একটা প্রসার পেয়েই থাকেন। তাঁদের মনের কোনও পরিবর্তন হয়নি, তাঁরা নতুন করে এই সব সাংসারিক বিষয়-ব্যাপার নিয়ে ভাবেন না এটা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। তুমি বোধহয় এঁদের প্রতি অবিচার করছ।'

'না, অবিচার করিনি একেবারেই। মানসিকতার কোনও পরিবর্তনগুণগতভাবে ঘটেনি। তবে আগেকার দিনে, যখন শিক্ষা — স্কুলকলেজের শিক্ষা — এতোটা পরিসংখ্যান-পুষ্টি পায়নি তখন যা ছিল হাতুড়ির ঘা, রূঢ় আঘাত, এখন তাই হয়েছে বৈদ্যুতিক 'শক্-থেরাপি', মাখনে ছুরি রেশম-মসৃণ ব্যবহার-নির্দেশ। আগে যা ছিল সোজাসুজি, একেবারে গ্রাম্যতার প্রকাশ, এখন তাই ঘটছে 'র‍্যাশনালাইজড়' পরিশীলিত অনুশাসনের মাধ্যমে। তফাত যা কিছু হয়েছে তা 'ভাবে' নয়, প্রকাশের মাধ্যমে। বেদনাবোধ তখনও যা ছিল এখনও তাই আছে। কিন্তু আগে স্বাধীনতার বোধটি আজকের মতো পরিষ্কার ছিল না বলে সহ্যের ক্ষেত্রে অতীত এবং বর্তমানে প্রভূত প্রভেদ ঘটে গেছে, যাচ্ছে। মানিয়ে নেবার ব্যাপারটা তখন যেমন অনিবার্য ছিল বলেই সহজ ছিল, এখন সেই অনিবার্যটুকু হারিয়ে গিয়ে মানিয়ে চলাটাও আর সহজ নেই, কঠিন হয়ে গেছে, যাচ্ছে।'

'তাই যদি হয় তাহলে শুধুমাত্র ননদিনীদেরই কেন দোষ দেওয়া হয়, তাদেরই কেন 'রায়বাঘিনী' বলে দোষারোপ করা হয়? প্রশ্নটি অনেক আগে থেকেই আমাকে খোঁচাচ্ছিল। এবারে বলে ফেললাম। জানতে চাইলাম, 'তোমার মতে কি পুরুষেরা ধোয়া তুলসী পাতা?"

বিনতা কিছুটা উত্তেজনার ভাব করে বলে উঠলো, 'আমি মেয়েদের কথা বলতে সব মহিলাদের কথাই বলে চলেছি। আর আপনি কি এতক্ষণ মেয়ে বলতে অবিবাহিত বা বিবাহিত গৃহকন্যাদেরই বুঝে চলেছেন? আসলে আমরা, মহিলারাই তো আমাদের যন্ত্রণার কারণ, কার্য এবং কার্যকারণ! পুরুষেরা আমাদের কথা আমাদের কাছ থেকেই তো জানেন, জেনে নেন বা জানানো হয়। আর কে না জানে যে সব প্রতিবেদনেই প্রতিবেদকটির মানসিক গড়ন, ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপরেখাটুকু সযত্নে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয় শ্রোতার মনে!' থেমে গিয়ে বিনতা আবার বলতে শুরু করল, 'আপনার প্রশ্ন অনুসরণ করেই উত্তর দেওয়া উচিত, "প্রথম, 'কেন শুধু মেয়েদেরই রায়বাঘিনী বলা হবে' সব মহিলারাই বাঘিনী; কিন্তু গৃহে উপস্থিত সাবালিকা কন্যারত্নটিই 'হালুম' অংশটি ঘোষণা করেন। তারা, আগেই বলেছি মায়ের এবং গৃহের 'বিবেক থলিকা'। তাই তাদের দায় বেশি, দাপট অনেক এবং সমর্থন প্রচুর। সেই জন্যেই সব মহিলারা বাঘিনী হলেও, এই ননদিনীরাই 'রায়' উপধিতে ভূষিতা! গৃহমূল্যবোধের এরা ধারক-বাহক নয়, কিন্তু পাহারাদার। তাই এদের মৌন-বা বাক্-ঘোষিত 'হালুম' হৃদকম্পের কারণ হয়ে দেখা দেয়। এরা বাবার স্নেহধন্যা, কারণ, সব বাদ দিলেও, 'আহারে! আজ-বাদে-কাল অন্য সংসারে চলে যাবে!'-যে। মায়ের কথা আগেই বলেছি: বিবেকের তল্পিবাহক। এবং এই ননদিনীরা গৃহের সর্বত্রগামী বিশেষ প্রতিবেদকের ভূমিকায় অভিনয় করে বলেই এদের ঝোলায় সংসারের যাবতীয় ছোট-বড় প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় খবরাখবর মজুদ থাকে। সেই সব খবরাখবরকে সময়মতো অস্ত্র হিসেবে এরা কাজে লাগায়, লাগাতে পারে, তাই এরা সমীহযোগ্য। এরা 'রায়' পর্যায়ের বাঘিনী।"

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল পুরুষদের বিষয়ে, 'কোন্ গুণ নেই তার কপালে আগুন' দিয়েই শুরু করা যাক্। হসন্তটি আমার দেওয়া। তার মধ্যেও প্রধান যে দোষ [নিজেরা মনে করেন গুণ] তা এই যে এঁরা মনে করেন সব জানেন, সব বোঝেন। প্রত্যেকেই এক একটি ঈগোর 'বাণ্ডিল'! ঈগোতে সুড়সুড়ি দিলে এরা বহমান জলতরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে প্রত্যেকে শিবতুল্য বর প্রদানে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এঁরা নিজেদের মনে করেন ব্যক্তিত্বে দৃঢ়, সিদ্ধান্তে অনড়, বিচারে নিষ্পক্ষ এবং কর্মে অক্লান্ত। এখানেই, এই প্রত্যয়ের মধ্যেই, লুকিয়ে থাকে এদের 'কাল', এদের 'শনি'। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যা বোঝে এরা সময় কালে, নেশার ঘোরে — আত্মপ্রকাশের নেশায় — তাও বোঝেন না। স্ত্রীর হাতের 'ওয়েদার-কক্' কন্যার অঙ্গুলিহেলনে 'বিচারক' আর গৃহের প্রয়োজনে অর্থসংগ্রাহক। এঁরা অকারণ রূঢ় হয়ে দৃঢ়তা প্রকাশ করেন, অপ্রয়োজনে খোঁচা দিয়ে অপরের

স্বাধীনতা বোধকে পীড়ন করেন (সবিশেষ মহিলাদের), গৃহের নির্ভরশীল 'অক্ষমদের' প্রতি পেশীবল দেখিয়ে শক্তির আস্ফালন করেন। এরা অফিসে-দপ্তরে-কাছারিতে বিনীত, গৃহে দুর্বিনীত। 'বাক্যেন মারিতং জগৎ' এইসব দশটা-পাঁচটার পুরুষেরা বাইরে যতটাই শক্ত ভিতরে ভিতরে ততটাই দুর্বল, নারীনির্ভর। এবং এই নারী নির্ভরতা এতোটাই ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রস্থিত যে স্বামী-স্ত্রী কলকাতা থেকে কর্মক্ষেত্র রামপুরহাটে গিয়ে পৌঁছ-সংবাদটি দূরভাষে শ্বশুরমশাইকে দেবেন, বাড়িতে পিতাকে নয় (ঘটনা)। কারণ? পিতা স্বামীর পিতা, পুরুষের পিতা, সুতরাং 'টেকেন ফর গ্রান্টেড়' আর শ্বশুর-পিতা, স্ত্রীর-পিতা, নারীর পিতা, তাই সেখানে খবর না দিলে তাঁদের 'টেনশন' কাটবে না! যে যে কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন উত্তর-বিবাহ দেখা দেয় পুরুষের মনে তাদের একত্রকৃত যৌথ নাম 'নারী প্রাধান্য'। পুরুষের প্রধান প্রধান দিনান্ত কাজগুলোকেও অমনি একত্রিত করে পরিবেশন করলে তার নামও হবে 'নারী-তোষণ' — 'স্ত্রী-সন্তোষ-সাধন!'

মনে মনে ভীষণ রাগ হচ্ছিল। পুরুষদের যে ভাবে বিনতা বিবরিত করছিল তাতে আত্মমর্যাদা আর অবশিষ্ট থাকছিল না! তাই ভিতরে উষ্মা চেপে যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করলাম, 'পুরুষদের তুমি 'ডি-কর্টিকেটেড়' — মস্তিষ্কহীন, একেবারেই 'ভেজিটেটিভ' অস্তিত্বে ঠেলে দিতে চাও? সিদ্ধান্ত যা কিছু তা কি পুরুষেরা শুধু বহন করেই চলে, সৃষ্টি করে না, গঠন করে না?' এ ধরনের মূল্যায়ন পুরুষের পক্ষে নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়, অবাস্তব, অসত্য নয়?'

'যে কোনও আলোচনার ক্ষেত্রে উত্তেজনা সবথাই ক্ষতিকর। ক্ষতিকর এই জন্যে যে তা আলোচনাকে বিপথচালিত করে, বিষয়ীগত করে তোলে। আবার সবিশেষ ক্ষতিকর এই জন্যেও যে, বিশেষ করে বয়স্কদের, উত্তেজনা অকারণ রক্তচাপ বাড়িয়ে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট করে। আমার কথায় আপনি যে উত্তেজিত তা আর মাত্র অনুমানের বিষয়ই নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'রায়-বাঘিনী', পুরুষ সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ঢুকে পড়েছে মাত্র; তবুও আপনি আহত হলে আমি স-খেদে আমার বক্তব্য তুলে নিচ্ছি' দুঃখ দুঃখ মুখ করে বিনতা 'এ্যাপলজি' করল। আমি বললাম, 'তুলে নিয়ে পালানোর পথ খুঁজলে আমি এখন তোমাকে ছাড়ব কেন? তোমাকে তোমার বক্তব্য 'জাস্টিফাই' করতে হবে।"

'মনে হয় একটু ভূমিকার দরকার আছে', বিনতা বলল, 'এই জন্যে যে হয়তো আমি যা বলতে চেয়েছি তা ঠিক ঠিক বলা হয়নি, নয়তো আপনি আমার বক্তব্যে যা বুঝেছেন তা আমি বলতেই চাইনি। এই ভাব আর ভাব প্রকাশের দ্বিত্ব, অথবা বিষয় আর বিষয়-বোধের ব্যবধান দ্বিত্বকে প্রথমেই অবসান করে নিতে চাই। পুরুষের বিরাট-ব্যাপক ক্ষেত্রটিকে প্রথমেই দু'ভাগে ভাগ করে নিন। প্রথম, নারীকেন্দ্রিক, স্ত্রী-কন্যা সম্পর্কিত ক্ষেত্র; এবং দ্বিতীয়, নারী বর্জিত, স্ত্রী-কন্যা অসম্পর্কিত ক্ষেত্র। আমার বক্তব্য শুধুমাত্র প্রথম ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে; দ্বিতীয় ক্ষেত্র-বিষয়ে আমার বক্তব্য, বক্ষ্যমান আলোচনায়, একেবারেই নেই। ছেলের নালিশ, অফিসের ফাইল, কলেজের বক্তৃতা আর সভাসমিতির বিশ্লেষণ, দেখবেন, পুরুষেরা, কোর্টের গম্ভীর মুখ বিচারকের মতো বিষয়গত নৈর্ব্যক্তিকতায় শোনেন, বলেন, ঘোষণা করেন। আবার, দেখুন, মেয়ের নালিশ — বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা সাশ্রুনেত্রে হয়ে থাকে — স্ত্রীর অনুযোগ, মায়ের অভিমান, মহিলা সহকর্মীর আনত দৃষ্টি প্রার্থনা (!) — সবই কেমন গোলমাল করে দেয় ভিতরের পুরুষত্বকে, কেমন যেন ঝুঁকিয়ে দেয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগ-অনুযোগের সঙ্গে সম্ভাব্য 'রায়'-টিও উচ্চারিত বা 'সাজেস্টেড' হয়ে পুরুষ মনে বুদ্ধির চাইতে আবেগকেই বেশি নাড়া দেয়, মথিত করে, পীড়িত করে, এবং অবশ্যই, উন্মুখ করে তোলে। এর কারণ বিষয়ে আগেই একবার বিস্তারিত বলেছি ঃ প্রকৃতি; প্রকৃতির বিলিব্যবস্থায় এই পক্ষপাত অন্তঃস্যূত, সর্বথা পরিব্যাপ্ত — প্রাণিজগত থেকে মনুষ্য জগত

পর্যন্তই এই 'ফাঁদ' ছড়ানো, পাতা ; কুশলী হাতের টানে টানে বাস্তব সত্য ! আপেলের ভূপৃষ্ঠে পতন যদি উত্তেজনার কারণ না হয় তাহলে পুরুষদের নারী-টান কেন আত্মপীড়নের কারণ হবে ?' বিনতা আমার দিকে এমন করে তাকাল যেন দেখে নিতে চাইল আমার মনের ক্ষত, কষ্ট, এবং উত্তেজনার কতটা ও মুছে দিতে পেরেছে।

'তাহলে সব দোষ নারীদের ?' যেন অসহায়তার কণ্ঠ আমাকে দিয়ে প্রশ্নটাকে দীর্ঘশ্বাসের মতো উৎক্ষেপ করিয়ে দিল !

'অবশ্যই। এবং সব গুণও মেয়েদেরই। এখানে ভুল করা একেবারেই চলবে না।'

'কিন্তু তুমি তো এতক্ষণ একবারও গুণের কথা বলনি ; এখন হঠাৎ ধুম করে 'সব গুণের মূলেও মেয়েরা' প্রস্তাবটি রাখ কেমন করে ?'

'একটা সোজাসুজি অনুসিদ্ধান্ত, 'করোলারি'। সংসার কেন্দ্রিক আমাদের আলোচনার বাইরের পুরুষ-ক্ষেত্র বাদ দিলে আমি সেই আসন স্টিচ্ ক্রেফ্ কাপড়ে কাচের ফ্রেমে বাঁধাই দেয়াল শোভায় বিশ্বাসী : 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। জীবনে যেমন 'হরি' — রাখে হরি মারে কে — সংসারেও তেমন : নারীই রক্ষাকর্ত্রী। সংসারের বাতাবরণে পুরুষ ইজিচেয়ারের আরামে দেহ এলিয়ে দিয়ে মনের বোঝা হাল্কা করেন ; আর মহিলারা সেই ক্ষেত্রটিতে সদাজাগ্রত সংগ্রামী, অস্তোদয় এবং উদয়াস্ত সচেতন প্রহরী ; তিনিই সেখানে 'লেজিসলেটিভ, এক্সইকিউটিভ এবং জুডিসিয়ারি' — একাধারেই। হোল টাইম জব নয়, একেবারে হোল-ডে-হোল-লাইফ এসাইনমেন্ট। কোমরে আঁচল জড়িয়ে, কপালের ঘাম মুছে আর টিফিনের কৌটো গুছিয়ে দিয়েই তিনি সম্মানিত অধিষ্ঠাত্রী। নারীরা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী হয়ে দশভুজা হবেন না কালী করালী রূপে খড়্গহস্তা সংহারের দেবী হবেন তা অবশ্যই নির্ভর করবে পুরুষদের উপর, পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থার পটপ্রেক্ষিতে। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় ?' নারীরাও তাই স্বাধীনতা চায় ; সেই স্বাধীনতার প্রধান হন্তারক পুরুষদের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা নারীরাই ! একদিকে শাশুড়িরা তাদের বধূরূপ মৃতদেহটি আজীবন বহন করে চলেন। অন্যদিকে পুত্রবধূরা বয়ে বেড়ান তাদের কন্যাজন্মের অসাড়-মৃতপ্রায়-দেহটিকে কখনও পতিগৃহের অন্দরে, কখনও পিতৃগৃহের চত্বরে। সব শিশুর মধ্যে যেমন পিতা লুকিয়ে থাকে (মা নয় কেন ?) ঠিক তেমনি সব বধূর মধ্যে একদিকে ভবিষ্যৎ শাশুড়ি অন্যদিকে অতীত ননদিনী ওত পেতে অপেক্ষা করে। বিবাহের দ্বিজত্বে 'গত জনমের' আরব্ধ প্রভাব ফেলে, নতুন জীবন আগামীর ছায়ায় তছনছ হতে থাকে ! এ-থেকে মুক্তি অনিমার 'একত্র বসবাসে' — লিভ্ টুগেদারে নেই, নেই তনিমার সনাতন জীবন প্রবাহে। মনের বাঘের হাত থেকে মুক্তি পেলে তবেই সংসারের বাঘ থাবা বসাতে পারবে না।'

'এই মুক্তির উপায় ? কেমন করে এই মুক্তি সম্ভব ?' জানতে চাইলাম বিনতার কাছে।

'আমি সে খবর দিতে পারি না, জানা নেই। এর জন্যে উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন। অপেক্ষাই করতে পারি সেই সর্বকর্মা বা সর্বকর্মিনীর জন্যে যিনি বলতে পারবেন মুক্তি কোথা আছে, জানাবেন সেই মুক্তির পথ। ততদিন আমরা সংসারের যন্ত্রণা-জঙ্গলে মুক্তির জন্যে হাঁকপাঁক করে রক্তক্ষরণকেই বাড়িয়ে তুলব, তুলতে থাকব। ঝগড়া-বিবাদ, মান-অভিমান থেকে শুরু করে দেহদগ্ধ-বিষভক্ষণ-বিবাহবিচ্ছেদ মামলা পর্যন্ত সর্বপ্রকারের রক্তক্ষরণ চলতেই থাকবে। আর অধিকাংশ নারীরাই, এবং সুতরাং, সংসারগুলোই চিরাচরিত 'মেনে নিতেই হবে' মানসিকতায় স্বাভাবিকতাকে সংগ্রহ করতে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকবে।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'একটা নেতিবাচক, নঞর্থক অবস্থায় এনে দাঁড় করালে ?' বিনতা বলল, 'রাত নাহলে কি দিনের উদ্ভাস সম্ভব ?'

আমাকে বলতে দাও

সব একাকিত্বই মর্মান্তিক। সব হারিয়ে কেউ হঠাৎই যখন একা হয়ে পড়ে তখন তার সেই একাকিত্বও মর্মান্তিক। আবার সকলের মধ্যে থেকেও ব্যক্তি একেবারেই মনে মনে একা, নিঃসঙ্গ হয়ে যায় — বস্তু মেলে, জন-নৈকট্য মেলে, কিন্তু মন মেলে না। এ-সব আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, অনেক জেনেছি। আমার সংগ্রহের ঝুড়ি প্রায় পূর্ণ। তাই যখন কেউ আমার কাছে তার নিঃসঙ্গতার লাটাই থেকে সুতো ছাড়তে চায় তখনই আমি মনে মনে অনেক সামনে এবং অনেক পেছনে দেখতে পাই। বাধা না দিয়েই তার কথা শুনি। শুনি আর অন্য অনেক জীবনের পাশে সদ্য-সংগ্রহ এই জীবনের কথাগুলো সাজিয়ে রাখি।

আমাকেই কেন বলার জন্য বেছে নেয়? আমি কি কোনও খোলা বই-এর মতো স্বতঃপাঠ্য? আমার মধ্যে যে একেবারে নির্জন-একাকিত্ব, যে ধূ-ধূ নিঃসঙ্গতা তা কি ধূপের মতো আমার অবস্থাটিকে চারদিক ছড়িয়ে দিচ্ছে? বাতাসের মতো, গন্ধের মতো, সত্যের মতো? কে জানে কি হয়, কি হচ্ছে! তবে এটা বেশ বুঝি যে অনেকেই তাদের আনন্দের হাটের কেনা-বেচায় আমার কথা স্মরণ করে না কিন্তু বহু ক্লান্ত জন আছে যারা আমাকে তাদের বেদনার একাকিত্বে শরিক করে নিতে দ্বিধা করে না। আমার কোনও অভিযোগ নেই এদের বিরুদ্ধে — কারো বিরুদ্ধেই। আনন্দই একমাত্র অভিজ্ঞতা, বেদনা কোনও মূল্য ধরে না — আমি এ-মতে বিশ্বাসী নই। আমার কাছে দু'ইই সমমূল্যের।

নিজে আমি অত্যন্ত সেয়ানা-একা। সচেতন বিশ্লেষণে একাকিত্বের ঈশ্বরকে নিজের করে নিয়েছি। বঞ্চিত বোধ আমার জীবন ইতিহাসে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, শোষিত বোধ আমার বাল্য-কৈশোরে চেতনার বুনোটকে আকার দিয়েছে এবং অবহেলা ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। আমার এই মধ্য জীবনে এসে যখন পিছন ফিরে তাকাই তখন বেশ পরিষ্কার দেখতে পাই সেই সব ইঁট-পাথর-সিমেন্টের গঠন যা আমার অতীতকে ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবেই গড়ে তুলেছে। আমার এক দোষ — আমি ভুলি না, কিছুই প্রায় ভুলতে পারি না। এটাকে দোষ না বলে যন্ত্রণা বললে বোধহয় ঠিক বলা হয়। বেঁচে থাকার জন্যে ভুলতে পারাটা যে একটা আবশ্যিক প্রক্রিয়া তা জেনেছি অনেক পরে। আমি যে অন্য অনেকের থেকে আলাদা, অন্য অনেকের মতো অতীত-বিস্মৃত নই, এই বাস্তব সত্যটি আমার ব্যক্তিত্বের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন বলে সদাই প্রশস্তি পেয়ে এসেছে। অবশ্য আমার নিজের কাছেই।

স্মৃতি সততই সুখের। সাহিত্যের আর সাফল্যের কলস্রোতে জীবনের গতিপথে আকীর্ণ নুড়ি-পাথরগুলো সততই সুখ-সঙ্গীতের মূর্ছনা সৃষ্টিতে সহায়ক। তাই সুখের। বাস্তবের সংগ্রামমুখর পথে আর অসাফল্যের বলিবেদিমূলে যে জীবন পথ সেখানে? স্মৃতি সততই দুঃখের। নুড়ি-পাথর যেখানে সংগীতের মূর্চ্ছনা তোলে না মাথা-কপাল ফাটিয়ে রক্তস্রোত বইয়ে দেয় মাত্র সেখানে দুঃখটাই অনুসঙ্গ, সুখটুকু কর্পূর হয়ে হারিয়ে যায়! আমার জীবনে এই পাথরের সঞ্চয় ঘটেছে অফুরন্ত, অনাবশ্যক কিন্তু অনিবার্য।

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে'? ট্র্যাজেডি এখানেই যে সারাটা জীবনই কমলের অন্বেষণে কাটিয়ে দিলাম কিন্তু দেখা পেলাম না। আর এই অন্বেষণের পথে পথে, পর্বে পর্বে কাঁটার

আঘাত যত রক্তপাতের, যত বেদনার জন্ম দিল তা একটি ক্রম উন্মোচিত কিশোরী-তরুণী-যুবতী জীবনের পক্ষে ভয়াবহভাবেই অসুন্দর। ফুলের দেখামাত্র নেই, কাঁটার ক্ষত আছে, সুন্দরের আবির্ভাব নেই বেদনার ক্ষরণ আছে, মৌমাছির গুঞ্জন নেই বৃন্তের অন্তরে স্ফুটনের যন্ত্রণা আছে — বলুন এটা একটা প্রাকৃতিক অবিমৃষ্যকারিতা নয়? একটা অঘটন? একটা বিরাট নির্ভেজাল বঞ্চনা?

এই বঞ্চনার শুরুটা আমার কাছে সূর্যের মতো সত্য। শেষটা কিন্তু একেবারেই দেখতে পাই না, পাচ্ছি না। এখন আমি মাথায়—মনে আমি — in head and heart অতীতের আঘাতে, পীড়নে, পেষণে আমার মাথাটা নিরেট না হয়ে অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠেছে; সজাগ, তীব্র আর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু। মনটা মাঝখান থেকে মার খেয়ে গেল। প্রকৃতিই তো মনকে নরম করে গড়ে তুলেছে। বেশি মার তার সয় না। তাই মার খেতে খেতে আমার মনটা অত্যন্ত অসাড় হয়ে নিরুদ্বেগ, নিশ্চেষ্ট হয়ে ঐ একরকম বেঁচে আছে। বেঁচে যে আছে তা বুঝতে পারি যখন চোখের জলে সে তাব জীবনের মূল্য মিটিয়ে দিতে থাকে; জীবনে বেঁচে থাকার মূল্য। আর ভেবে পাই না এই আমার মৃতপ্রায় মরা মনটা এতো চোখের জলের যোগান পায় কোথা থেকে? তখনই রাগে আমার নাক ফুলে ওঠে, অভিমানে চোখ গোল গোল হয়ে যায় আর আত্মধিক্কারে কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসে একমাত্র শব্দ "alone, alone"। একটা মাত্র প্রার্থনার মধ্যেই আমার সর্ব অস্তিত্ব সোচ্চার হয়ে প্রকাশ পায় "আমাকে একা থাকতে দাও, একা থাকতে দাও!"

এই একাকিত্বকে আমি পেয়েছি আমার বাল্যেই। আমার কৈশোরে আমি একে লালন করেছি যত্নে, তারুণ্যে একেই আঁকড়ে ধরেছি দু'হাত দিয়ে, ব্যবহার করেছি ঢালের মতো আমার চারদিকের জংলা পরিবেশের বিরুদ্ধে। আর যৌবনে নিজেকে দিক্-বিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে পাখা মেলার বাসনায় দু'চার বার ঝট্-পট্ করেই বুঝে নিয়েছি অযত্নে-অনভ্যাসে অপরিশীলিত আমার ডানাগুলো ওড়ার পক্ষে বেশ আর সতেজ ছিল না। আর সেই যে গুটিয়ে ফেললাম নিজের ডানা তার পর থেকে আমার একাকিত্ব আমার অর্জিত সাধনা হয়ে নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়াল। এখন তো বলতে গেলে একাকিত্ব আমার অঙ্গাভরণ, আমার অঙ্গের ভূষণ; আমার অস্ত্র, আমার শস্ত্র; আমার ঢাল আমার তীর আর আমার ক্ষেপণাস্ত্র।

সেই পাথরের angel, পরী-র কথা মনে পড়ে। বেচারি! প্রকাশ্য স্থানে নীরস পাথরের তৈরি বেদিতে পাথরের মূর্তি! কিন্তু হলে কি হবে, তারও চোখে, তার নীলকান্তমণি চোখেও জল গড়ায়! এই জলের যোগান-সূত্রটি থাকে কোথায়?

আমি নিজেকে পাথর করে ফেলেছি, চারধারে পাথরের মতো আমার একাকিত্বের দেওয়াল, আমি ভালবাসি পাথুরে পরিবেশ, নীরস, কর্কশ পাহাড়ে আমার অবকাশ কাটাই, নির্জন নদীস্রোত আর জনহীন প্রান্তরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো গাছে ঢাকা পাহাড় আমাকে সর্বদাই হাতছানি দেয়। এ-সবই তো আমার অর্জিত ব্যবহার, সংগ্রহের ধন আর বেঁচে থাকার জন্যে আমার একান্ত রসদ। অবাক হবার কোনও কারণই নেই। উট যখন নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে তখন সে সেই কাঁটাগাছের চর্বনেই নিজের জীবন-খাদ্যটি খুঁজে পায়। আমি যদি পাথর চিবিয়ে রস এবং রসদ পাই তাহলে ভ্রূ কোঁচকানোর কারণ তো দেখি না!

তবে এই পাথর-প্রেম আমার বাল্যে হয়নি; এ আমার যৌবনের অর্জন। জীবন যখন খরসূর্যের তাপে দগ্ধ তখনই 'আমি পাথর' এবং 'আমারও পাথর' বলে মেনে নিয়েছি। উটের ক্ষেত্রেও তাই। মরুভূমির খরতাপে অশান্ত ক্ষুধার তাড়না তাকে কাঁটাঝোপের মধ্যেও রসের সন্ধানী করে তোলে! তাহলে?

এই উটের সঙ্গে আমার মিল অতটুকুই। বাকি সবই অমিল। ছোটবেলা থেকেই আমার কাঁটায় অভ্যাস হয়ে গেছে। অন্যের ভাগে সবুজ নিষ্কণ্টক পেলব ব্যবস্থা আর আমার বেলায় অনটন। এটাই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ভাগ্যলিখন। সকলেই আদরের, কেউ কেউ একটু বেশি। সেই বেশির দাবি মিটিয়ে দিয়ে অবশিষ্টের ভাগটুকু ছিল আমার কপালের পাওনা। একজন আদরের কারণ সে বড়, অন্যজন আদরের কারণ সে ছোট। তাদের ভাগে বেশিটা, আর যে জন আছে মাঝখানে? কে ডেকে নেয় তারে? সুতরাং ধূসরে আমার অভ্যাস হতে দেরি হল না, আর অন্যদের সবুজে। ফুলের ভাগ যাদের তাদেরই রইল, আমার জন্যে ধার্য হল কাঁটার খোঁচা! আমার মুখ কেটে যায় রক্ত ঝরে, প্রাণ ফেটে যায় অশ্রু নামে। ওদের হৃদয় যখন ময়ূরের মতো নাচে আমার অন্তর তখন খাঁচার চারদেয়ালে পাখা ঝাপটায়। উট হয়ে বেড়ে ওঠাটাই তাই আমার জীবনলিপি।

তখন থেকেই তো আমার নাক-ফোলার শুরু। না-পাওয়ার বেদনায় আমার সেই ছোটবেলার কচি মনটা তখন থেকেই সবুজের অন্বেষণে বাইরের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি। স্বাভাবিক নয়? তাই তো পাড়াপ্রতিবেশীরা স্নেহের জলসেচনের সুযোগ পায়। কখনও বাদাম, কখনও বাতাসার পয়সা। অন্যায়-বোধ আমাকে পীড়ন অবশ্যই করে, না হলে অন্যের বাগানে কেন গাছের আড়ালে আর ফাটলের আঁধারে আমি সেই সব অপথ্য-কুপথ্য করতে শুরু করি? আমি যে কমের দলে। যারা বেশির দলে, আমার সেই ভাই আর বোন তো অনায়াস স্নেহ-নৈকট্যেই তাদের বেশিটা উপভোগ করে, করতে পারে! আমি পারি না। ঘর আমার ভালো লাগে না; বাইরেটা আমাকে টানে। বিসদৃশ ঘটনা আমাকে আকর্ষণ করে। তাই আমি ছুটে যাই অনেক দূরে বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণীর বিয়ে দেখতে, খেলার মাঠ থেকে সরে যাই আদাড়-বাগান টহল দিতে। সেই সব কাজ আমি অবলীলায় করি যা আমার অকরণীয়, আর সেই সব কাজে আমার একেবারেই আগ্রহ থাকে না যা আমার করণীয়। বড়দের সকল নির্দেশ উপদেশ ঘরের মধ্যে থাকা আমি অবশ্যই মেনে চলতে চেষ্টা করি কিন্তু ঘরের বাইরে আমার স্বাধীনতার ডানা যে কোথা থেকে জোর পায় তা তখন বুঝিনি। বাধ্য হবার মধ্যে যে একটা দীনতার আভাস থেকে যায়, অবাধ্যতার মধ্যে একটা শক্তির প্রকাশ ঘটে সে যেন সেই কচি বয়সেই আমাকে নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল। আমার শ্রেণীর বই আমি পড়ি না, অপাঠ্য আমার মুখস্থ! বড়র সঙ্গে সমান তালে চলতে পারাটা যেন বড়র সমান বলে নিজেকে প্রমাণ করার সমান। তাই ছোট হয়েও আমার ছোটাবস্থা অপছন্দ ছিল। আমি ছোট থাকতে চাইলাম না কখনই; আর বড়রা আমার ছোটত্বকে বাস্তব করে স্বীকার করাতে যেন বদ্ধপরিকর ছিলেন। বিদ্রোহ। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহ ছিল আমার অন্তরের চারদিকে।

বড়রা সমদৃষ্টি নয়, পক্ষপাতদুষ্ট। বড়রা শাসনে যতটা জীবন্ত স্নেহদানে ততটাই যেন ম্রিয়মাণ। বড়রা যুক্তিহীন, শক্তির দম্ভে ছোটদের দমিয়ে রাখে। এমতো কতো শত সত্য সেই বাল্যকালেই আমার প্রকৃষ্টভাবে জানা হয়ে গেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র না-পড়েই, এমন কি তার নাম না জেনেও জানা হয়ে গেছিল যে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র! ভাই সুন্দর, আমি অসুন্দর, কালুটি ভূত! তাইতো ভাইয়ের জয় সর্বত্র; আর আমার?

বিদ্রোহ রূপ নিল প্রতিশোধের। ভাই-এর বর্ষফলের রেকর্ড সবই A দেখায়; তাই আমার Progress Report-এ C আর D-এর ছড়াছড়ি। ভাইয়ের অঙ্ক আমি করে দিতে পারলে প্রশংসা পাই না কিন্তু আমার অঙ্ক ভুল হলে নির্দয় ব্যবহার অনিবার্য হয়। ভাইয়ের ইংরেজির প্রায় সব পাঠই আমার কণ্ঠস্থ; কিন্তু নিজের বই-এর পাতাগুলো আমার কাছে অস্পৃশ্য-অশুচী বলে মনে হয়। বড়দের পক্ষপাতমূলক ব্যবহার আমার মুখের হাসি, চোখের সজীবতা আর প্রাণের চাঞ্চল্য

একেবারেই কেড়ে নিল। আর ধিক্কারের মাত্রা যতই বাড়তে লাগল আমার মধ্যে একটা বিরুদ্ধতার, একটা জেদের পারা যেন পাল্লা দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে লাগল। কতবার মনে মনে উচ্চারণ করেছি ঃ you can take the horse to the pond but you can't make it drink. বাবার কাছে শোনা এই কথাটা যে তার বিরুদ্ধেই মনে মনে কাজে লাগাবো তা বোধহয় আমরা কেউই আগে ভাবিনি।

তখন কতোবার ভেবেছি যে বড়রা এতো নির্বোধ হন কি করে? ওঁরা বোঝেন না কেন যে শিশুদের জগৎ শিশুদের মতই। একটু স্নেহ-মায়া-মমতা সমান ভাগ করে দিলে ওঁদের কী এমন ক্ষতি? সমান সমান দেওয়া যায় না? কেন দেন না? তাহলে, নির্বোধ ছাড়া কি?

আর এক বৈষম্য ছেলেতে মেয়েতে। সেই ছোটবেলা থেকেই অনুভব করেছি, এখন তো পরিষ্কার দেখতে পাই বুঝতে পারি। সেই কচি বয়সে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কিসের তফাত, কিসের প্রভেদ তা নিজেরা তো কখনই বুঝতে পারি না, পারিনি। কিন্তু বড়রা? ওঁদের যাবতীয় সংস্কার, বিশ্বাস আর ভবিষ্যৎ চেতনা দিয়ে আমাদের, ছোটদের, মনের মধ্যে বিষবৃক্ষের বীজটি অজ্ঞাতেই উপ্ত করে দিয়ে থাকেন। না-না-না-এর গণ্ডি কেটে কেটে মেয়েদের সুস্থ চেতনার উন্মেষ, স্বাধীন বেড়ে ওঠার প্রবণতা আর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনটিকে প্রতিনিয়তই খর্ব-খণ্ডিত-রুদ্ধ করে দিতে থাকেন। মেয়েদের এটা করতে নেই, ওটা চাইতে নেই, ওখানে যেতে নেই; চলনে-বলনে-মননে এই যে নিত্যদিনের বেড়ি পরানো এটা ক্ষমাহীন নয়? আমি তো বরাবরই সেই দলে যারা ছোট বেলায় চোখের ভাষায় প্রশ্ন করতে অভ্যস্ত, একটু বেলা বাড়লে মনে মনে প্রশ্নের ঝুড়ি চলনের ভঙ্গিমায় আর গ্রীবার বক্রতায় প্রকাশ করে ফেলে। তাই তৃণভোজী সর্বংসহা প্রশ্নহীন অনুসরণ তো আমার ছোটবেলা থেকেই করা হয়ে উঠলো না। আর এই সর্বনাশা মানসিক পীড়ন পর্বের প্রধান হোতা মহিলারাই, আমাদের মা, দিদিমা, মাসি-পিসিরা। তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারানোর বেদনা কোনওদিনই অনুভব করেননি; তাই সেই ব্যক্তিত্বে আঘাত দিতে তাদের কোনও বেদনাবোধ জাগেই না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর ধরে এই ব্যক্তিত্ব নিধন যজ্ঞ সমানেই ঘটে চলেছে। পুরুষপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষেরা এই নারী মানসিকতার স্বত্ব এবং উপস্বত্ব একই সঙ্গে উপভোগ করতে সুযোগ পেয়ে পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাবা-কাকা-দাদুরা যদিও বা একটু আধটু সাম্যের কথা বলে থাকেন, অপক্ষপাতের উল্লেখ করে ফেলেন এবং আবেগের মুখে বলেও ফেলেন যে ছেলেও যা মেয়েও তা, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুললে দুইই সমান — তারাও এসব কথা মন থেকে যতটা নয় নাতনীকে ভোলানোর জন্যে তার চাইতে অনেক বেশি করে বলে থাকেন। একটা লাল রঙের পুতুল বা খেলনার চাইতে বেশি কোনও মূল্য নেই তাদের এই ছেলে-ভোলানো [বলা উচিত মেয়ে-ভোলানো] প্রতিন্যাসে, মনোভাবে, ব্যবহারে। নারীরা কাউকে ধোঁকা দিলে নিজেদেরই তা দিয়ে থাকে। আর পুরুষেরা নিজেদের, নারীদের এবং সন্তানদের সমানভাবেই ধোঁকা দিয়ে থাকেন। এতে তাঁদের অহংকার লালিত হয়, impartiality-র ego-তে বেশ সুড়সুড়ি লাগে এবং বেশ একটা rational rational মলাট টান্ টান্ করে নিজের পিঠে নিজেদের হাতের patting শুনতে পান!

মেয়েরা, সব মেয়েরাই, এই অসীম ধোঁকাবাজির মহাসাগরে হাবুডুবু খায় আর নারীত্বের নোনাজলে নিজেদের ব্যক্তিত্বের পাকস্থলীটিকে একেবারেই অযোগ্য করে তোলে। এদের কাছে সুপেয় স্বাধীন লবনহীন জল অপেয় বলেই বোধ হয়, অথবা অনভ্যাসে নিজেদেরই অযোগ্য বলে মনে করতে থাকে। যে দু'একজন সুপেয় জলের স্বাধীন যোগানের দিকে হাত বাড়ায় তারা তৎক্ষণাৎ 'ধৃষ্ট' বলে চিহ্নিত হয়ে যায়।

মেয়েরা তাই বেড়ে উঠতে থাকে, বড় হয়ে ওঠে না। এদের growth হয়, progress হয় না। একদিকে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে এরা প্রকৃতি হয়ে সম্ভবা হয় অন্যদিকে পারিবারিক আর সামাজিক নিয়ম-নিগড়ে এরা এক একটা sub-servient মস্তিষ্কহীন robot হয়ে সমাজেরই প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। পরাধীনতার নাগপাশ এদের জন্মলিপি হয়। সকালে পিতামাতার, দুপুরে স্বামীর এবং সন্ধ্যায় এরা পুত্রের অধীন। নিজে নিজে এরা কখনই একটা একক হয়ে দেখা দেয় না। এরা তাই অপরের দ্বারা, অপরের জন্যে এবং অপরের প্রয়োজন মেটাতেই জীবনধারণ করে চলে। পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও এরা কেন্দ্রাধিকারী নয়; সমাজের মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করেও এরা কোনও মাধ্যম নয় এবং সন্তান ধারণ করেও এরা সন্তানদের নিয়ামক নয়। যুগ যুগ ধরে এই যে অসাম্য, শোষণ আর পক্ষপাত সমানে চলে আসছে তার অভিশাপ মেয়েদের জীবন যাত্রাপথটিকে বিবর্ণ, ধিক্কৃত এবং পঙ্গু করে রেখেছে। পুত্র সন্তানের যেখানে সাতখুন মাপ, কন্যাসন্তানের সেখানে বিন্দুমাত্র পদস্খলন ক্ষমাহীন। যে চেতনা, অনুভব আর চিন্তাক্ষমতা জৈব নিয়মেই ক্রম প্রকাশ, অভিব্যক্তির ধাপে ধাপে স্বাভাবিক এবং চিরায়ত, সেই চেতনাকে পঙ্গু-পিষ্ট করে, সেই অনুভব সকলকে বিপথচালিত করে আর সেই চিন্তাক্ষমতাকে একদেশদর্শী করে গড়ে তুলতে কে দায়ী?

দায়ী কেউ একা নয়। তবুও মা-বাবার দায় অসীম। কারণের সুপরিসর বহুত্বের আড়ালে কিন্তু অনিবার্য কুফলটুকু লুকোনো যায় না। জড়ত্ব। চিন্তায়, মননে, অনুভবে আর প্রকাশে এক সুবিস্তীর্ণ জড়ত্ব পাথর চাপ সৃষ্টি করে তোলে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে, প্রকৌশলে প্রয়োগে, ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আর চরিত্রের শক্তিতে মেয়েরা বহুদূর এগোলেও তাদের সেই অর্জিত গুণসমূহের স্বীকৃতি মেলে না। যদিওবা মেলে এবং যতটুকু মেলে তা পুরুষের বিজ্ঞাপনমুখর সমাজে ব্যতিক্রম বলেই চিহ্নিত হয়ে ওঠে; স্বাভাবিক প্রকাশ বলে স্বীকৃত হয় না কখনই।

আজকের সমাজ ব্যবস্থায় দরিদ্ররা পেষিত, শোষিত এবং অবহেলিত। মেয়েরা কিন্তু ততোধিক নিষ্পেষিত, শোষিত এবং দলিত। দরিদ্রদের জন্যে কুম্ভিরাশ্রুর অভাব নেই, সামাজিক সমিতি আছে, রাজনৈতিক দলবাজি আছে, সরকারের বাক্-সর্বস্ব ঘোষণাসমূহ আছে। কিন্তু মেয়েদের জন্যে কি আছে? উচ্চকোটির কিছু কিছু মহিলারা মিলে এক বা একাধিক বিলাস-ব্যবস্থার সংস্থা-বিলাস আছে ঠিকই। কিন্তু সে তো তাদের অফুরন্ত অবসর বিনোদনের cathartic প্রয়োজনেই আছে। একই সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা, কৃষ্টিসংস্থা এবং অবচেতনের রস-ক্ষরণ ঘটানোর মাধ্যমে ego-satisfaction-এর ক্ষেত্র। তারা সকলেই status conscious, resource conscious. End product-নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময়ও নেই, মানসিকতাও নেই। স্বতঃ এবং পরতঃ পিঠ-চাপড়ানির মাধ্যম এই সব জলসা ঘরগুলো না সাধারণ মেয়েদের জন্যে না সাধারণ মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত। এদের কথা যতটাই কম বলা যায় ততটাই পরিষ্কার করে বোঝানো যায়!

মেয়েরা তাই এক সার্বিক exploitation-এর বিষয় হয়েই বেড়ে ওঠে। আগেই দেখেছি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা, এমন কি নিজের মা-মাসিরাও মেয়েদের মানসিক গঠনটিকে অত্যন্ত ছোটবেলা থেকেই দুমড়ে-মুচড়ে খাদ্য হিসেবে পুরুষ সমাজের শোষণের বিষয় হিসেবে তৈরি করে তোলে। বিংশ শতকের এই শেষ দিকেও পরিসংখ্যান (American Bureau of Psychological Research) বলছে যে মেয়েদের দেখলেই 48% পুরুষ বিছানায় কেমন হয় এই বোধ-কল্পনার দ্বারা পরিমাপ করে। Sex অবশ্যই প্রবৃত্তিজ। সে তো নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবেই সত্য। তাহলে কেন মাত্র 26% মেয়েদের মধ্যে এই বিছানা মানসিকতা আর পুরুষের ক্ষেত্রে 48% ? ব্যাখ্যা?

মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণিজগতে তো সুন্দরের, প্রলোভনের এবং 'বিছানা'-বোধের উন্মেষ-তীব্রতা-প্রকাশ সর্বৈব অন্যরকম। মানুষের ক্ষেত্রে তফাত তার সমাজ, তার সমাজ-বোধ তার সংস্কার তার বুদ্ধি-মনন-নিয়মশাসিত রীতি-পদ্ধতি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছেড়ে আসার পর থেকেই পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষশাসিত সমাজের প্রভাব সুদূরপ্রসারী বর্তমানকেও ঘিরে রেখেছে। সমাজের কোনও স্তরেই, কোনও পর্যায়েই, ক্ষমতা-শক্তি-অধিকাব সহজে হাতছাড়া করতে কেউ চায় না। পুরুষ তাই তার অধিকার ছাড়ছে না, ছাড়বে না।

বার বার কাউকে 'পাগল' 'পাগল' বলে বা 'বোকা' 'বোকা' বলে ঘোষণা করতে থাকলে ক্রমশ সেই ব্যক্তি তার নিজের উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলে, অপর পরিচিত-অপরিচিত জনেও তার বিষয়ে দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ দিতে সময় পায় না। মেয়েরা শক্তিহীন, অসহায়, গৃহবলিভুক, পরনির্ভর এবং প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় মেয়েদের দুর্বল করেই গড়ে তোলা হয়েছে — এমতো কতো শত মৌনমুখর ঘোষণা ঠিক সেই একই কাজ করেছে এবং করে চলেছে। সর্বরকমের পরিপাটি ব্যবস্থায় সমাজ মেয়েদের বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ছোট করে রাখার ব্যবস্থাটাও পাকা করে রেখেছে। মেয়ে হিসেবে সে যেমন অপরের গচ্ছিত ধন, বউ হয়ে শ্বশুর বাড়ি গেলেও সে বহিরাগত সংযোজন মাত্র। শাশুড়িদের অধিকারস্থল তাদের পুত্র। পুত্রই আপন। সেই পুত্রের পরহস্তগত অবস্থার শংকায় শাশুড়িরা কাঁটা হয়ে থাকেন এবং আড় হয়ে বাধা সৃষ্টি করেন। পুরুষ তখন মহত্বের পূজারী হয়ে এই অসম-যুদ্ধে নিরপেক্ষ দৈব চেহারা নিতে সচেষ্ট হয়। এখানেও সেই কাকের মাংস কাকেরই ভোজ্য হয়ে দেখা দেয়। গর্ভধারিনী জননীরা পরগৃহের গচ্ছিত ধন বলেই মেয়েদের লালন পালন করেন। আবার আইনসম্মত জননী পুত্র বিচ্ছেদ কাতরতায় সেই মেয়েকেই গ্রহণে ক্ষুণ্ণহৃদয় ছিন্নসূত্র ভয়ে পথ আগলান! যে ঘরে জন্ম সে ঘরও নয় আপন ; যে ঘরে জীবনযাপন সে ঘরও হয় না স্বাভাবিক। এরা কি তবে ধোবির প্রাণী!

Love marriage? দেখে দেখে আব শুনে শুনে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল! ছক্-বাজির চূড়ান্ত! যে কোনও বিয়েতেই মেয়েরা ব্যবহৃত মাত্র। Puppet অন্যের আঙুলে সুতোর প্রান্ত। কে সেই সুতো টানছে সেটা বড় কথা নয়, কোনও মেয়ের জীবনেই। সুতোটা যে টানা হচ্ছে এটাই তার জীবনের সর্বনাশা সত্যি। কখনও শ্বশুর কখনও শাশুড়ি, কখনও ও বাড়ির জামাই, কখনও ভাগ্নে-ভাইপো, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি বকলমে পাত্র নিজেই সেই মহৎ কার্যটি নিপাট ভালোমানুষের মতো মুখ করে করে চলেছে! মেয়েদের জীবনের এই পর্ব-পরিবর্তনের সময়, গোত্রান্তরিত হবার সময়, যা যা সব ঘটে তা মেছোহাটার মেছুনিদের অথবা গরুহাটার গরু-বিক্রেতাদেরও লজ্জার কারণ হতে পারে। তবুও তা হয় না। হয় না যে তার কারণ একটা দীর্ঘ ইতিহাস, একটা চক্‌চকে মলাট, একটা অন্তর্নিহিত লেন-দেনের ছক্। জান্তব সত্যের পাশাপাশি চলতে থাকে এই সামাজিক ছকের উপস্থিতি। বলিপ্রদত্তের জীবন ঘিরে একটা জোরালো সানাই-এর সুর সব বঞ্চনা, সকল ছকবাজি আর সমস্ত অন্যায়কে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বিষপ্রবাহের অন্তঃসলিলা ক্ষরণ ক'টি দিন ধরে ঝক্‌ঝকে দন্তপঙ্‌ক্তির আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। ঢাকা পড়ে কিন্তু মিথ্যা হয়ে যায় কি?

মিথ্যা যে হয় না তা জানা যায় ছ' মাস বাদে আত্মহত্যার প্রচেষ্টায়, দু' মাস বাদে ডিভোর্স চাওয়ার তীব্রতায় অথবা কখনও কখনও Home-এর গর্ভে, কখনও কোনও মাসির ডেরায় চিরতরে হারিয়ে যাবার খবরে! অসংখ্য যারা সানাই-দিনের ছাপানো-ঠিকানায়ই থেকে যায় অথবা পঞ্জিকৃত ঠিকানায়, তারা অনেক মূল্যে, বহু চোখের জলেই সেই ঠিকানাটুকুকে বুকের মধ্যে অনন্যোপায় আগলে রাখে। অসহায়, ভীত, অনির্দেশ্য যাত্রায় অপ্রস্তুত এই সব মেয়েরা সারা জীবনই নিজেদের

মৃতদেহগুলো নিজেরাই বহন করে চলতে থাকে। সকলের চোখের সামনেই এই মৃতদেহ বহনপর্ব চলতে থাকে। কেউ কোনও কথা বলে না, বাধা দেয় না, পথ দেখায় না। নারী সম্প্রদায় একেই পরম-প্রাপ্তি বলে মনে করে; পুরুষেরা মনে করে স্বাভাবিক। আর কি? আর কিছু নয়! ঘুচে গেল দায়!

কিন্তু অত সহজে দায় শেষ হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। বড়দের দায় ছোটদের বিদায় পর্যন্ত গড়াতে পারে। যে মেয়ে অপরের হাতের সুতোকে নির্জীব করে দিতে চায়, ছিঁড়ে দিতে চায় ছকের রেখাগুলো অথবা যারা নিজেদের মৃতদেহ বয়ে বেড়াতে রাজি হয় না তাদের বিদায় বাদ্যি বাজানোর জন্যে কখনও কেরোসিন, কখনও বিষের শিশি, কখনও বা গঙ্গার জল, রেলের লাইন নির্ধারিত হয়ে চেতনার অবলুপ্তি ঘটাতে এগিয়ে আসে। বড়দের এ এক বড় দায়। পুত্রের মুক্তি, পুরুষের শান্তি আর নারীদের স্বস্তি। বাদ্যি বাজিয়ে যাকে ঘরে আনা হয় তাকেই বাদ্যির ক্ষমতার বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়। শিংনাড়া গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল অনেক ভাল। মেয়েদের চেতনার শিং, ব্যক্তিত্বের শিং সুতরাং নাড়ার জন্যে নয়। নয় মাতৃগৃহে, নয় শাশুড়ির আস্তানায়। নারীরা হেরে গিয়ে হারায়; মেয়েরা হারিয়ে গিয়ে হারায়। জীবনে জীবন যোগ করে যে বাঁচা সে বাঁচা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে?

স্বীকৃত ব্যক্তি পরমায়ুর ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে পেছনটাকে যতটা দেখতে পাচ্ছি সামনেটাকেও ততটা কাছের বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া বয়সটাতো কেবলমাত্র ক্যালেণ্ডারের পাতা দিয়ে মাপার বিষয় নয়, অভিজ্ঞতার নিরিখে উপলব্ধির ব্যাপার। ছেলেবেলার বালখিল্য পাতাগুলো যদি অভিজ্ঞতার volume থেকে বাদ যায় তা হলে বার্ধক্যের sanile দিনগুলোই বা কেন সংযোযিত হবে? তাই আমার মধ্য-জীবন জীবনের মধ্য-গগনই বলা যায়। এখানে আমার দৃষ্টি সামনে-পেছনে উর্দ্ধে-অধেঃ সমানভাবেই পরিষ্কার।

অনেককে দেখে দেখে এটা পরিষ্কার বুঝেছি যে তারা বিয়ে করে বিয়ে করা পায় বলে। সেই 48-26% তাদের জীবনে অবশ্যই সত্য; এবং হয়তো আরও কিছু আছে যাকে তারা সত্য বলে মনে করে। এক একজনের সত্য সেই এক একজনেরই নিজস্ব সত্য। আমার অপরাধ এই যে আমার কখনও তেমন করে বিয়ে করাটাই পেল না। তাই মা-বাবার ইচ্ছায় বাধা দিতেই হল। বন্ধু-বান্ধবের কাছে কোনও স্বীকারযোগ্য কারণেরই দেখা পেলাম না যে অপরের ঘরে জীবন যাপন করতে গিয়ে কারো হাতে সুতোটা তুলে দেবো। পুতুলের জীবনটাই আমার মানুষী অস্তিত্বে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল না। গুরুজনেরা security-র কথা বললেন, একাকিত্বের যুক্তি দিলেন আর অসহায়, ভবিষ্যতের ভয় দেখালেন, আমি কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটার মধ্যেই secured হওয়া ব্যাপারটা খুঁজে পেলাম না, একাকিত্ব থেকে মুক্তির কোনও পথ দেখতে পেলাম না আর অসহায়তা যে একটা বিশেষ প্রাপ্তি তা বোধ হল না। কারণ প্রত্যেক মানুষই তো জন্ম অসহায় এবং মৃত্যুর অসহায়তাতেই তার সকল অসহায়তার চিরসমাপ্তি। অসহায়তা তো আমাদের প্রত্যেকের জীবনাঙ্গের ভূষণ। তাহলে?

বন্ধু-বান্ধব? বিয়ে ব্যাপারটা যখন তাদের প্রত্যেকের কাছেই ভবিষ্যৎ অথবা প্রায়-বর্তমান তখন তাদের কল্পনার সৌধ রচনা জেনেছি, দেখেছি। তাদের সেই অনতিদূর কল্পরাজ্যের বহুবর্ণরঞ্জিত সফেন দিগন্ত রচনায় যেমন থাকত উচ্চকিত কলকল্লোল তেমনি থাকত রামধনুর বিন্যাস। সে সব দিনের সেই সব বন্ধুদের চোখের তির্যক ভঙ্গিমা, মনের চঞ্চল অবগাহন আর শরীরের থরথর শিহরণ যদি কিছুমাত্র পরে দেখতে পেতাম তাহলে কতই না আনন্দ পেতে পারতাম ওদের ভবিষ্যতের জন্যে। নিজেরা ওরা ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হয়েছে অনাগত ভবিষ্যতের আদুরে

হাতছানিতে। নিজে আমি বেশ উত্তেজিত হতে পারিনি। ওরা যেখানে পুষ্পের সম্ভাবনায় অনুক্ষণই উদ্বেল, আমি তখন বৃক্ষদেহের কণ্টকাকীর্ণ দংশন জ্বালা দেখতে পেতাম। ওদেরই 'প্রায়-বর্তমান' সেইসব দিনগুলো যখন অতীত আর ভবিষ্যৎ যখন পদতলে কার্পেটের মতো মলিন তখনও ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, হয়। ওদের সেই ভবিষ্যতান্তহত বর্তমান ওদের কাছেও যেমন গদ্যময় আমার কাছেও তেমনি নতুন কোনো আশার বাণী বয়ে আনে না।" তুই ভাল আছিস্, খুব ভাল করেছিস্, বেশ আছিস" — এই মূল্যায়ন আমাকে কোনও নতুন কথা শোনায় না। ওদের হাহুতাশ যেন আমাকে পীড়ন করে। ওরা যা হারিয়ে যা পেল আর আমি না হারিয়েও যা পেলাম না তাদের মধ্যে কোনও তফাতই দেখিনা। অবশ্য বিরাট একটা তফাত খুঁজলেই পাওয়া যায়। ওরা ওদের অতীতকে হারিয়ে ফেলেছে, হারিয়ে ফেলেছে ওদের কল্পনার রঙ-তুলিগুলো। আমি তা হারাইনি। হারাইনি তার কারণ সে রঙ্, সেই তুলি আমি কোনদিনই হাতে তুলিনি। আর ওদের মধ্যে যারা স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে, খুইয়ে দিয়েছে স্বাধীন চেতনার নিজস্বতাটুকু তারা তো শূন্য আঁচলে গিঁঠ বেঁধে বসে আছে, পাগলের মতো হাহাকার ছাড়া সেই গিঁঠ খুললে আর কিছুই প্রকাশ পাবে না। তাই সুমিতা, চন্দা, শিবানীরা যখন আমাকে একা পেলে মনের দরজা খুলে বসতে ঘড়ির কাঁটা ভুলে যায়, আর যারা চিঠিপত্রে জীবনের ভুলের অনুলেখ আঁকে তাদের জন্যেও আমার দুঃখ হয়। দুঃখ হয় এই ভেবে যে বিয়ে করা পেলেই বিয়ে করে ফেলতে গিয়ে ওরা ভাবনা চিন্তাগুলোকে কেমন অবলীলায় জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলল! এদের কাছে আছে অতীতের টান। অতীতকে ফেলে এসে এদের মনে হয় জীবনের যা কিছু সবুজ তাই শেষ হয়ে গেল সেই সঙ্গেই। সুনীলের সঙ্গে বাস ক'রে অসীমের মুখ মনে করে! এই এক আজীবন বিড়ম্বনা। আবার আছে অতীতের শানানো ছুরি। Black mail-এর সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ কাঁটা। কুনালকে বঞ্চিত করে এসে যে সব চিঠিপত্র ছবি-স্মৃতি ছেড়ে রেখে এসেছে সেই সব এখন সবই দিনের অস্বস্তি আর রাতের ভয় হয়ে বিদ্ধ করছে অনুক্ষণ। কুনালকে মনে রাখার হয়তো কোনও কারণই নেই কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম। নিজেদের জালে জড়িয়ে এরা নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেই চলে। আরো কতো, আরো কত শত বিপর্যয়ই না এই সব জীবনের সঙ্গে ছায়া ছায়া ঘুরতে থাকে। বিস্বাদ, বিস্বাদ!

মা-বাবারা মেয়েদের জন্যে চান শান্তির সংসার। মেয়েদের ভবিষ্যৎ নাকি তাঁরা মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি করেই বোঝেন। মেয়েরা নাদান-অনভিজ্ঞ, জীবন-বোধহীন। তাই সেখানেও বিতণ্ডা। একজনের ভাল যে আর একজনের ভাল-বোধের চাইতে অনেক অন্যরকম হতে পারে তা এঁদের মাথায় আসে না। একটি না-জানা না-চেনা অথবা অত্যন্ত অল্প জানা ছেলের কাছে মেয়েকে তুলে দিতে এঁরা দু'পা এগিয়েই আছেন যদি সেই ছেলে তাঁদের পছন্দের বা নির্বাচনের সূত্রে এসে পড়ে। আর যদি মেয়ের নিজের শত পরিচয়ের বাঁধনে চেনা কোনও ছেলেকে প্রস্তাব করা হয় তা হলে মা-বাবারা সর্বনাশের গভীরতা পরিমাপ করতে বসে পড়েন। কেন বিয়ে, কখন, কাকে, কোথায় এবং কিভাবে — এসব প্রশ্ন তুললে হয় এঁরা বলবেন মেয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, অথবা বলবেন বেশি লেখাপড়া শিখে অমানুষ হয়েছে, অথবা এককথায় শেষ করবেন, "আধুনিকতা"!

আমাকে বলতে দেওয়া হয়েছে বলেই আমি এবারে প্রশ্ন করতে চাই। বলতে পার কেন আদৌ বিয়ে করতে হবে? এটাই স্বাভাবিক, এটা সকলেই করে, এটাই সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি — এমতো আরও অনেক কথাই তো তোমরা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলবে। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখতে রাজি হবে যে যা ব্যক্তি স্বভাবের অনুসারি তাই যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে আমার পক্ষে কোনটা স্বাভাবিক তা তুমি ঠিক না করে আমার ঠিক করে নেওয়াটাই স্বাভাবিক নয় কি? আর 'সকলেই করে' এটা একটা হাস্যকর প্রস্তাব। প্রথম কথা তো এই যে সকলে আদৌ করে না। যদিই বা করে

তাহলে অন্যসকলে আর আর যা যা করে তাও কি আমার, তোমার, এবং তার করার কথা? বোধহয় বলতে চাইছো বেশিরভাগ লোকে যা করে। বিয়ে করাটা কি রাজনীতির প্রশ্ন, দলমতের-জনমতের সমস্যা? এটা তো একেবারেই একটা ব্যক্তিগত বিষয়, সমস্যা বা প্রশ্ন। এখানে majority-র নির্ধারণ তো একেবারেই অপ্রয়োগযোগ্য বাটখারা। নয় কি? বাকি রইল তোমাদের শেষ কথাটা — সমাজের ভিত্তি। আমরা প্রত্যেকেই সামাজিক প্রাণী; সমাজ ছাড়া ব্যক্তি সম্ভব নয়। সেই সমাজকে চলনশীল, স্থিতিশীল রাখতে গেলে অবশ্যই বিয়ে ব্যাপারটা অনিবার্য বলে তোমাদের যুক্তি। প্রাণিজগতে আমাদের সমাজ-সংস্কার নেই তাই বলে কি ওদের অভিব্যক্তি বন্ধ হয়ে গেছে? মানুষেরও তো প্রথম দিকে তোমাদের এই বর্তমানের দড়িদড়ায় বাঁধা সমাজ ছিল না। তাতে কি মানুষের অগ্রগতি বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়েছে? তাহলে? বিয়ে না করলেই কি in-feeling গজায় না, group মানসিকতা? জোটবদ্ধতা? এবং সমবায়-প্রথায় সকলে আমরা সকলের তরে? এই সবই তো সমাজ-জীবনের ভিত্তি। বিয়ে ব্যাপারটাতো একটা প্রতিষ্ঠান, একটা ঘোষণা একটা convenience. যদি বলি বিয়ে ব্যাপারটা দ্বারা পুরুষ তার জমি, বাড়ি, পোষা প্রাণীর মতো একজন স্ত্রীলোককেও মালিকানায় দায়বদ্ধ বলে ঘোষণা করে মাত্র! গণ্ডি কেটে ছাপ মেরে সোনার দড়ি দিয়ে সংসারের গোয়ালে বেঁধে রাখে মাত্র! তোমরা অবশ্যই অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করবে। জানি, কিন্তু একটু ভেবে দেখবে এই অনুরোধ তো করতে পারি।

পাশ কাটিয়ে যাবার জন্যে যদি বল ঃ সন্তান-সন্ততি পাবে কোথায়? আমি বলব আর হাসিও না। Mother Teresa-কে প্রশ্ন করে দেখ বরং! লালন পালন করবে কি করে? সে বাধা তো তোমরাই তৈরি করে রেখেছো। Sanctions আর limitations তুলে নাও দেখবে অনেক বাবাদের চাইতে অনেক শুধু মা'রা যোগ্যতর সন্তান তৈরি করে সমাজকে উপহার দেবে। বস্তুতঃ সন্তানকে শেখানোর, তৈরি করার পেছনে বাবা না মা? কার দায় এবং করণীয় বেশি? বিজ্ঞানীদের মত নিয়ে তার পরে মতামত দিলে বিনীত বোধ করব। উত্তেজিত প্রত্যুত্তর নয়।

যদি বল মানসিক শান্তি, প্রেম, ভালবাসা তাহলেও হেসে ফেলতে পারি। একান্ত প্রশ্ন করে questionnaire তৈরি করে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখতে রাজি আছ? ভয় নেই তো? লজ্জা?

অভিভাবকত্ব, সুরক্ষা, security — এসব গালভরা কথা একেবারেই বস্তাপচা হয়ে গেছে। "চাচা আপন বাঁচা"-র যুগে বিয়ের ঐ সংস্কৃত মন্ত্রের বীজগণিতীয় তব-মম একেবারেই অর্থহীন ধ্বনি মাত্র! বিপদে পড়লে সব স্বামীই 'চাচা' হয়ে অন্তর্ধান করবেন। In fact সব পুরুষই; কারণ পুরুষমাত্রেই বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান বলেই য পলায়তি নীতিই ক্ষিপ্রপদের দ্রুত চালনায় প্রকাশ পায়। পণ্ডিত নয়, পণ্ডিতদের যুগ আগেই শেষ হয়ে গেছে; তখন ছিল অর্ধেক ত্যাগের অঙ্গীকার। এখন পুরুষমাত্রেই 'সর্বত্যাগী', অর্ধেকে তারা আকর্ষণ বোধ করে না। কারণ, এখন ভাগ্যবানের স্ত্রী বিয়োগ হয়; স্ত্রী মানেই তো অপরের ঘরের মেয়ে সুতরাং 'নতুন' সম্ভাবনায় উজ্জ্বল!

তাই শেষ করার আগে বলে নিতে চাই যে মেয়েদের কপালের লেখাই তাদের আজীবন দাসখত্। ব্যবহৃত হবে দাসী বলে কিন্তু ঘোষিত হবে গৃহলক্ষ্মী বলে, অধর্মীয় আর অশাস্ত্রীয় যাবতীয় ঘটনার পেষণে এরা বিভিন্নরূপে পর্যুদস্ত হবে কিন্তু সমাজের এবং ব্যক্তির বাক্-মোড়কে এরা ধর্মপত্নী বলে মলাটের আবরণ পাবে। এরা গৃহকর্ত্রী বলে appointed কিন্তু সেই কর্তৃত্বের সব নক্সা-সূত্র এবং পরিসর সর্বদাই থাকবে অন্যের হাতে। সংসারের যাবতীয় অন্যায়-commission এবং ভ্রান্ত-omission-এর জন্যে এরা নতমস্তকে বোঝাবাহী কিন্তু সব ভাল আর সকল শুভের বৃত্তি ভোগ করে অন্যেরা। মেয়েরা জন্মায় পরাশ্রয়ী বেড়ে ওঠার জন্যে, বেড়ে ওঠে বিয়ের জন্যে,

বিয়ে করে সন্তানধারণ আর সংসারের 'ধাপার মাঠ' হতে এবং এই স্বামী-সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়েই একদিন কোমরের ব্যথার পথ ধরে, বহু স্ত্রীরোগের বোঝা বয়ে বয়ে পরপারের দিকে হেলে পড়ে। এরা সারাজীবন দিতে দিতেই এগোয় — কন্যা, ভগ্নী, বধূ, মাতা এবং দিদা-ঠাকুমা — সব পর্বেই, সব অবস্থাতেই এদের দেওয়াটাই ধর্ম, ত্যাগ করাটাই কাঙ্ক্ষিত, নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটাই প্রার্থিত। এই অবস্থাটাকেই ওরা — পুরুষেরা — বলে 'দেবী' 'লক্ষ্মী' এবং সার্থক প্রাপ্তি!

মেয়েরা তাই যুগ যুগ ধরে সমাজ সমুদ্রে ঢেউ-এর মত প্রতিনিয়তই পুরুষের পাড়ে ধেয়ে ধেয়ে আছড়ে আছড়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিজেদের দীর্ঘ সজল জীবন শেষ করে দিচ্ছে। লবনাক্ত জীবনের শেষ তাই কখনই একেবারে শেষ হয় না। এক একটি নারী-ঢেউ চলতে চলতে তার আত্মজার জন্ম দেয়, সেই আত্মজা কন্যা তার কন্যার জন্ম দেয়। ঢেউ অফুরন্ত, অনন্ত, অক্লান্ত।

আমরা মেয়েরা তাই শেষ হয়েও কখনই শেষ হব না। যা শেষ হয়ে গেছে তা আমাদের ভাগ্য, আমাদের অদৃষ্ট, আমাদের অগ্রগতি।

আমাদের মধ্যে একজন মহিলা দধিচীর জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষাটাই সার করে বসে আছি আমি, যেকোনো এক নারী।

নারী স্বাধীনতা

কিছুদিন যাবৎ আমাদের দেশে নারী স্বাধীনতা বিষয়ে চিন্তাভাবনার ঢেউ চলছে। এটা এখন আলোচনার পর্যায় পার হয়ে একটা আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে, নিতে চলেছে। শুধু যে মহিলারাই তাঁদের চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণ সামনে তুলে ধরেছেন তাইই নয়, পুরুষদের মধ্যেও বিষয়টি বেশ সাড়া তুলেছে ; তাঁরাও অংশ নিচ্ছেন। এটা অত্যন্ত সুখের কথা। সুখের কথা এই জন্যে যে বিতর্কটি একটা সমতা পাচ্ছে, সমতার দিকে এগুতে পারছে।

যে কোনও সামাজিক ভাবনা যখন আন্দোলনের পথ ধরে, আনুষ্ঠানিক মাধ্যমকে একান্ত করে খুঁজে নেয় তখন চিন্তার সঙ্গে যেটা সবিশেষ জড়িয়ে পড়ে সেটা আবেগ। আর আবেগ যে চিন্তার বা ভাবনার গতিপথকে কম বেশি আশা-আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় বিপথগামী করে ফেলে বা ফেলতে পারে তার পরিমাণ বিতর্কের বিষয় হলেও তার অ-বিশুদ্ধ প্রভাব বিতর্কের বিষয় নয়। চিন্তা বিশ্লেষণের পথে সংশ্লেষণে পৌঁছায়, আবেগ লক্ষ্যের বাইরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করার সুযোগ দেয় না, সঙ্কুচিত করে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে ফেলে। তাছাড়াও চিন্তার থাকে সূক্ষ্ম ধার, আবেগের থাকে দলবদ্ধ ভার।

স্বাধীনতা বলতে প্রকৃতই কি বোঝানো হয়? 'নারী স্বাধীনতা'-র ধারণায় 'নারী' কথাটি স্বাধীনতাকে বিশেষিত করছে মাত্র। বলা যায় খণ্ড-এলাকায় উপস্থাপিত করে ব্যাপকতা দিচ্ছে মাত্র। সীমিত করছে স্বাধীনতার ধারণাকে কিন্তু মুক্তিও দিচ্ছে আলোচনার ধারাটিকে। কি ভাবে? পুরুষ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাসে 'স্বাধীনতা' ব্যাপারটাই পুরুষ-ভোগ্য বিষয় বলে ব্যক্তি মানসে এবং সমাজ-চেতনায় প্রোজ্জ্বল উপস্থিত। ব্যক্তির ও সমাজের অবচেতন এই ঐতিহাসিক সংকীর্ণতাকে পুষ্ট করেছে, স্থায়ী করেছে এবং অংশত-দৃষ্টি করে ফেলছে। তাই বিশেষিত উপস্থাপনায় ধারণাটির বিমুক্তি ঘটেছে, আলোচনার পরিসরকে সুনির্দিষ্ট করেছে, অবচেতনার প্রভাব থেকে বাইরে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে।

স্বাধীনতা বলতে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কি বুঝি? স্ব-অধীনতা। বাচ্যার্থমাত্র। 'স্ব'-টি কি? এবং অধীনতার তাৎপর্যই বা কি?

স্ব, অর্থাৎ ব্যক্তি। ব্যক্তির নিজের সর্ব-অস্তিত্ব সমগ্রতা। এখানে সমস্যা একাধিক। ধর্ম-দর্শন একভাবে এই স্ব-এর বা ব্যক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে, বিজ্ঞান — বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই স্ব-এর স্বরূপ চিহ্নিত করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আছে তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, তার চিন্তাভাবনা ধ্যান ধারণার প্রকৃতি এবং আছে তার শরীরজ প্রকৃতি। অধ্যাত্ম স্বভাবে ব্যক্তির স্বরূপ তার ব্রহ্ম-সত্তায় তার ঈশ্বর-প্রাপ্তিতে তার ভূমা-অস্তিত্বে। আবার বৈজ্ঞানিক স্বভাবে ব্যক্তির মানসিক পরিশীলনে, সামাজিক সম্ভাবনার সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হওয়ার মধ্যে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা আর্দশ-লক্ষ্য পূরণের যাথার্থ্যে। আর শরীর-স্বভাবে সে বাঁচার গুণে ও পরিমাণে, সুখে আর সম্ভোগে প্রভাবে আর ব্যাপ্তিতে নিজের স্ব-কে খুঁজে পেতে চায়। এই ত্রি-বর্গ স্ব নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সহজেই সক্ষম হয় ; কিন্তু বৈপরীত্য ও বিরুদ্ধতা দেখা দেয় অন্তর্বর্গ সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্ব নিজ নিজ গুরুত্বের অতি মূল্যায়নে একে অপরকে সংকুচিত, ক্ষুদ্র এবং সীমিত করে ফেলতে পারে। পালোয়ান বা শরীর শ্রেষ্ঠী হতে গিয়ে বুদ্ধির বা মননের অবমূল্যায়ন ঘটা, বুদ্ধির অতি অনুশীলনে শরীরকে বঞ্চিত করা, অথবা অধ্যাত্ম অনুশাসনে জীবধর্মের প্রতি অবিচারের সম্ভাবনা থেকেই যায়। সব মিলিয়ে সুসমঞ্জস, সুসংহত ব্যক্তিত্ব

বিকাশের যে লক্ষ্য ধারণাগত ভাবে স্বীকার করা যায়, তাকে প্রাপ্য করে তোলা বিধি ও প্রক্রিয়াগতভাবে সুদূরপরাহত বলা চলে। কল্পনার অবস্থান ধারণাগত স্ব-মাত্র সেই ব্যক্তিত্ব বাস্তবতা। সে কথায় আমরা পরে আবার আসব।

অধীনতা? আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, চাওয়া-পাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিবেচনা, প্রকাশ-বিকাশ যখন স্বতঃনির্দ্ধারিত না হয়ে পরত নিৰ্দ্ধারিত হয়ে ওঠে তখনই আমরা 'অধীন', স্বাধীন নই। আরোপ মাত্রই অধীনতার চিহ্ন। একাধিক বিকল্পের মধ্যে যে কোনও একটাকে বেছে নেবার অধিকার স্বাধীনতার চিহ্ন। এই আরোপ প্রকৃতিজ হতে পারে, শরীরজ হতে পারে এবং হতে পারে মানসিক। ইচ্ছে করলেই যে আমরা যে কোনও দূরত্বে লাফাতে পারি না, অনুভূমিক অথবা লম্ব দূরত্বে, ইচ্ছে করলেই যে আমরা ভাসমান অবস্থায় আকাশে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারি না, কলকাতায় এবং দিল্লীতে একই সময়ে উপস্থিত থাকতে পারি না, পারি না দু ঘণ্টা শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে একমনে লিখতে-পড়তে-ছবি-আঁকতে, এবং এমতো আরো কতো শত ইচ্ছে মনের মধ্যে গজালেও যে তা আমাদের ক্ষমতার বাইরে সে তো প্রাকৃতিক নিয়মের সীমায় বাঁধা। আবার মনুষ্য সৃষ্ট নিয়মও আমরা লঙ্ঘন করতে পারি না — পারি যদি গাড়ির নিচে চাপা পড়ার ঝুঁকি নিতে পারি, অথবা জেলের অন্দরে শালপাতার অন্নভোজের আর্কষণ থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে দ্রুত-যান পথের মাঝ মধ্যিখান দিয়ে চলতে ইচ্ছা হলে সেই ইচ্ছার পূরণ সম্ভব, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরদ্রব্য আত্মসাৎ করলে। এমতো আরও বহু ইচ্ছা মানুষের হতে পারে, হয়ে থাকেও। প্রকৃতির নিয়ম সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, সমাজের আইন পথরোধ করে। তবে আইনের হাত খুবই সূক্ষ্ম; মাঝে মাঝে আদৌ আছে কি নেই তাই বোঝা ভার হয়ে দাঁড়ায়। সে অন্য কথা। মূল কথা প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করা যায় না; আইন বোধহয় ভঙ্গ করা হবে বলেই নথিভুক্ত হয় (!) এক ক্ষেত্রে আমরা কোনও স্বাধীনতা ভোগ করি না; আমরা প্রকৃতি-পরাধীন। অন্যক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন হয়েও আইন-পরাধীন-(যদি না পড়ি ধরা!)

জন্মের ক্ষেত্রে আমরা কেউই তো স্বাধীন — স্ব-অধীন-নই! আমরা সকলেই 'আরোপিত'; বলা ভাল আমরা প্রত্যেকেই এক একটি ছুঁড়ে দেওয়া প্রক্ষিপ্ত, সংখ্যা মাত্র। অসীম-অনন্ত সম্ভাবনার জীবন সমুদ্রে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজ নিজ বিন্দুতে আরোপিত প্রক্ষিপ্ত অস্তিত্ব। কর্ণের মতো বলা যায় যে পৌরুষ আমাদের করায়ত্ত। কিন্তু সেই নাটকীয় অহংকার ঝংকৃত ঘোষণা আমাদের সাধারণ ব্যক্তির জীবনে কতখানি সত্য, কতদূর বাস্তব তা ক্রমশ আলোচনার বিষয়।

মানুষের জীবন নিয়ে জীবন-বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করছে। জীবনের অভিব্যক্তি, স্বরূপ, প্রকাশ, গোষ্ঠী বা শ্রেণী বিভাগ, সংগ্রাম-সহযোগিতা, উত্থান-পতন — নানান দিক থেকেই বিশ্লেষণী আলোকপাত ঘটছে এইসব বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে। শরীরবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগতভাবে আলোচনায় নিযুক্ত। এদের কাছ থেকে জানা যায়, প্রথম, মানুষ কতোখানি বংশগতি নির্ভর এবং কতোখানি পরিবেশ-প্রভাবিত। কুলে জন্ম অবশ্যই পরায়ত্ত, কিন্তু 'মমায়ত্তং হি পৌরুষং' সর্বার্থে সত্য নয়। প্রাথমিক ভাবে প্রাপ্ত 'জিন' এবং 'ডি. এন. এ' আমাদের জীবনের গতিপথের অনেকটাই যে শতবন্ধনে আর সহস্র আরোপ সীমিত করে চলে তা এখন স্কুলপাঠ্য এলাকার। তাছাড়া পরিবেশের আরোপ এবং বন্ধন এমন কিছু ছোট করে দেখার বিষয় নয়। মনোবিজ্ঞান শৈশব থেকে শুরু করে বুদ্ধিবিকাশের শেষ বয়স পর্যন্ত এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ হবার শেষ পর্বটি পর্যন্ত ব্যক্তি মনের অনুসরণ করে যা পেয়েছে তা আশারও যেমন হতাশারও তেমনি। পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক গড়াপেটায় একদিকে পরিবেশ সৃষ্ট হয়, পরিবর্তিত

হয়, অন্যদিকে ব্যক্তিও পরিবর্তিত হয় সৃষ্ট হয়। পর্বে আর পর্যায়ে বিন্যস্ত এই পারস্পরিকতা গুণ-পরিমাণ আরোপ-প্রতিআরোপ ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনাটকুর প্রকাশ ঘটাতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয়, ব্যক্তির নিজ নিজ মনটি। শরীর নির্ভর এবং প্রকৃতি-প্রবৃত্তি নির্দেশিত পথে যে জীবনটি ক্রমশ সামাজিকতা আর সভ্যতার তাপে ও চাপে নিজ নিজ সচেতন মনটিকে নিজের বলে খুঁজে পায় সেই মনটিই ব্যক্তির দিক-নির্দেশক, দিক-নির্ণায়ক যন্তর-মন্তর। মনের ত্রি-বিধ তন্ত্রী — চিন্তা, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা — ক্রমগঠনে তৎপর, ক্রম-উন্মেষে উন্মুখ এবং পরিবর্তনে অস্থির। চিন্তার-ভাবনার অনুশীলন পরিশীলন যেমন মনকে সমৃদ্ধ করে তেমনি এদের অভাব মনকে সাধারণের স্তরে বেঁধে রাখে। আবেগকে যদি যুক্তির বাঁধনে, মূল্যের নির্দেশ আর সভ্যতার ঘেরাটোপে সত্য-সিদ্ধ, সমাজ-সিদ্ধ করে না তোলা যায় তাহলে তো জৈবিক অস্তিত্ব থেকে মুক্তির সম্ভাবনাটাই কমে যায়। 'সাবলিমেসন' এবং 'রি-ডাইরেকশন' আবেগের সামাজিকীকরণে সৃষ্টির সুন্দরতায় এবং মানুষী অস্তিত্বের জন্যে আবশ্যিক।

আর আকাঙ্ক্ষা? আমরা ক'জন পারি আকাঙ্ক্ষাকে যোগ্যতার নিরিখে আর অর্জনের সীমায় ধরে রাখতে? বাসনার জগৎ স্বভাবতই বল্গাহীন; আর অর্জনের প্রস্তুতিতে এবং যোগ্যতার অনুশীলনে বাসনার রূপরেখা নিশ্চিত হবার পরিমিত হবার অবকাশ পায় না বলেই অনেক অকারণ যন্ত্রণার উদ্ভব ঘটে। আমাদের চাওয়ার মধ্যে ভুল সুপ্ত থাকে বলেই পাওয়ার মধ্যে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে।

আর আছে প্রতিনিয়তর প্রতিযোগিতা। যোগ্যতমের উদ্বর্তন একমাত্র প্রকৃতিতেই সত্য নয়; আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বস্তরেও তা সমানভাবেই সত্য। আমরা তো সকলেই কমবেশি নিজ-নিজ পিঠ-চাপড়ানো মূল্যায়নে প্রত্যেকেই যোগ্য; একমাত্র ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত পক্ষপাতই আমাদের যোগ্যতাকে অস্বীকার করে! অন্যকে যোগ্য বলে মনে করে!

এই সামগ্রিক বিশ্লেষণের পটভূমিকায় আমরা নারী-স্বাধীনতার বিষয়টি উপস্থাপনা করতে চাই।

ভৌত-সামাজিক পরিবেশের প্রভাব বা আরোপ বিষয়ে নারী ও পুরুষের জন্যে কোনও প্রভেদ নেই। শৈশবের যাত্রা শুরুর দিন থেকে বার্ধক্যের অবকাশ জীবন পর্যন্ত সেই পরিবেশ একই থাকে উভয়ের ক্ষেত্রে। থাকার কথা, কিন্তু তা থাকে না। থাকে না কারণ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বহু বিচিত্র প্রভাব নর ও নারীর জন্যে বিভিন্ন। সৃষ্টি সংস্কৃতি, বিশ্বাস, জীবনবোধ, প্রকৃতি মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্ণয় — এমতো কতো শত বিবেচনা যুগ যুগ ধরে নর-নারীর জীবন উন্মেষ এবং জীবন-ধারাকে স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করে চলে। এই বিভেদ সৃষ্টির মূলে আছেন পরিবারের অভিভাবকরা, প্রধানত মাতা-পিতা, এবং সমাজের সঞ্চিত চেতনা, মূল্যায়ন। 'এটা কর, ওটা ক'র না; এটা উচিত ওটা উচিত নয়' এমতো শত নির্দেশ আর সহস্র নিষেধ শৈশব থেকে আমাদের প্রত্যেককেই পদে পদে সমৃদ্ধ করে, আক্রমণ করে। এই নির্দেশ-নিষেধ অনুধাবন করলে সহজেই ধরা পড়বে যে ছেলেরা একটা পূর্বস্বীকারের অনুবর্তী হয়ে বেড়ে ওঠে। মেয়েরা অন্যতর পূর্বস্বীকারের।

এই সব পূর্বস্বীকারের কোনও শারীরিক বা মানসিক ভিত্তি নেই! পেশী-দেহী মনোতোষদের পুরুষ হতেই হবে এমতো কোনও বৈজ্ঞানিক নির্দেশ নেই, মানসী' রাও পেশী-শিল্পের অনুশীলনে সমান দক্ষতা এবং খ্যাতি লাভ করতে পারে। পালোয়ান হতে পুরুষ হওয়াটা অনিবার্য নয়। প্রশাসন থেকে পাইলট, পর্বতারোহণ থেকে সমুদ্র-সন্তরণ অসি চালনা থেকে মন্ত্রী-দক্ষতা — জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই শরীর বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান বিভেদের কথা বলে না। তা সত্ত্বেও নিদারুণ

বিভেদের বীজ-অঙ্কুর-বনস্পতি সমাজ মানসে এবং পরিবার চেতনায় সনাতন সত্য হয়ে ছেলেদের জীবন লক্ষ্য ক্ষেত্রকে মেয়েদের জীবন লক্ষ্য ক্ষেত্র থেকে প্রতিনিয়তই প্রভেদ করে চলেছে। এবং আজ যে শিশু, সে ছেলেই হোক অথবা মেয়েই হোক, উপস্থিত পরিবেশে এই বিভেদের পূর্ব স্বীকৃত প্রভাবে বড় হয়ে উঠছে, তার অবচেতনে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে একটি 'সুপার-ইগো' তৈরি করে নিচ্ছে। বিভেদের আকণ্ঠ হলাহল অজ্ঞাতেই তার ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করে চলবে। তাই যখন বুদ্ধি আর চেতনার বিষয়গত অনুশীলনে, প্রত্যক্ষ আর অনুভবের পরিশীলনে, যুক্তি আর ভূয়োদর্শনের প্রসারতায় সেই ব্যক্তি এই সব পূর্বস্বীকারের অসারতা, করণীয় বোধের যুক্তিহীনতা এবং বিভেদের যাবতীয় বিষক্রিয়ার বিষয়ে অবহিত হয়ে ওঠে, সচেতন সমালোচনায় পরিবর্তন সাধনে উন্মুখ হয় তখনও দেখা যাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দ্বিধা বিভক্ত। বিরোধ ঘটে সচেতন বুদ্ধির সত্যের সঙ্গে অবচেতনের দৃঢ়-মূল প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের। এই সব ব্যক্তিরাই, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে পরিবার জীবনে প্রবেশের পরেই বিভেদের হলাহলকে সমাজ-পরিবারের কণ্ঠ থেকে উৎপাঠনের পরিবর্তে সংরক্ষণে নিয়োজিত হয়ে পড়েন। এটা ট্রাজেডি। কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম সে তো নিয়মকেই প্রমাণ করে; তাছাড়া সে সব ক্ষেত্রে প্রায়শই যুক্তি-বিচারের পরিবর্তে আবেগের প্রান্তীয় প্রভাব বড় বেশি করে প্রকট হয়ে পড়ে। সে ব্যাখ্যায় আমরা পরে আসার ইচ্ছা রাখি।

স্বাধীনতার ধারণাটি প্রধানতই মানসিক; অন্যান্য প্রেক্ষিতে ব্যক্তি মাত্রই প্রধানত পরতঃ-অধীন। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে স্ব-অধীনতাই স্বাধীনতা। এই স্ব-এর বিচার এবং অধীনতার স্বরূপ অন্বেষণে আমরা কিছুটা আলোকপাত করেছি। পরিবারে, সমাজে এবং পরিবেশে যত প্রকারের 'সাবলিমেশন' ও 'রি-ডাইরেকশন' স্বীকৃত এবং সিদ্ধ তার যে কোনওটি বেছে নেবার অধিকার যদি ব্যক্তি শৈশব পরবর্তী সময় থেকে অবাধিত পেতে থাকে তাহলেই বলব যে সে স্বাধীন। ব্যক্তির মধ্যে যে প্রাণশক্তি, যে জৈবশক্তি প্রতিনিয়ত প্রকাশের পথ খোঁজে তাদের সমাজ-সভ্যতার কাঠামোতে উন্মোচিত হবার সুযোগকেই 'সাবলিমেশন' বা 'রিডাইরেকশন' বলা চলে। এই শক্তির বেশিরভাগই প্রথমদিকে জৈব, প্রবৃত্তিজ। ব্যক্তিমনের গঠন সময় থেকে শুরু করে মানসিক শক্তি বা তেজ আত্মশক্তির প্রেরণায় প্রকাশের পথ খোঁজে। জান্তব মারামারি-কামড়াকামড়িকে সামাজিক বিভিন্ন নিয়ম-নিগড় প্রতিযোগিতায় প্রকাশ করে 'সভ্য' রূপ দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক বা প্রবৃত্তিজ শক্তির প্রকাশের মাধ্যম স্থির করার সময়ে ছেলেদের এবং মেয়েদের এলাকা বলে যে প্রভেদ রেখাগুলি টানা হয় সেখান থেকেই বিভেদের বীজটি অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পায়। ফুটবল, ক্রিকেট ছেলেদের জন্যে লাফদড়ি আর পুতুল মেয়েদের জন্যে! এমতো শত শত যুক্তিহীন এলাকা চিহ্নিতকরণ স্ব স্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা শক্তির স্ফুরণের পূর্বেই ছেলেদের এবং মেয়েদের মনে এবং সুতরাং তাদের অবচেতনে দৃঢ়মূল কিছু কিছু প্রত্যয় এবং মূল্যায়নকে স্থায়ী করে তোলে। ছেলেদের জীবন বাইরের, সমাজের এবং তা অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্যে নির্দ্ধারিত এই বোধটি শুধুমাত্র ছেলেদের মনেই নয়, মেয়েদের মনেও প্রোথিত করে দেওয়া হয়। মেয়েদের জীবন ভিতরের, পরিবারের এবং তা সন্তানধারণ সন্তান পালন গৃহপরিমার্জনা এবং অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যসাধনের জন্যে স্থিরীকৃত — এই বিশ্বাসটিও মেয়েদের মনে এবং ছেলেদের মনে প্রতিষ্ঠ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন এমন অকারণ বিভেদ? কে বা কারা করেন? কি এর পরিণতি?

এক কথায় উত্তর দিলেঃ সংস্কার; মা-বাবা এবং অন্যান্য সকলেই এবং পরিণামে শোষক-শোষিত শ্রেণীর উদ্ভব। ব্যাখ্যা করে বললেঃ শ্বাসপ্রশ্বাসকে আমরা যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম বলে মেনে চলি ঠিক তেমনি নারী ও পুরুষের বিভিন্নতাকে আমরা স্বভাবসিদ্ধ বলে বিশ্বাস করে যুগ

যুগ ধরে জীবন যাপন করে চলেছি। এখনও মনুষ্য সমাজের কোথায়ও কোথায়ও নারীরা মাইলের পর মাইল পার হয়ে জল বয়ে আনে, ফসলের বোঝা বয়ে আনে, এবং অনেক বেশি শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজ করে চলে; আর পুরুষ অবসরের অঢেল আয়েশ উপভোগ করে। নিম্নশ্রেণীর নারীর ভাগে শ্রমের অংশ বহু সমাজেই দেখা যায়। কোথায়ও বা পুরুষ শ্রম-কেন্দ্রিক কাজের ভাগ বেশি বহন করে। আর উচ্চশ্রেণীর মধ্যে তুলনা করা কষ্টসাধ্য এইজন্যে যে যেখানে অফিস-কাছারির শ্রম আর গৃহের সন্তানধারণ থেকে লালনপালন ইত্যাদি কাজের শ্রমের মধ্যে গুণগত প্রভেদ তুলনার পক্ষে অন্তরায়। কায়িক শ্রম আর মানসিক শ্রমের মধ্যে তুলনা করা কষ্টসাধ্য। তেমনি কষ্টসাধ্য সন্তানধারণ, প্রসব, লালনের শ্রম আর বৌদ্ধিক শ্রমের তুলনাও। কাজের মধ্যে এবং কাজের সঙ্গে জড়িত মানসিক চাপ, তাপ, উৎকণ্ঠা — 'স্ট্রেস, টেনশন, এবং স্ট্রেন ইত্যাদিও কি পরিমাপ যোগ্য? সুতরাং হাল্কা-ভারি, সহজ-কঠিন, ঘরের-বাইরের বলে যে ব্যাখ্যা সে কেবল প্রকৃত সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, গোপন করে রাখা মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অপব্যাখ্যা অজ্ঞাতেই ঘটে থাকে, অবচেতনের প্রভাবেই সামনে তুলে ধরা হয়, আত্মপক্ষসমথনের উৎকর্ণতায় ঘটে থাকে। মূল কথা সংস্কার। বিশ্বাস। স্বার্থবোধ। এবং অজ্ঞতা।

একটা সময় ছিল যখন আমরা পৃথিবীকেই কেন্দ্র বলে জানতাম। জানতাম পৃথিবীটা চ্যাপ্টা, সমতল ক্ষেত্র। বিজ্ঞান আমাদের সেই ভুলকে সংশোধন করে দিয়েছে। তেমনি বহুদিন ধরেই আমাদের এই জানাটা সংস্কারের মতো আমাদের মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে পুরুষই প্রধান, নারী পরনির্ভরশীল — বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের উপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল কথাটা বেশ পরিশীলিত! জানতাম যে নারী পুরুষের সম্পদ, পুরুষের অধিকারে গৃহপোষ্য প্রাণীদের মতোই যথেচ্ছ ব্যবহারযোগ্য। এখনও অনেকের মনের গভীরে এই বোধ ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করে থাকে, উত্তেজিত সময়ে, আবেগতাড়িত মুহূর্তে প্রবল ভাবে সেই বিশ্বাস পেশীতাড়নায় প্রকাশ পেয়ে যায়। অনুরূপ ভাবেই জানতাম যে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের বুদ্ধি কম, শক্তি কম (যদিও আমরা তাদের শক্তির প্রতীক বলে ঘোষণা করেছি, 'ইউলোজাইজ' করেছি!) যোগ্যতা কম। বিজ্ঞান আমাদের সেই জানার অসারতা প্রমাণ করেছে; নারীরা তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় সেই অজ্ঞতার বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদের মতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিলঃ কে বা কারা এই বিভেদ সৃষ্টি করেছে? পুরুষ এবং নারী উভয়েই। সেই নারী, মাতা, — মাতামহী হয়ে সুদূর অতীত পর্যন্ত প্রসারিত, সেই পুরুষ পিতা, — পিতামহ ধারায় প্রবাহের উৎস পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। দীর্ঘ ইতিহাস, দৃঢ় সংস্কার এবং অজ্ঞাত অবচেতন নারীদের মধ্যে হীনমন্যতা, যুদ্ধবিমুখতা আর অবলা-মান্যতা তাদের অস্তিত্বের গভীর পর্যন্ত সন্নত করে রেখেছে। এরাই নারীদের 'মেয়ে' করে তৈরি করতে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখে, ছেলেদের 'পুরুষ' করে গড়ে তোলে। মায়েদের অংশ সদর্থক, সোজাসুজি, 'পজেটিভ'। পাশাপাশি পিতার সমর্থন পোষণ এবং পক্ষপাতিত্ব সমান জাগরুক থাকে। তাই ক্রমশ অভিব্যক্ত শৈশব-কৈশোর-যৌবন অন্যায় অসত্য এবং অবৈজ্ঞানিক বিভেদের তত্ত্বকে শুনতে শুনতে জানতে জানতে দেখতে দেখতে একসময় বিশ্বাস করে ফেলে যে নারীরা পুরুষের চাইতে খাটো, অনুন্নত, অসম্পূর্ণ এবং সুতরাং নির্ভরশীল। যেমন আমরা বিশ্বাস করতে করতে সূর্যকে তার কক্ষপথে ঘূর্ণমান, পৃথিবীকে কেন্দ্রস্থিত প্রধান অস্তিত্ব বলে মেনে নিয়েছিলাম। মেনে নিয়েছিলাম পৃথিবী চ্যাপ্টা, সমতল।

বেঁচে থাকার জন্যে সব থেকে কষ্টসাধ্য সংগ্রাম হল রসদ সংগ্রহের সংগ্রাম। প্রাগৈতিহাসিক

সময়ে জান্তব শক্তিতে এবং কৌশলে সেই সংগ্রহ সম্ভব ছিল। যে মুহূর্তে কৃষি নির্ভর সমাজ এবং সুতরাং অফুরন্ত রসদ সংগ্রহের প্রক্রিয়াপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল, তখন থেকেই একদিকে অবসর অফুরন্ত হল অন্যদিকে সম্পদের সম্ভার কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ পেল। ব্যক্তিগত সম্পদের ধারণা এবং যোগান সম্ভব করে তুলল সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং সাধারণ শ্রেণী। বুদ্ধির ঘুড়িতে অফুরন্ত প্যাঁচ খেলার অবকাশ সভ্যতার নবরূপায়ণটি ত্বরান্বিত করল। এবং সমাজের নানান প্রকারের শ্রেণী বিন্যাস ঘটে গেল। বর্ণবিভেদ এদের এবং এই সম্পন্নতার একটি ফসল ; নারীদের স্বতন্ত্র এক দুর্বল শ্রেণী বলে গৃহকোণে আটকে রাখাটাও জৈব, যৌন এবং সামাজিক কারণেই দ্বিতীয় ফসল। রসদ সংগ্রহের সংগ্রাম থেকে মুক্তি হয়তো নারীদের অপার সন্তোষের কারণ হয়ে থাকবে ; আত্মার অবমাননার প্রসঙ্গ তখন মনেই আসে নি হয়তো। আলস্যের নিজস্ব একটা টান যে আছে তা তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সারা মাস বিলম্বে দপ্তর পৌছে, ছুটির আগেই দপ্তর ত্যাগ করে এবং সম্ভবত যে জন্যে মাস মাইনেটি পাই সেই কাজটি ছাড়া অন্য সব কাজ সেরে আমরা সময় কাটাই, ধর্মঘটের দিনগুলোতে জীবনের যথার্থ অর্থ খুঁজে পাই। অলস দিন যাপনের মধ্যে এবং ইত্যাদি, এসবই কি নির্দেশ করে না যে সেই কৃষিদিনের ঘর্মাক্ত রসদ সংগ্রহের দিনে গৃহাভ্যন্তরেব জীবন অনেক বেশি কাঙিক্ষত ছিল!

আজর্কের যন্ত্রসভ্যতার তীব্র রসদ-সংগ্রহ সংগ্রামেও তাই ওরা যুদ্ধ করে না, সত্যকে জানতে চায় না। পৃথিবীকে বেষ্টন করে সূর্যের ঘূর্ণনে ওদের আপত্তি নেই। বিচারশীলতার, বুদ্ধিপ্রয়োগের সব চাইতে বড় জ্বালা তাদের অন্তর্নিহিত নির্দেশ, আদেশ এবং সেই আদেশ-নির্দেশের কষ্টসাধ্য অনুসরণ। স্থিতাবস্থার, বিশ্বাসের সবথেকে বড় আশীর্বাদই হল অঢেল অবকাশ, নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন, নিঃশঙ্ক চিত্ততা। মেয়েরাই পৃথিবীকে ঘুরতে দেবে না, দিচ্ছে না। পুরুষরা সব ব্যবস্থা পাকা করে রাখছে যাতে আধুনিক জীবনের প্রভাব, বিজ্ঞানের চেতনা ও সত্য স্থিতাবস্থায় ফাটল ধরাতে না পারে! ভোগের ধর্মই এই যে সে কখনও তৃপ্ত হয় না ; আরো চাই, আরো চাই করে সে ভোগের এলাকা বাড়িয়েই চলে। ভোক্তাগণ তাই ভোগ্যদের জন্যে যথাসম্ভব দরজা-জানালা কপাট-বন্ধ রাখতেই আগ্রহী। তার মধ্যেও যদি কোন বিপ্লবী, কোনও যোদ্ধা হঠাৎ হঠাৎ সব বাধা ভেঙ্গে যোগ্যতার দীপশিখাটি এবং স্বাধীনতার পতাকাটি উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারেন তাহলে সকলে মিলে তাকে নিয়ে হৈ-চৈ লাগিয়ে দাও!

পুরুষ শাসিত সমাজের এই বহু-পরীক্ষিত পদ্ধতিটি কেবলমাত্র নারীদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ সফল তা নয়, অন্ত্যজ অচ্ছুৎ সমাজের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। এবং সমান সত্য যে কোনও পরাধীন শ্রেণী সম্বন্ধেই। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই সকল ব্যক্তিকে সম্পদ আর সম্পন্নতা, স্বীকৃতি আর উল্লেখের আফিং খাইয়ে নিস্তেজ করে ফেললে সেই দীপশিখাটির উজ্জ্বলতা এবং সেই চেতনার ধ্বজাটি আকাশ ছোঁয়া দীপ্তি অচিরেই অন্য সকলের স্পর্শের বাইরে চলে যাবে। সম্পদ এবং শক্তি সব সময়েই খোলা সমাজের প্রতিযোগিতার জন্যে কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়। এবং যত বেশি সম্পদ তত বেশি সম্পন্নতা তৈরি হতে থাকে, শক্তির উদ্বৃত্ত অংশ অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে। এরাই 'ব্রাহ্মণ' — উপবীত ধারী অথবা উপবীতহীন।

শ্রেণী-সংগ্রাম আধুনিক সভ্যতার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে চেতনার সব দ্বারগুলি একে একে খুলে দিচ্ছে। তাই একদিকে পীড়িত-অধীন দোলক অনিবার্য প্রান্তীয় প্রবণতায়, স্বাধীনতার প্রান্তে সরে যেতে চাইছে। অন্যদিকে শ্রেনীস্বার্থ এবং গোষ্ঠী স্বাধীনতা রক্ষার নামে সম্পদ শক্তির কেন্দ্রাধিকারীরা অধিকতর সম্পদ ও শক্তিকে রাজপ্রসাদতুল্য 'সাধারণত্বে' অথবা মাটির গভীরে সুরক্ষিত মাইলব্যাপী যক্ষাগার তৈরি করতে কাজে লাগাচ্ছে।

স্বাধীনতা বলতে সুযোগসুবিধার সমবণ্টন, যোগ্যতার নিরিখে সুযোগ সমতা আর মানসিক সমদর্শিতা বোঝায়। হাতে করে তুলে দেওয়ার মধ্যে দাতার থাকে অহেতুক অহংকার আর গ্রাহকের থাকে অবমাননা। স্ত্রীস্বাধীনতার ক্ষেত্রে যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হল মানসিক প্রেতির কেন্দ্রীয় পরিবর্তন। পুরুষকে সরে আসতে হবে তাদের যুগ যুগ সঞ্চিত প্রধানের ভূমিকা থেকে সমতাবোধের সমতলে, দীর্ঘ উপভোগের সুউচ্চ স্বার্থপরতার বেদি থেকে তাকে নেমে এসে মাতা-ভগ্নী কন্যাদের অনুভবের জগতে অন্নের সঙ্গে স্বাধীনতাকেও সকলের সাথে ভাগ করে 'খেতে' হবে, উপলব্ধি করতে হবে। নারী পুরুষের সমানত্বের জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফসলকে,স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করে 'এটম বা হাইড্রোজেন' বোমার মতো ব্যবহার না করে সুস্থ হৃষ্ট একটা সামাজিক পারিবারিক জীবনের পথ প্রশস্ত করে দিতে হবে। এ যেন অনেকটা সেই সীমানা-সংঘর্ষের মতো। প্রতিবেশীর জমি এবং আমার সীমানা আমরা পরস্পরই জানি; কিন্তু ছ'ইঞ্চি এক ফুট অধিক অধিকারের ব্যক্তিস্বার্থে আমরা প্রজন্ম পরম্পরায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ি। সেই মানসিকতাই আমাদের গৃহে, মাতা-ভগ্নী-কন্যাকে কেন্দ্র করে আমরা প্রকাশ করে ফেলি। এতো গেল পুরুষের স্বার্থকীটদুষ্ট মানসিকতার কথা। এবারে মহিলাদের মানসিকতাটা দেখা যাক। 'আসুক আজ বাড়ি, দেখাচ্ছি মজা!' — এই মানসিকতা মাতা-ভগ্নী-কন্যা এবং স্ত্রীদের অবমানিত অবদমিত শোষিত মনের প্রকাশ ঘটায়। স্বাধিকারের শক্তিটি, স্বাধীন মনের চেতনাটি তাঁরা অনায়াসেই বন্ধক রাখতে পারেন উদ্দিষ্ট সেই যিনি এলে সকল সমস্যার সমাধান হবে বলে বিশ্বাস বা ঘোষণা তাঁর হাতে। মনে মনে নিজেদের অযোগ্য অনুপযুক্ত অক্ষম ভাবতে ভাবতে আমাদের গৃহনারীসমাজ সত্যি সত্যিই একসময়ে অযোগ্য অনুপযুক্ত অক্ষম হয়ে পড়েন, পড়েছেন। তাঁরা স্বামীদের পিতাদের পুরুষদের ব্যবহার করেন হাতিয়ার হিসেবে। সচেতন সেই হাতিয়ার সময় মতো সেই দুর্বল বোধে সদা-অবদমিত শ্রেণীকে তাই সহজেই স্বাধিকারে করায়ত্ব করে ফেলেন। প্রকৃতিদত্ত যে দৈহিক সৌন্দর্য-সুষমা এবং উপভোগ-মাধুর্য নারীদের নিতান্তই অন্দরমহলের সম্পদ তা অতি ব্যবহারে অথবা অত্যন্ত স্বল্প ব্যবহারে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ফেলে বহু ক্ষেত্রেই; সম্পন্নতা যে দেহে নয় মননে, প্রকাশিত যৌবনের দীপ্তিতে নয় প্রকাশক্ষম বুদ্ধি-বিবেচনা-ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে তা নারীদের এবং অবশ্যই পুরুষদের মনে রাখা দরকার। ক্ষণস্থায়ী, জরা-রোগ-ক্লান্তির শিকার যে সুন্দর তার বন্ধন ও ক্ষণস্থায়ী। মনের মিলনে সমদর্শিতার সমতায় আর হৃদয়ের নৈকট্যে দীর্ঘস্থায়ী জীবন সুখময় হতে পারে মাত্র। তাই মানসিক পরিবর্তন বলতে আমূল সরে আসাটা, স্ব স্ব প্রস্থান বিন্দু থেকে মধ্য বিন্দুতে মিলনকে বোঝান হচ্ছে। সংগ্রামের মানসিকতায় জেদ বাড়ে, সংঘর্ষই লক্ষ্য হয়ে জয়-পরাজয়কে নেশার মতো উদ্দেশ্য করে ফেলার সম্ভাবনা থেকে যায়। যতটুকু সমাধান বয়ে আনে তার শতগুণ বেশি সমস্যা তৈরি করে তোলে। পরিবর্তনটি মনোজগতেই ঘটানো দরকার — বিশ্লেষণ, বিবেচনা এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় প্রধান পরিবর্তনটি অর্থনৈতিক। অনেকের মতে এটাই প্রধান। কিন্তু তা নয়; সীমানা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে যেমন জমির রেখা বিভাজন-স্থান মূল সমস্যা নয়, মূল সমস্যা মনোভাবের, এখানেও তাই। আবার আর্থিক স্বাধীনতা বলতে দুটি বিষয়কে স্বতন্ত্র করে নিতে হয়। এক, পরিবারের সামগ্রিক আয় এবং সেই আয়ের মধ্যে স্ত্রীর অংশ বা অধিকার। দুই, পুরুষের মতো মহিলাদের নিজস্ব অর্জন — চাকরিব্যবসায় ইত্যাদি সূত্রে। আর্থ-স্বাধীনতা দুই ক্ষেত্রে দুই রকমের সমস্যা তৈরি করে এবং তাদের সমাধান সূত্রও তাই একরকম হতে পারে না।

প্রথম ক্ষেত্রে, যেখানে স্বামী একা আয় করেন, অথবা পরিবারে সকল আয়ই পুরুষের মাধ্যমে ঘটে সেখানে, আলোচনার সুবিধার জন্যে, দুরকম অবস্থান হতে পারে। উপার্জিত আয়ের

(ক) অংশ-অধিকার বোধ আছে অথবা (খ) একেবারেই নেই। (একটা তৃতীয় অবস্থান থাকতে পারে যেখানে স্ত্রী বা মহিলাটি শুধুমাত্র কিছু হাত-খরচায় সন্তুষ্ট — অধিকার বোধ আছে তাও নয়, নেই তাও নয় — একটা মাঝামাঝি অবস্থান।)

প্রথম অবস্থানের দ্বিতীয় অনুভবে কোনও সমস্যা বাস্তবে নেই। নেই, কারণ, গতানুগতিক ব্যবস্থায় পুরুষের সর্বতঃ অধিকার স্বীকৃত। আবেদন, নিবেদন, অভিমান, এমনকি দুফোঁটা চোখের জলে মহিলারা তাদের আর্থিক চাহিদা, স্বাধীনতাটুকু পূরণ করে নিয়ে থাকেন। পূরণ না হলে কপালের উপর দোষ চাপিয়ে অদৃষ্টকে ধিক্‌কার দিয়ে আবার কোমরে আঁচল গুঁজে সংসার করে চলেন। কিন্তু এই বাস্তবকে কোনও সমাধানসূত্রে বাঁধা যাবে? অর্ধাঙ্গিনী, যদিদং-তদিদং-সঙ্গী কি সর্ববিষয়ের সঙ্গে আয়ের অর্ধও পেতে পারেন? — অধিকারের কথা বলছি, বাস্তবের সম্ভাব্যতার কথা নয়। সমস্যা, স্বাধীনতার সমস্যা, সেক্ষেত্রে সমাধানের বদলে তীব্রতর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে না? তর্ক চলতেই থাকবে, উত্তাপ বেড়েই চলবে এবং সমাধানের পরিবর্তে কণ্ঠের তীক্ষ্নতা আর চোখের জলের অজস্রতাই কি একমাত্র 'সিদ্ধান্ত' হয়ে দাঁড়াবে না? প্রচলিত সমাধান প্রক্রিয়াগুলি দেখা যাক। কোনও কোনও ব্যক্তি সমগ্র উপার্জন স্ত্রী বা মা-এর হাতে তুলে দেন! এক্ষেত্রে স্বাধীন না হলেও অর্থমন্ত্রীর মতো সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব সেই মহিলাই বহন করেন। কেউ কেউ আবার একটি পয়সাও মহিলাদের হাতে দেন না, সব দায়দায়িত্ব নিজেই বহন করেন। মহিলাদের 'স্বাধীনতা' থাকে না খরচা করার, বা না করে লক্ষ্মীর ঝাঁপি পুষ্ট করার। আর আছেন তৃতীয় গোষ্ঠী যারা প্রতি মাসে বা কিস্তিতে মহলিাদের 'হাতখরচা' বলে কিছু অংশ তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে থাকেন। এই সকল ক্ষেত্রেই সীমিত আয়, সীমাহীন ব্যয় এবং কাপড়-কোটের সমতাহীন আপেক্ষিকতা সকলের জন্যেই পীড়ার কারণ। পুরুষ অর্থের অনটনে পীড়িত, মহিলারা চাহিদা পূরণের অক্ষমতায় পীড়িত। যেসব সংসারের অঢেল আমদানি সেখানে সমস্যা স্বাধীনতার নয়, যথেচ্ছ খরচের এবং উদ্বৃত্তের।

দ্বিতীয় অবস্থানের অনুভবে সমস্যা গুণগতভাবেই আলাদা ঃ মহিলাদের উপার্জনের অধিকার বা স্বাধীনতা। এই সমস্যা প্রধানত কিছু কিছু নিম্নবিত্ত পরিবারে, প্রায় সব মধ্যবিত্ত পবিবারে এবং ক্বচিৎ কখনও দু'একটি উচ্চ-বিত্ত পরিবারের সমস্যা। এই সব পরিবারের মেয়েরা এবং স্ত্রীরা কম বেশি উপার্জন যোগ্যতা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে অথবা না গিয়ে অজন করে থাকেন। তাই চাকরি বা ব্যবসায়-এর ক্ষেত্রে এঁরা কোথায়ও না কোথায়ও অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে নেন, নিতে পারেন। এ সকল ক্ষেত্রেই নানান কারণে পুরুষরা মহিলাদের স্বাধীন অর্থোপার্জন সম্ভাবনাকে বাধা দেন অথবা উপার্জিত অর্থের উপর নিজেদের আংশিক অথবা পূর্ণ অধিকার দাবি করে বসেন। এখানে বাবা বা শ্বশুর, স্বামী বা ভাসুর বলে কথা নেই; কথাটা কর্তৃত্বের, অধিকারের অভিভাবকত্বের। তাই সংঘাত, সংঘর্ষ এবং অফুরন্ত হলাহলের বহমানতা। এবং এইখানেই স্ত্রী স্বাধীনতার, নারী মুক্তির ধ্বনিটি উচ্চারিত। যুক্তি-তর্ক-সালিশী, রক্তিম-চোখের অবিরত ঘূর্ণন চোখের জলের প্রবাহ, মান-অভিমান — সব মিলিয়ে এক জটিল পরিস্থিতি। পুরুষ বোঝেনা নারীর অন্তরের বেদনা, নারী উপলব্ধি করে না পুরুষের ঈগোকেন্দ্রিক অহংকার। সম্পর্ক ভাঙে, তিক্ততার সৃষ্টি হয়, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদের ঘণ্টা বেজে ওঠে, পিতা-কন্যায় অর্থের 'হাড়-টুকু' নিয়ে সারমেয় যুদ্ধ বেধে যায়। অলমিতিবিস্তারেন!

আধুনিক সমাজে সবকিছুর দ্রুততা বেড়ে গেছে। পৃথিবী তাই ছোট হয়ে গেছে। একই সমস্যা এখন বহুজনকে একই সময়ে পীড়ন করে। এবং তারা নিজেদের মধ্যে সংযোগ-সম্পর্ক দ্রুত গড়ে তুলতে পারে। তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে, আধুনিক শিক্ষার যোগাযোগ মাধ্যমের বহুল

নৈকট্যে এবং সহজলভ্যতায় গড়ে ওঠে সংঘ, সমিতি, সংস্থা। ঘোষিত হয় উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং যুদ্ধ। নারী-স্বাধীনতার দাবি তাই বর্তমান দিনে অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী। 'দিনকাল কি হল?' বলে, অথবা 'শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে আগেকার মতো বিনয় নেই, মান্যতা নেই......!' বলে হাহুতাশ করে কোনও লাভ নেই। অচ্ছুৎ শ্রেণী অথবা অন্যান্য শোষিত শ্রেণী যেমন নিজ নিজ অধিকার, স্বাধীনতার জন্য সামাজিক রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, নারীরাও তেমনি, একটা বিশিষ্ট অংশ, আজ তাদের অর্থনৈতিক অধিকার এবং স্বাধীনতা অন্বেষণে দলবদ্ধ হয়ে উঠছে।

যে কোনও দলবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে একটা 'আমরা বোধ' তাদের ঐক্যের মূলে কাজ করে। এই 'আমরা-বোধ' সব সময়েই একটা 'ওরা-বোধের' প্রেক্ষিতে দানা বেঁধে ওঠে। এই আমরা আর ওরা যে দ্বন্দ্বের সূচনা করে তা স্বভাবতই চিন্তা বা বিচারের পর্যায়ে আটকে না থেকে আবেগের জলসেচনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব তখন সংগ্রামের রূপ নেয়। পুরুষের এবং পুরুষ-শাসিত সমাজের স্বার্থে যখন আঘাত লাগে তখন বাধে সংঘর্ষ। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণী সংগ্রামের একাধিক প্রভেদ রয়েছে। তাই এখনও বর্তমান সমাজে প্রচলিত প্রক্রিয়া পদ্ধতি এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে শুরুকরে নি। যেমন ইট পাথর, ডাণ্ডা-ছোরা, বোমা-পটকা, পিস্তল-পাইপগান, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পুরুষের স্বার্থান্ধ মনোভাব এবং দুর্গরক্ষায় তৎপরতা দীর্ঘদিন সেই রাজনৈতিক প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি প্রক্রিয়াকে গ্রহণে বিলম্ব ঘটাতে পারবে না! সময় হাতছাড়া হবার আগেই সমাধানটি খুঁজে নিলে অনেক ভবিষ্যৎ জটিলতার হাত থেকে বাঁচা যায়। সম্পদ ও শক্তির ভুক্তাবশেষ ছুঁড়ে দিয়ে নয়, দু'একজন-দু-চারজন নেতাকে আয়ত্ত্বের মধ্যে বশীভূত করে নয়, যথার্থ সমাধান এখানে সেই প্রভেদসমূহের কারণেই প্রার্থিত।

অন্যান্য শ্রেণী সংগ্রামে 'আমরা' আর 'ওরা' বেশ পরিষ্কারভাবেই নিশ্চয়কৃত, নিশ্চয়যোগ্য। সেখানে আমরা-র মধ্যে কোনও ওরা থাকে না। [যদিও 'কুইসলিং' সর্বাদাই ছড়িয়ে থাকে, ছড়িয়ে দেওয়া হয়!] কিন্তু নারী ও পুরুষের এই দ্বন্দ্বে, নারী স্বাধীনতার সংগ্রামে, আমরা-র মধ্যে ওরা পারিবারিক-সামাজিক ভাবেই ওতঃপ্রোত; এবং ওদের পাশে পাশে আমরাও।

দ্বিতীয়ত নারী কোনো না কোনো সামাজিক এককের, পরিবারের অংশ। দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই 'একক'-এ ফাটল অনিবার্য হবে। পরিবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের, নাগরিকদের সূতিকাগার। তাই ফাটল ভবিষ্যতকে চৌচির করে দেবে।

তবে এই সমস্যার একটা পরিসংখ্যানগত দিক আছে। আগেই উল্লেখ করেছি বিত্ত-বিভিন্নতার প্রেক্ষিতটি। কৃষ্টি ও শ্রমজীবী সমাজে অনটন আছে এতো বেশি, এতো তীব্র যে যেখানে জান্তব বাঁচার বাইরে মানুষী স্বাধীনতার বোধটি অঙ্কুরোদ্গমের সুযোগই পায় নি, পায় না। মধ্যবিত্ত সমাজের নিম্ন ও উচ্চবিত্ত এলাকা ধরে এই সমস্যার দিকচক্রবাল। এখানেও অভাব আছে, অনটন আছে; কিন্তু তার পরিমাণ এমন নয় যে শিক্ষিত-অনুভবের অভাবে স্বাধীনতার বোধটি অঙ্কুরিত হবে না; বরং বিপরীত অনুসিদ্ধান্তই স্বাভাবিক। এদের মধ্যে মানুষের মতো বাঁচার তাগিদ গড়ে উঠেছে, রুচি ও সৌন্দর্য এদের হাতছানি দেয়, এরা কম বেশি শিক্ষার আলোকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতকে নিজেদের মতো করে দেখে দিতে শিখেছে। তাই এদের অদম্য আকর্ষণ স্বাধীনতার প্রতি, বিশেষ করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি। ভোগ্য-ভোক্তা পণ্য-প্রধান সমাজে তাই এদের প্রয়োজন লাল পাড় শাড়িতে আর সীমাবদ্ধ নেই, থাকতে পারে না। কাগজে আর টেলিভিশনে এদের রুচি, প্রয়োজন ও চাহিদার জগৎ-কে সমুদ্র-পরিবর্তনে পাল্টে দিয়েছে, দিচ্ছে।

নারী সমাজের এরা কতটুকু অংশ? এই প্রশ্ন যিনি তুলবেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে পরিসংখ্যান শুধুমাত্র পরিমাণের কথাই বলে না; বিজ্ঞান হিসেবে সে সংখ্যাতত্ত্বের তাৎপর্য, অর্থ, বিন্যাস এবং ঝোঁককেও সামনে তুলে ধরে। গুণগত দিকটিকে চোখ-বন্ধ-করে থাকলেই আর কিছু অস্বীকার করা যায় না। অবস্থার সুযোগ নেওয়া যায় মাত্র সাময়িক ভাবে। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর নারীরা আজ স্বাধীনতা চাইবার মতো অবস্থায় নেই বলে কাল তারা সে অবস্থায় আসবে না এটা কোনও যুক্তি নয়; যেমন এটাও কোন যুক্তি নয় যে যে চায় নি সে পাবে না। পাবে সে পাবার যোগ্যতায়; অথবা পাওয়ার মধ্যদিয়েই সে যোগ্য হয়ে উঠবে। আর অন্য প্রান্তে সুউচ্চবিত্ত মহিলাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই কারণ উপসত্ত্বের সম্ভারে, সেখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 'পলিউশনের' পর্যায়ে পৌছে গেছে। প্রকৃত স্বাধীনতা তাঁদের নেই, আছে বিকৃত স্বাধীনতা, স্বৈর-স্বাধীনতা!

এবারে মধ্যবিত্ত সমাজের মহিলাদের আরও দুটি সমস্যার কথা উল্লেখ করব। এক, উপার্জনের অধিকার পুরুষেরা তাদের মনের দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত হয়ে স্বীকার করে নিলেও, ব্যাঙ্কের অধিকারটি সর্বথা হস্তচ্যুত করতে চান না। এবং দুই, গৃহকর্মবন্টনে প্রথাসিদ্ধ নীতিটি কায়-মনে আঁকড়ে থাকতে চান। এই যুদ্ধ অশ্রুসিক্ত নয়, রুধির ক্ষরণে ক্লিষ্ট।

একদিকে সংস্কার, সম্মান অন্যদিকে অর্থের সম্ভাব্য যোগান, স্বচ্ছলতার হাতছানি; সংসারের কর্তা দ্বিধাগ্রস্ত মনে দ্বন্দ্বের সমাধান করেন অনেক নীতিকথা আর কথামালার জাল বুনে বুনে। নিজেদের ঠকান, মহিলাদেরও ব্যবহার করেন। একদিকে আধুনিকতার বুলি আউড়ে যান অবলীলায় অন্যদিকে সনাতন বিধি-বিধানের নীতিনিষ্ঠতার আদর্শ তুলে ধরেন অনায়াস ভঙ্গিতে। চাকুরি বা ব্যবসা-বাণিজ্যে রত এই সব মহিলারা কিছুদিন আদর যত্ন, দেখাশুনা এবং চা-টিফিনের বরাদ্দে হৃষ্টচিত্ত দশটা-পাঁচটা করেন। অর্থের যে আগমটুকু ঘটে তা 'আপনি আগে তুমি আগে' ভব্যতায় ভাগ-বাঁটোয়ারা হতে থাকে। একদিন সংসারের বিরাট আয়-ব্যায়ের হাঁ বোঝাতে প্রায় পুরো আয়টাই কর্তার অধিকারে চলে যায়, অথবা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়। তখন 'আয়ের অধিকার তোমার, ব্যায়ের অধিকার আমার' — এই নীতিতে আর্থ-স্বাধীনতার ভরাডুবি ঘটে যায়। আর যদি কোনও সচেতন মহিলা স্বোপার্জিত অর্থের বন্টন ব্যবস্থাটি স্বহস্তে ধরে রাখতে চান তাহলেই সমূহ বিপর্যয় সূচনা হয়ে যায়। স্বার্থ বড় বালাই! অধিকার স্বাধিকারের সংগ্রামে পরিবারের অবশিষ্ট শান্তিটুকু নানাবিধ কূট জালে জড়াতে জড়াতে বহুবিধ বিভ্রান্তির উৎস হয়ে দেখা দেয়। 'মেয়েদের চাকরিতে পাঠিয়ে লাভ কি?' এই প্রশ্ন তখন ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের খতিয়ানে 'ডেবিট-ক্রেডিটের' পাই-পয়সা পর্যন্ত বিশ্লেষিত হতে থাকে। সময়টা বাইরে কাটায় বলে সংসারের কাজে লাগে না, অর্থটুকু নিজের অধিকারে থাকে বলে সংসারের কোনও কাজে লাগে না। সেই মহিলা উপার্জিত অর্থ যদি ছেলের স্কুলের ফি, বইকেনা, বাসভাড়া, শ্বশুরের চিকিৎসা স্বামীর সুটেও খরচা হয় তাহলেও তা সংসারের কাজে লাগে না! কারণ সংসারের স্বার্থ তো কর্তার হাতের টাকায়, কর্তার হাত দিয়ে খরচা করা টাকাতেই, একমাত্র সিদ্ধ হতে পারে! অর্জিত অর্থ কিভাবে এবং কোন খাতে খরচা হল সেটা বড় কথা নয়, কে খরচা করতে পারল, খরচার খাতগুলো কে নির্ধারণ করতে পারল সে সবই বড় কথা। তাই সংঘাত, মনকষাকষি, অশান্তি এবং ইত্যাদি।

দুই, পুরুষরা অর্থোপার্জনের দিনান্তে গৃহে ফেরেন আরামের জন্যে, বিশ্রামের জন্যে, দিনান্ত খাটাখাটুনি অবসানে নিশ্চিন্ত অবসর যাপনের মানসে। সকালে তাদের 'বেড-টি'র সঙ্গে খবরের কাগজটি অবশ্যই চাই। বিলম্বিত প্রভাত তাদের জন্যে অত্যন্ত অল্পসময়ই অবশিষ্ট রাখে অফিস যাবার প্রাক্-প্রস্তুতি পর্বে। তাই ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া বা গৃহের ইতি-উতি কাজে খরচা করার

মতো অবকাশ তাদের কোথায়? অফিস থেকে বিলম্বিত প্রত্যাবর্তন, ট্রাম-বাস-ট্রেনের ভিড়-জ্যাম-লেটের পীড়নে প্রাণবায়ুটুকু বাষ্পীকরণ করে তারা গৃহের শ্যামল শান্তিতে ফিরে এসে হাস্ ফাস্ করতে থাকেন। অন্যের হাতে হাত-পাখা চালনায় তারা অত্যন্ত প্রীত বোধ করেন, চা-এর ব্যবস্থাটি যদি ট্রেতে সুসজ্জিত হয়ে কিছু চর্বণযোগ্য অনুসঙ্গ সহ হাজির হয় তাহলে স্মিত হাসিটি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে ট্রাম-বাস আর কলকাতার গল্প বলতে পারেন, অথবা স্থানীয় এবং বৈদেশিক রাজনীতি নিয়ে, সমাজনীতি নিয়ে বিচরণের দায়দায়িত্ব পালন করতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

অন্যদিকে মহিলাদের দিন শুরু হয় উষাকে আবাহন করে, সন্তানদের খিদ্‌মদ্‌ খেটে, স্নানান্তে ভিজে চুলে (পুরুষরা পূত-স্নাত স্ত্রীদের দিকে বিছানার অনুভূমিক অলস শয্যায় মুগ্ধ দৃষ্টি ফেলতে বড়ই প্রীতি বোধ করেন!) চা'এর কাপ বা ট্রে হাতে কাছে এসে সুখ-ঘুমটুকুর সুখদ সমাপনে সাহায্য করবেন। রান্না ঘরের দায়দায়িত্ব, শ্বশুর মশাই-এর জন্যে বিধিমতো প্রাতঃকালীন জলখাবারের বন্দোবস্ত ননদের সঙ্গে দুটি মিষ্টি কথা সেরে, প্রায়শই বিলম্বে উপস্থিত 'ঝি'-এর কাজ কিছু স্বহস্তে সমাপন করে যখন স্বামীর সঙ্গে খাবার টেবিলে বসবেন তখনও 'রুমাল কোথায়? আমার এটা পাচ্ছি না তো? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান করতে ছুটে যেতে হবে। সেই সঙ্গে যাদের স্কুলগামী সন্তান আছে তাদের মা'য়েরা বই-খাতা-পেন্সিল থেকে ছেলেমেয়ের টিফিন-কৌটো পর্যন্ত টায় টায় গুছিয়ে দিয়ে, নাকে মুখে চাড্ডি গুঁজে ছুটবেন ট্রেনের বা বাসের জন্যে। তখন প্রায় দেরির পরিমাণ লাল দাগ ছুঁই ছুঁই।

বিলম্বিত প্রত্যাবর্তন অকারণ অনেক সন্দেহের কারণ তাই এরা ফিরবেন উর্ধ্বশ্বাসে। তাছাড়া বিকেলের ঝঞ্ঝাটও তো সংসারে কম নয়। ছেলে-মেয়েরা সময় মতো বাড়িতে এলো কিনা, বৈকালিক সেরে শ্বশুর মশাই চা না পেলে বাড়ি মাথায় করবেন, সারাদিনের অনুপস্থিতির সময়ে শত যন্ত্রণায় এবং শতেক সন্তান-দুষ্টুমিতে শাশুড়ি ঠাকুরুণের অনেক নালিশ জমা হয়ে আছে — সে সব সময় মতো ব্যবস্থা না করলে তার মুখটি হাড়ি পাকা হয়ে থাকবে ছেলে ফিরে আসা পর্যন্ত। আরো সহস্র বিষয় আছে ; জলখাবার থেকে বিকেলের রান্না এবং সব সেরে রাতের বিশ্রাম আর একটা দিনের সংগ্রামের পাথেয় সংগ্রহের জন্যে। সন্ধ্যার পরে পাড়ার ক্লাবে তাস খেলতে খেলতে যদি বিলম্ব হয়েই যায় তা হলে কি করা যাবে, রাতের অবশিষ্টাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাছাড়াও তো পুরুষদের আড্ডা আছে, মিটিং আছে সামাজিক সমস্যা সমাধানে সময় দেবার আছে, আছে পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার প্রয়োজন। তাই মহিলাদের অনন্ত অবসর পুরুষের অপেক্ষায় নিয়োজিত হবে এটাই স্বাভাবিক!

কিন্তু কেন? কেন এমন পক্ষপাত? ঘরে বাইরের সনাতন জীবন যাপন পদ্ধতিতে এটাই প্রথাসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলা যায় একধরনের ক্রীতদাসী মনোভাব ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে পুরুষের মনে শক্তি ও সম্পদের মালিকানায়। সমকক্ষ অংশীদারিত্বের মনোভাব কবে কখন যেন অবসিত হয়ে যায়। বসুন্ধরা পুরুষের জন্যে বাহুভোগ্যা এবং বহুভোগ্যায় পর্যবসিত হয়। সেই প্রথার রেশ সমাজদেহের সর্বত্রই নানান রূপে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চলমান বহমান থেকে গেছে। জীবন যাপন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে, যন্ত্রসভ্যতাব প্রভাবে দৃষ্টিভঙ্গি সরে গেছে অনেক অনেক বিষয়ে, কিন্তু নারীকেন্দ্রিক মানসিকতার হেরফের হয় নি। কাজের ভাগবাঁটোয়ারা অতীতের সমাজব্যবস্থায় যেমন ছিল সেটাই আঁকড়ে রাখা হয়েছে, নবতর বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যের প্রচেষ্টা

হয় নি, হতে গেলে অহং বাধা দিয়েছে, স্বার্থপরতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

এমন কি পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক রুচি এবং জীবন বোধের ঘনঘন উদ্ধৃতিদাতারা পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে যাঁরা পূর্বের জীবন যাপন করেন তাঁরাও এই কর্মবিভাজন এই মিলেমিশে সংসার সামলানোর দায়ভাগের বিষয়টিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে যান। এখানে সনাতনই স্বর্ণ, ওল্ড ইজ গোল্ড — নীতি প্রযোজ্য: নহিলে কষ্ট বাড়ে!

চারদিকেই কুঞ্চিত দৃষ্টি, নিঃশব্দ হৈ চৈ অনুভব করতে পারছি! সব দোষ এবং সকল দায় পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে বাহবা নেবার চেষ্টা বলে মনে হতে পারে। অবৈধ সামান্যীকরণ? একপেশে সিদ্ধান্ত? বিজ্ঞানের যে কোনও ক্ষেত্রেই বিশেষ করে মানুষ কেন্দ্রিক বিজ্ঞানে, সামান্যীকরণ দোষযুক্ত হতে বাধ্য -- সম্ভাব্যতার ভাষা, পরিসংখ্যানের ভাষাই বিজ্ঞানের ভাষা। তা সত্ত্বেও সামান্যীকরণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। দ্বিতীয়, অনুপপত্তি বা ব্যতিক্রম উল্লেখ করে এই দোষ খণ্ডন করার চেষ্টা করা যায়; এবং তৃতীয়ত অধিকাংশ বিষয়ে যা সত্য তাকেই সামগ্রিকতা বা সামান্যতা দেওয়া হয়ে থাকে।

যে পরিমাণ এবং গুণের স্বাধীনতা পুরুষ নিজে যথার্থ বলে নিজের সম্পর্কে প্রয়োগ করে সেই পরিমাণ ও গুণের স্বাধীনতা নারীদের সম্পর্কে তাঁরা স্বীকার করেন না; আলোচনার টেবিলে বসে যদিও বা তত্ত্বগতভাবে দিতে সম্মত হবেন, গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর 'পুনর্মূষিকভব' হয়ে দাঁড়াবেন। স্বার্থ বড় বালাই। ভোগের অধিকার অবচেতনের এবং অনেক ক্ষেত্রে সচেতন স্তরেও, গভীরে প্রোথিত হয়ে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও যেমন সত্য কর্মবিভাজনের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। যেটুকু ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা আপেক্ষিক মাত্র! মা-মাসির উপস্থিতিতে কজন পুত্র-পিতা রান্নাঘরে স্ত্রীকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাবেন? কজন থালা বাসন গোছাতে পরিষ্কার করতে সচেষ্ট হবেন? অহং, আত্মমর্যাদাবোধ, পৌরুষ এবং 'পাছে লোকে কিছু বলে' পথরোধ করে দাঁড়ায়।

সেখানেও প্রধান প্রতিবন্ধক সেই মা-মাসি, সেই নারীরাই। পুরুষ বাস করছে অতীতের সনাতন আচার-আচরণ বিধি বিধান মেনে নিয়ে। বর্তমানের সুযোগ সুবিধাগুলোর সর্বস্বত্ব স্বাধিকারে রেখে, গাছের খাওয়া এবং তলারও কুড়োনোর অপরূপ ব্যবস্থায়! নারীরা অপরদিকে, আধুনিক উন্মুক্ত জীবনের গতি-প্রকৃতিতে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করে চলেছে এবং অতীতের বিশ্বাসের বোঝা কাঁধে নিয়ে ন্যুব্জ দেহ কুব্জপৃষ্ঠ হয়ে প্রতিযোজনার আর সামঞ্জস্যের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা গাছেরও সবটা পাচ্ছে না, তলারও সবটা পাচ্ছে না; অতীত এবং সনাতন জীবনের শান্ত-স্থিরতা হারিয়ে ফেলেছে বর্তমানের স্বাধীনতার জন্যে অসীম মূল্য দিয়ে চলেছে।

দলছুট আছেন; তাঁরা বাইরেটাকে আকণ্ঠ উপভোগ করছেন, স্বাধীনতাকে 'পারমিসিভ' করে নিয়েছেন, এবং গৃহকে স্বল্পক্ষণের স্বল্পখরচা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করে চলেছেন; এঁরা দোলকের পুরুষ-প্রান্তীয় অবস্থানে উৎক্ষিপ্ত মহিলা। যেসব দোষের বিরুদ্ধে এঁদের প্রতিবাদ অবচেতনের স্রোতাকর্ষণে নিজেরাই যে সবে জড়িয়ে গিয়ে স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচার এবং যথেচ্ছাচারে পৌছে দিয়েছেন।

তাহলে সমাধান কোথায়? শুরু কোথায়? পদ্ধতি কি হবে? কেমন করে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করেই নারী স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিতদের নেতাদের এবং বিদগ্ধজনদের দেবার কথা। আমার যা মনে হয় তা এখানে তুলে ধরছিঃ

শুরু হোক পরিবার থেকেই। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে বিভেদ-বীজটি বপন না করে সমতার

ধারণাটি উপ্ত করা হোক। প্রধান দায় মহিলাদের, মায়ের। সমর্থনের দায় পুরুষদের, পিতার। ছোট বড় নিষেধের গণ্ডি কেটে কেটে ভবিষ্যতের পরগৃহে রান্নাঘরের সেবিকা হিসেবে কেটে ছেঁটে সকাল বেলাতেই এক দলকে পঙ্গু করে দেবেন না।

দুই, স্বাধীনতার বিষয়টিকে - আর্থিক এবং সামাজিক — সহজ স্বাভাবিক রেখে শান্ত এবং সংহত দিন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ুন। এবং সন্তানদের চেতন-অবচেতনে সংগ্রাম-সংঘর্ষের ছবিটি পাকা করে এঁকে দেবেন না। অর্থের ব্যয়ের অধিকার ভাগ করে দিন, কাজের দায় বন্টন করে নিন, লোক ভয় ত্যাগ করুন। সন্তানদের সুস্থ এবং সমতার বাতাবরণে বেড়ে উঠতে দিন।

তিন, সমান ভাবে জীবন যুদ্ধে সামিল হতে দিন, সমান শিক্ষা এবং সমান সুযোগ দিয়ে। যার যার পরিবার সে বেছে নিক ; সাহায্য চাইলে সাহায্য দেবেন। সকল অভিভাবকরাই মাতা-পিতারাই — তাঁদের সন্তানদের ভালর জন্যে সবই করেন : ওদের ভালটা ওদেরই করতে দিন, বুঝে নিতে দিন। 'নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করছে' মনে হলেও জানবেন সেটা আপনার মনে হওয়া, যার পা সে অন্যরকম ভাবতেই পারে।

চার, এখন থেকেই যদি আমরা পুরুষেরা স্বার্থ এবং অহং-কে ত্যাগ করতে না শিখি তাহলে ওরাই আমাদের একদিন ত্যাগ করে যাবে। আর আমরা মেয়েরা যদি দোলকের গতিকে স্বাধীনতা-স্বাধিকারের প্রান্তে স্বাভাবিক ক্রম-উত্তরণে পৌঁছে দিতে না পারি তাহলে যথেচ্ছাচারের তাপে এবং চাপে আবার আমরা পুরুষ-যথেচ্ছাচারের শিকার হয়ে যাব।

স্বার্থ ছাড়া ব্যক্তি হয় না। ত্যাগ ছাড়া মানুষ হওয়া যায় না। সে নারীই হোক, অথবা পুরুষই হোক। এই ত্যাগের জন্যে চাই বিশ্বাস। পারস্পরিক বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা। আর এই সব কিছুর মূলে একটা ইচ্ছা থাকা চাই। সেই ইচ্ছাটা আছে তো?

এমন জানলে....

বিন্দুবাসিনীর কথাগুলো আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। বেদনা মাখা তার শেষ কথাগুলো বিন্দু আর শেষ করতে পারছিল না। ডান হাতে আঁচল তুলে নিয়ে চোখের কোণ মুছতে মুছতে বলেছিল--এমন জানলে এখানে আমি আমার ছেলের বিয়ে দিতাম না। কতো ভালো ভালো মেয়ে দেখলাম কিন্তু শেষকালে কি যে হলো আমার! বিন্দুবাসিনী থেমে গেছিল। অনেকক্ষণ আমরা সামনা-সামনি চুপ করে বসেছিলাম। তার পরে একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম—আজ আমি উঠি বিন্দু, তুমি একদিন সময় করে আমার ওখানে যেয়ো। অনুশোচনা কাতর বিন্দুকে একা রেখে সেদিন আমি বেশ ভারি মন নিয়েই চলে এসেছিলাম।

বিন্দুবাসিনী আমার ছোটোবেলার বন্ধু। স্কুলে-কলেজে আমরা ছিলাম হরিহর আত্মা। তারপরে বিন্দুর বিয়ে হয়ে ছাড়াছাড়ি। সেও বেশিদিনের নয়। বিন্দু বলেছিলো—দ্যাখ্ প্রীতি, যতো তাড়াতাড়ি হয় আমি তোর একটা ব্যবস্থা করে ফেলবো। কিরণময়ের কোনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর গলায় তোকে ঝুলিয়ে দেবো। তা, বিন্দু মহীতোষকে পাকড়াও করে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিতে বলেছিলো—শোনো মহীতোষ, এই হচ্ছে আমার প্রীতি, তোমাদের প্রীতিকণা। মহীতোষ বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে প্রশ্ন করেছিল—তোমাদের মানে? বিন্দু কিরণের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিলো মাত্র। কিরণ বলেছিলো—ক্রমশ প্রকাশ্য। সে সব কতোদিন আগের কথা, কতো আনন্দ আর উচ্ছলতায় মাখামাখি দিনের কথা।

আর আজ? দুবছর ধরে বিন্দু ছেলের জন্যে মেয়ে খুঁজেছে হন্যে হয়ে। ছবি দেখে বাতিল করেছে, চিঠি পড়ে অপছন্দ করেছে, আবার কোনো বাড়িতে ঘরদুয়োর দেখেই সম্ভাবনা নস্যাৎ বলে রায় দিয়েছে। পুত্রবধূ অন্বেষণে কিরণ সঙ্গ দিয়েছে কিন্তু নাক গলায় নি। বিন্দুই নাক গলাতে নিষেধ করেছে কিরণকে। বিন্দু বলেছে-বউ নিয়ে ঘর করতে হয় শাশুড়িকে, শ্বশুরকে নয়। তাই সুন্দর মুখ দেখে শ্বশুর ভুলে যেতে পারে, গৃহকর্ত্রীকে অনেক দেখে শুনে বউ খুঁজে আনতে হয়। বিন্দু তাই দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে খুঁজে তবে শ্রীলাকে পছন্দ করে ঘরে এনেছে। সে সবই বিন্দু সবিস্তারে আমাকে বলেছে।

শ্রীলা সুন্দরী নয়, সুশ্রী। অনার্স গ্রাজুয়েট, গান জানে, নাচের তালিম নিয়েছে বাল্যে কৈশোরে। বেশ চটপটে এবং ভালো কথা বলে। বিন্দুর খুবই ভালো লেগেছিলো। বিজয়ের সঙ্গে বেশ ভালো মানাবে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিলো। শ্রীলার মা-মাসি বাবা-কাকাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে সেই ভালো লাগাটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছিলো।

তিন মাস যেতে না যেতেই বিন্দুর মোহভঙ্গ হয়েছে। অনুশোচনায় হাত কামড়াচ্ছে আর একান্তে চোখের জল ফেলছে। আমাকে একা পেয়ে বিন্দু মনের কষ্ট-যন্ত্রণা প্রকাশ করতে বলেছিলো — বাইরে থেকে দেখে মেয়েদের আর আজকাল একেবারেই বোঝা যায় না রে প্রীতি! আমার ছেলে শিক্ষিত, তাই শিক্ষিতা মেয়ে আনলাম। এখন দেখছি লেখাপড়া না-জানা গ্রাম্য মেয়ে আনলেই ঠিক হতো। আমি বলেছি — লেখাপড়া জানাতে আবার কি হলো? বিন্দু তেতে উঠে বলেছিলো — তিনি এখন চাকরি করবেন বলে মনস্থ করেছেন যে! নিজের পুত্রবধূর প্রতি আপনি-আজ্ঞেতে বুঝে গেলাম বিন্দুর উত্তেজনার পারা কোন্ বিন্দুর দিকে উঠে আছে। তাই খুবই ঠাণ্ডা গলায় বলেছি — তা, লেখাপড়া জানা মেয়ে, আধুনিকা; সে তো চাইতেই পারে। বিজয় কি বলে? বিন্দুর তাপ আর এক ধাপ বেড়ে গেলো। বললো — বিজয় আবার কি বলবে? তার তো তলে তলে সায় আছে। সংসারের নাকি সচ্ছলতা বাড়বে আর বৌয়ের নাকি দায়দায়িত্ববোধ বাড়বে। আমি বলেছি সে কথা তো মিথ্যে নয় বিন্দু। তাছাড়া এখন তো আর কোনো মেয়েই অষ্টপ্রহর ঘরের মধ্যে আটকা থাকতে

চায় না। ওদের রান্নাঘরের বোধটা তো আর আমাদের মতো নেই।

বিন্দু যে আমার কথায় মনে মনে চটে উঠছিলো তা বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল না। নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে বলেছিলো — দ্যাখো প্রীতি, আমি সবই বুঝি। আসলে আজকালকার মেয়েরা সংসারের বন্ধনটা বাদ দিয়ে সংসার করতে চায়। বাইরেটাই ওদের টানে। সংসারের লাটাইতে ওরা স্বামীর সুতোয় ভর করে নিশ্চিত আকাশে উড়তে চায়।

বিন্দুর কথায় এবারে আর কোনো উত্তর দিলাম না। মনে মনে ভাবলাম — সংসারের এই 'আমি সব জানি, সব বুঝি' যে কতো ক্ষতি করে তার কোনো লেখাজোখা নেই। আমরা সকলেই এই জানা-বোঝার শিকার। বহুবারই তো জীবনে এই জানা-বোঝার কারণে আমরা প্রত্যেকেই কষ্ট-যন্ত্রণা পেয়েছি। ছোট ছোট সমস্যা ক্রমশই বেড়ে বেড়ে তাল হয়ে উঠেছে। তারপরে সমস্যার যেমন তল খুঁজে পাই নি, জীবনেরও তালভঙ্গ ঘটেছে। তবুও ......। আমার ভাবনায় বাধা পড়লো। বিন্দু বলে উঠলো — চুপ করে কি ভাবছো? ঠিক বলিনি?

প্রশ্নের খোঁচা খেয়েও চুপ করে ছিলাম। বিন্দুর সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছিল না। বিন্দু তো আর আমার মতামত নিয়ে তার সংসারের হাল চালাবে না: মনের দুঃখ প্রকশ করার জন্যে ও আমাকে শ্রোতা ঠিক করে নিয়েছে। তবুও বিন্দু যখন দ্বিতীয়বার আমার মতামত চাইলো তখন আমি বলেছি — ঠিক বেঠিক জানি না বিন্দু, তবে এটা বুঝি যে প্রত্যেক প্রজন্মের প্রত্যেক গৃহবধূর অধিকার আছে সেই প্রজন্মের ধ্যানধারণা বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর চাওয়া-পাওয়ার নিরিখে গৃহকে তৈরি করে নেবার। এই কাজটা কি সে বুড়ো বয়সে করবে?

বিন্দু চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বললো — আমিও তো তাই বলি। আমার সংসার, আমার স্বামীপুত্র পরিবার। আমার কথার একটা দাম থাকবে না? আমার মতো করে আমি সংসারটা চালাতে পারবো না? আমার সাধ আহ্লাদ আমার ধ্যানধারণা আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা এসব কিছুই নয়?

বুঝলাম ওয়েভ লেঙথ্ আলাদা হয়ে গেছে। আমি যা বলতে চাইলাম আর বিন্দু যা বুঝলো তা সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝে গেলাম যে 'সংসার' নিয়ে শাশুড়ি-পুত্রবধূর যে চিরন্তন বিরোধ তার মানসিক উৎসটিও এখানে, এই মানসিকতায়। সংসারটা আসলে কার? মালিকানার ঝগড়া — সব শাশুড়ির মনে এই প্রত্যয়টি দৃঢ়মূল বসে যায় যে সংসার তার। আবার নববধূর মনে এই বিশ্বাসটুকু দানা বেঁধে উঠতে থাকে যে তার সংসার তারই। বয়স্কা গৃহবধূ — যখন সে গিন্নি, মনে করে সমগ্রতেই তার অধিকার, মালিকানা। শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামী-পুত্র-কন্যা এমন কি নাতি-নাতনীদের নিয়েই তার এলাকা। গিন্নীর শ্বশুড়-শাশুড়ির, যদি তাঁরা তখনও বেঁচে বত্তে থাকেন তাহলে কোনো বিপত্তি ঘটে না কারণ তাঁদের বার্ধক্যদশাই তাঁদের হাত থেকে মালিকানা কেড়ে নেয়। মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানসিক অভ্যাসের চাপেই বোধহয় গিন্নি এই সর্ব-মালিকানার স্ববিরোধটুকু দেখতে পায় না। দেখতে না পাওয়াতে দোষ দেই না, কিন্তু বুঝতে না পারাটা অবশ্যই দোষের। নিজ নিজ মালিকানা গুটিয়ে নেবার সময়ে যদি তা না করা হয় তাহলে অনিবার্য বিরোধ ঘটারই কথা। যে সংসারে একই সময় বিন্দুতে তিনটি 'বধূ' উপস্থিত — বৃদ্ধা শাশুড়ি, মধ্যবয়স্কা গৃহিনী এবং তরুণী-যুবতী গৃহবধূ সেই সংসারে কার সংসার কোনটি? সময় মতো সময় ঠিক করে নিতে না পারলে বিপত্তির কারণ হবে না?

এসব কথার কিছুই বললাম না বিন্দুকে। বললাম — তোমার সংসারে তুমি সর্বেসর্বা হলে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার সংসার কতটা পর্যন্ত বিস্তৃত, কতদিন পর্যন্ত প্রসারিত এ

বিষয়গুলোও বোধহয় ভেবে দেখার মতো। আট-দশ বছরে বৌ হয়ে এলে সেই নববধূ অবশ্যই দীর্ঘ শিক্ষানবিশীর অপেক্ষা রাখে। সে শাশুড়ির সংসারে দীর্ঘদিন ধরে সদস্য হয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন? আধুনিক কাল এবং নববধূর বয়স, যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি গুণগত ভাবেই আলাদা হয়ে যায় নি?

বিন্দু প্রায় থামিয়ে দিয়েই বলেছিলো — তাতে কি নববধূ আর নববধূ থাকছে না? তাকে কি আর শিখে পড়ে নিতে হবে না? সংসার কি ছেলের হাতের মোয়া যে চাইলেই তা হাতে তুলে দেওয়া যাবে? এসব আবদার নয়? আমি বলেছি — দ্যাখো বিন্দু, এসব আবদার না অধিকার তা আমার জানা নেই। তবে এটা বুঝি যে সংসারটা সুখ শান্তির অঙ্গন, মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার কাছারি নয়, জয় পরাজয় নির্ধারণের প্রাঙ্গণও নয়।

ইন্দু আমার কথায় কি বুঝলো না বুঝলো তা আমি বুঝতে পারার আগেই ওর একটা ঘোষণা ছিটকে এলো — জানো প্রীতি, শ্রীলা এসেই আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে। কি সাংঘাতিক মেয়ে একবার ভেবে দেখো। উত্তর না দিয়ে আমি বাইরের আকাশের দিকে চোখ রেখে ভাবলাম্ — তিন মাসের মধ্যে পাঁচশো মেয়ে থেকে যোগ্যতমা শ্রীলা কেমন অনায়াসেই সাংঘাতিক মেয়ে হয়ে যেতে পারলো! কি কি দেখে শ্রীলাকে যোগ্যতমা মনে করেছিলো বিন্দু? কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেই বিবাহপূর্ব মূল্যায়নে? ভাবতে গিয়ে আমি প্রায় দিশেহারা হয়ে গেলাম। ছিল কিন্তু এখন নেই; শুধু নেইই নয় অন্যতর কিছু নিশ্চয়ই ঘটে গেছে বিন্দুর মনে, অন্যতর মূল্যায়ন অন্যতর নিরিখ অন্যতর আশা-আকাঙ্ক্ষা আসর জমিয়ে বসে এই অঘটন ঘটিয়েছে। শ্রীলার মনটাও অবশ্য তার প্রাক্ বিবাহ কুমারী জীবনের কল্প-চেতনায় আটকে নেই, থাকতেই পারে না। তার কল্পনার ভবিষ্যৎ যখন বাস্তবের বর্তমানে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে তখন তাকে এগুতে হয়েছে, হচ্ছে, পরিকল্পিত পথে। আগে থেকে দুজনের কেউ কি সেই অনাগত কিন্তু অ-নিবার্য-ভবিষ্যতের কথা ভাবে নি। বিচার করে নি, প্রস্তুত হয় নি?

স্বার্থপর, যাকে বলে এক নম্বরের স্বার্থপর। বিন্দুর কথায় আমি চমকে উঠেছিলাম। বিন্দু আরো বলেছিলো — স্বামী আর বাপের বাড়ি ছাড়া বৌ আর কিছুই বোঝে না, ভাবে না। সারাদিন আর যা যা করে তার সবই লোক দেখানো, না করলে নয় তাই। বিন্দু গজর গজর করছিল শ্রীলার স্বার্থপরতা আর স্বামীসোহাগ নিয়ে। বিন্দুর জন্যে আমার বেশ কষ্ট বোধ হচ্ছিল। বলা উচিত ছিল, বিন্দু তোমার মনের চোখে যে চশমাটা আছে তা তোমার দৃষ্টিকে যথেষ্ট স্বচ্ছতা না দিয়ে অনেক অকারণ অন্ধকারকেই তুলে ধরছে। কিন্তু বলি নি। বলি নি যে বিন্দু নিজেই নিজের কষ্ট-যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলছে, বিরোধকে সমূহ করে তুলছে। বলেছিলাম — তা তোমার বিজয় কি বলে? বিজয় কি শ্রীলাকে নিয়ে সুখি নয়, খুশি নয়?

এমন ভাবে বিন্দু আমার প্রশ্নটার দিকে তাকালো এবং এমন একখানা ভঙ্গি করলো যা দুতিন ঝুড়ি শব্দেও প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দেখলেই একমাত্র বিশ্বাস করা যায়। বললো — বিজয় যদি মানুষ হতো তাহলে কি আমার কপাল পোড়ে? ছেলে তো বৌ পেয়ে হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছে এমন একখানা ভাব! আজকালকার ছেলেরা যতো লেখাপড়া শিখুক না কেন আগের দিনের মতো পুরুষ হতে পারে ক'জন? বিয়ের আগেই এদের যতো হম্বিতম্বি; বিয়ের পরে সবাই বৌয়ের আঁচলধরা হয়ে পড়ে!

এক লহমায় অনেকটা অতীতে আমার দৃষ্টি চলে গেল। বিন্দু আর কিরণময়ের সংসার আমি অনেক কাছে থেকে দেখেছি, জেনেছি। সেই সব পুরোনো দিনের কয়েকটি ঝলক আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো — বিন্দু সে সব কেমন করে ভুলে গেলো? ভুলে গেলো, না কি সেই সব

দিনগুলোকে বিন্দুর নিজের বেলায় অত্যন্ত সহজ-স্বাভাবিক মনে হয়েছিলো বলেই এমন অনায়াসে আজ শ্রীলার বিষয়ে বিরুদ্ধ কথা বলতে পারছে? অথবা বিন্দুর চেতনায় এটা কোনো বিরুদ্ধতা বলেই মনে হচ্ছে না? বিন্দুর বেলায় স্বামী যেমন নিজের ছিলো তেমনি তিলে তিলে বড়ো করে তোলা ছেলেও ছিলো নিজের। বিজয় তাই বিন্দুর; শ্রীলা কেন সেই বিজয়ের উপর অধিকার ফলাতে চাইবে? বিন্দু থেকে বিজয়কে কেড়ে নেবে? আমার মনে হলো — বিন্দুর অধিকার বোধে — সেন্স আব পজেশনে — আঘাত লাগছে বলেই বিন্দু শ্রীলাকে সহ্য করতে পারছে না। এতো কথা বিন্দুকে বলা যায় না। তাই বলেছি — তোমার এলাকাটাকে একটু কেটে ছেঁটে ছোটো করে নিলে বোধহয় তোমার কষ্টটাও কমবে, ওদের জীবনটাও স্বাভাবিক হবে। তুমি ভেবে দেখো বিন্দু।

বিন্দু প্রায় ফেটে পড়েছিলো। বলেছিলো — কেন? আমি কেন আমার এলাকা ছোটো করতে যাবো? ঘর আমার সংসার আমার এবং ছেলেকে মানুষ করেছি আমি। যে সংসার গড়ে তুলতে হাড়কালি করেছি, জীবনপাত করেছি তা কি অনায়াসে অপরের হাতে তুলে দেবার জন্যে করেছি? এখন তো আমার ভোগ করার সময়, তুমিই বলো?

বেশ একটু থমকে গেলাম। কি বলবো বিন্দুকে তা তৎক্ষণাৎ ঠাহর হলো না। মনে মনে ভাবলাম — সংসার কি কোনো বস্তু-না-দ্রব্য যে তাকে 'তুলে' দেওয়া যাবে? সংসার তো একটা যৌথ জীবন যাপনের নীড়, আলয়। নীড় বা আলয় অংশটা প্রধান নয়, যূথবদ্ধ মানসিকতাটাই প্রধান। ঘর বাঁধতে যে কোনো গৃহ হলেই চলে, কিন্তু যে কোনো মন সেই ঘরের মধ্যে গৃহ-সংসার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাছাড়া ঐ ভোগ ব্যাপারটাও যথেষ্ট গোলমেলে বলে মনে হলো। ভোগ করার বাসনায় লাগাম পরাতে না পারলে উপভোগের বদলে দুর্ভোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। ভোগ কি মনে না দ্রব্যে? বিষয়ে না আশয়ে? বেশি বেশি করে ধরে রাখতে গিয়ে বিন্দু কি একটু একটু করে সেই নিবার্য দুর্ভোগের গহ্বরেই ঢুকে পড়ছে না? বিন্দুর সেই মনের অবস্থায়, এইসব কথা তাকে বোঝাতে পারব না। তাই মৌন থাকাই উচিত মনে করেছি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিন্দু কি ভাবলো তা সেই জানে, বললো — তা সেই আমার ভোগ করা এখন মাথায় উঠে গেছে। সকাল বিকেল সেই হাঁড়ি-হেঁসেল সেই ঘর-দুয়ার সেই সাবানকাচা-কাপড়শুকোনো। আমার সাধ আহ্লাদের জলাঞ্জলি, ওদিকে তিনি আজ এখানে কাল ওখানে পরশু সেখানে করে নিজের স্বামীটিকে ট্যাঁকে করে ঘুরে বেড়াবেন। কেন? আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি? এই শেষ বয়সে এখন ঝি-এর কাজ করবো বলেই কি এতো দিন সংসার করেছি?

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। বিন্দু বলে কি? বিন্দু কি তবে ছেলের বিয়ে দিয়ে একটি রাঁধুনী-কাম-ঝিয়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলো? নিজের জন্যে এবং সংসারের জন্যে? ভেবে আমি কোনো কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। বিন্দু নিজেকে ছোটো করে ফেলছে, পুত্রবধূকেও ছোট করে দিচ্ছে। অথচ সেই ব্যাপারটা একদম ভাবছে না। নিজে কি তাহলে স্বামী-শ্বশুরের সংসারে ঝি আর রাধুনীর কাজ করেছে? তা তো সে করে নি; নিজের সংসারের যাবতীয় কাজই তো সে নিজের কাজ বলেই করেছে? সগর্বে এবং সসম্মানেই করেছে। একই কাজ কেমন করে নিজে বধূ থাকা কালীন নিজের রইলো কিন্তু পুত্রবধূ আসতেই ঝি-এর কাজ হয়ে গেলো তা আমার মাথায় ঢুকলো না।এই কদিনের মধ্যেই, মাত্র দুতিন মাস আর কটা মাত্র দিনই বা — এইকটা মাত্র দিনের মধ্যেই বিন্দু এতোখানি বিরক্ত বিক্ষুব্ধ বিধ্বস্ত হয়ে গেল কি করে? বর-কনে অবস্থাটা তো একদিনের দুদিনের ব্যাপার। তার পরে ছেলে-ছেলের বৌ হয়ে পুত্র-পুত্রবধূ হয়ে কটা দিন তো ওরা নিজেরা

নিজেদের পরস্পর বোঝাবুঝির জন্যে চাইতেই পারে। কত্তা-গিন্নী হয়ে উঠতে অনেক অনেক সময় পড়ে আছে। তা, বিন্দু তার ছেলে ছেলের বৌকে একেবারেই কোনো সময় দিতে চায় না। কেন? বেনারসী ছেড়ে রেখেই কি বৌকে রান্নাঘরে পাঠাতে চেয়েছিলো বিন্দু? যদি নিজের মেয়ে শ্বশুড় বাড়ি থেকে ফিরে এসে এমতো ব্যবহারের কথা মাকে বলতো? মূল্যায়ন নিরিখের এমন নির্লজ্জ দ্বিত্ব আকছার দেখতে পাওয়া গেলেও এমন ডবল স্ট্যানডার্ড অনবরত ঘটলেও আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করি, মনে মনে ভারি একটা কষ্ট বোধ করি।

নিজের মনের কোনো কথা না বলে বিন্দুকে বলেছি — দুটো দিন ধৈর্য্য ধরো, কটা দিন ওদের আনন্দফুর্তি করে নিতে দাও তার পরে দেখবে নিজেই কেমন সংসারে ঢুকে পড়বে। বিন্দু একপলক আমাকে চোখে-বিঁধে রেখে বললো — ওই বৌ সংসার করবে? শ্রীলা? তুমি আমাকে আর জ্বালিও না প্রীতি। হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই বোঝা যায়। বৌদের একটা দিন দেখলেই বোঝা যায়। ওই মেয়ে কোনোদিনই সংসার করবে না এই আমি তোমাকে বলে দিলাম।

আমি একেবারেই চুপসে গেলাম। বিন্দু এতোই উত্তেজিত যে ভাতের সিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে অনায়াসে বৌ-এর, একটি নারীর, সংসারে যোগ্য-হওয়ার সিদ্ধ সফল হওয়ার তুলনা করে বসলো! বিন্দু কি শ্রীলাকে আলুবেগুন উচ্ছে-মুলোর মতো মনে করে বসলো? তা নিশ্চয়ই করে নি। তাহলে ওর মনে এমতো যন্ত্রণার কারণ কি হতে পারে? তাহলে কি বিজয় শ্রীলাকে পছন্দ করে, বিজয় বৌকে পেয়ে সুখি, বিজয় একটা নতুন আকাশ খুঁজে পেয়েছে শ্রীলার মধ্যে বলেই বিন্দু ক্রমাগত উত্তেজিত হয়ে উঠছে? জন্মমুহূর্ত থেকে এই এতোবড়োটি হতে হতে বিজয় বরাবরই মায়ের মনের স্নেহের সবুজে তুষ্ট থেকেছে, ভালোবাসার আকাশে তৃপ্ত বোধ করেছে। শ্রীলা এসে বিজয়ের সবুজে আর মনের আকাশে আলোড়ন তুলে দিয়েছে। এটা জৈব জীবনে প্রকৃতির বিধান, চিত্ত-জীবনে অন্তরের আকর্ষণ। এই সত্যকে বিন্দু কোন মন্ত্রে উলটিয়ে দিতে পারে? কোন শক্তিতে অন্যথা ঘটাতে পারে? আর কেনই বা সে তা করতে চাইবে? প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধে গেলে যা হয়, তাই বিন্দুর ভাগ্যে জুটছে। খুবই কষ্ট হলো বিন্দুর জন্যে। বললাম — শ্রীলা কি রান্নাবান্না করতে চায় না, পারে না?

আমার প্রশ্ন শুনে বিন্দু একটু নড়ে চড়ে বসলো। বললো — চায়ও, পারেও। আমি বললাম, তাহলে? বিন্দু চোখ কপালে তুলে বলেছিলো — তিনি নাকি বইয়ের রান্না পারেন, আর পারেন বিশেষ বিশেষ পদ! কাঁড়ি কাঁড়ি খরচা করে রান্না করলে সে তো ভালো হবেই, সবাই খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবে। কিন্তু সংসার তো শুধু শনিরবিবারের ব্যাপার নয় যে সারা মাসের খরচা দুচারটি খাবারেই শেষ করে দিতে হবে! আটপৌরে রান্নায় একদম যাবে না; শিখেছে নাকি যে যাবে? কুটনো কুটতে হাত কেটে যাবে, মশলায় নখের পালিশ নষ্ট হয়ে যাবে — আরও কি কি হবে তার বিতং চাইলে সেই বৌকেই জিজ্ঞেস করতে পারো!

বিন্দু থেমে গেল। আমার কানের মধ্যে বিন্দু যেন বেজেই চললো। অতীতের বিন্দু এবং বর্তমানের বিন্দু। বিন্দুর মেয়ে — একই মেয়ে বিন্দুর — জয়া। বিজয় থেকে প্রায় আট বছরের বড়ো। এখন জয়া ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে। মায়ের কথা অবশ্যই তার মনে পড়ে কিন্তু মায়ের কাছে আসতে সময়ে টান পড়ে যায়। কমই আসে এখন। অথচ সেই জয়ার বিয়ের পরে বিন্দুকে আমি দিনের পর দিন দেখেছি। কী অসীম যন্ত্রণায় বিন্দু ছটফট করছে। জয়ার শাশুড়ির বিষয়ে বিন্দুর মূল্যায়ন যে কোনো নারীকে লজ্জিত করতে পারতো। তখনও আমি বিন্দুকে বিশেষ কিছুই বলতে বোঝাতে পারি নি। বিন্দু নিজের মেয়ের দুঃখ কষ্টের কথা বলতে বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠতো, যেন সে জয়ার শ্বশুর বাড়ি গিয়ে জয়ার শাশুড়িকে দুকথা বেশ করে শুনিয়ে

দিয়ে আসতে চায়। ঝগড়া করে তার ভুলগুলো শুধরে দিয়ে আসতে পারলেই যেন বিন্দুর শান্তি হতো মনে। অথচ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই বিন্দুই অন্য সুরে জয়ার শ্বশুর শাশুড়ির বিবরণ দিয়েছে। আর এখন নিজের বেলায় বিন্দু সেই অতীতের বিন্দুবিসর্গও মনে রাখে নি। কে জানে এটাই স্বাভাবিক কিনা।

তুমি জানো না প্রীতি — বিন্দুর কথায় আমি উৎকর্ণ হয়েছি — আজকালকার এইসব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়েরা চাকরি করতে চায় শুধু স্বাধীন থাকতে চায় বলে। আর্থিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা আর যা খুশি তাই করার অবাধ স্বাধীনতার জন্যে এরা মনে মনে তৈরি হয়েই থাকে। সংসারে এদের মন আছে নাকি যে এরা সংসারী হবে? শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি এদের কোনো টান আছে নাকি যে এরা ঘরে থাকতে চাইবে? বিন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যথাপূর্বম শ্রোতা হয়েই থাকলাম। বিন্দু কিছু বললেই আমি তার বেদনার উৎসটির সন্ধানে মৌন অনুসন্ধান চালাই। বিন্দু বলে গেলো — মা-বাবা মেয়েদের আদর দিয়ে মাথায় তোলে। মেয়েরা যতো বড়োই হোক না কেন মা-বাবার কাছে খুকিটিই থেকে যায়। পড়াশুনো করিয়ে দিগগজ বানায় কিন্তু রান্নাঘরের চৌকাঠ পার হতে দেয় না। নাচ-গান স্কুল-কলেজ রঙ-তুলি করে করে এক একজন মা সরস্বতীর বরকন্যা তৈরি হবে। তার পরে যখন বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবে তখন চোখের জল ফেলে ফেলে বলবে — সংসারের কিছুই জানে না বোঝে না বাবা, একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিও। আজন্ম লক্ষ্মীর অর্চনা আরাধনার কোনো ব্যবস্থা না রেখে এদের চাপিয়ে দেয় আমাদের মতো ছেলের মায়েদের ঘাড়ে। এরা গৃহলক্ষ্মী হবে কি করে?

আমার হঠাৎ মনে হলো এইসব বিন্দুর মনের কোনো গোপন ঈর্ষার প্রকাশ নয় তো? কোনো অবদমিত কামনা বাসনার বিকৃত প্রশ্ন? ভাবলাম — স্বাধীনতা কে না চায়? বিন্দু যেভাবে সংসার জীবন যাপন করেছে তাতে তার স্বাধীনতার অভাব ছিল বলে তো আমার জানা নেই। তবে আজ তার পুত্রবধূকে দেখে হয়তো তার মনে হয়েছে যে স্বাধীনতা শ্রীলা ভোগ করছে ঠিক সেই রকমের স্বাধীনতা বিন্দু নিজে ভোগ করতে পারে নি। কারণ নিয়ে বিন্দুর মাথাব্যথা নেই, অবস্থা দেখে সে হয়তো অনুতাপ বোধ করছে। আবার এমনও হতে পারে যে স্বাধীনতার অনুভবে নয় সময়ই তার অনুতাপের কারণ। সময় তো কারো জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে না। যৌবন কালটা বিন্দু হারিয়ে ফেলেছে। পিছনে ফেলে এসেছে। সেই সময়টাকে সে শ্রীলার জীবনে একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। তার যুবতী মনটা অতীত থেকে বেঁচে উঠে বর্তমানের বয়স্ক মনে বিক্ষোভ তৈরি করছে, বিক্ষেপ ঘটাচ্ছে কি? আমি জানি না। জানি না কোনো ইচ্ছা পূরণের মানসিকতায় বিন্দু ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছে কিনা।

বিন্দু অনেকক্ষণ কিছু বলে নি। মনে হলো নিজের দুঃখযন্ত্রণার অতলে ডুবে আছে। বললাম — চাকরি যে মেয়েরা শুধু স্বাধীনতা ভোগের জন্যেই করে বা স্বেচ্ছাজীবনের বাসনাতেই করে তা না-ও হতে পারে। আজকাল সকলেই আরও ভালো ভাবে বাঁচতে চায়। সেই ভালোতে অনেক টাকা লাগে। সেই বেশি ভোগের জন্যেও তো মেয়েরা চাকরি করতে পারে। তাছাড়া চাকরিটা করতে হলে বয়স থাকতে থাকতেই শুরু করতে হয়, বুড়ো বয়সে চাকরি তো আর জুটবে না, তখন?

বিন্দু এক পলক আমাকে দেখে নিয়ে বললো — শ্রীলা তোমাকে বলেছে? আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, — শ্রীলা কেন বলবে, আমি নিজে ভেবে বললাম। এটা সম্পূর্ণই আমার নিজের কথা। বিন্দু মনে হলো একটু ব্যঙ্গ করেই বললো — তাই বলো! আমি ভাবলাম ..... বিন্দু বক্তব্য শেষ না করেই থেমে গেছিলো। আমার ভালো লাগলো না বিন্দুর এই মানসিকতা। বললাম — দেখো বিন্দু তোমার নিজের সংসার, নিজের ছেলে ছেলেবৌ। আমার কিছুই বলার থাকতে পারে না। তবে কি

জানো, সব কিছুর অত্যন্তই গর্হিত বলে শাস্ত্রে বলেছে। তাছাড়া ...... বলেই আমি নিজেকে সংযত করে নিলাম। মনে হলো আমি একটু যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। উত্তেজনার বশে কিছু বললে পরে অনুতাপ ভোগ করতে হয়। তাই নিজেকে শান্ত করতে থেমে গেলাম।

বিন্দু কিন্তু ছাড়লো না। বললো — তাছাড়া? থামলে কেন? বলে ফেলো যা তুমি বলতে চেয়েছিলে। আমি নিজেকে ততক্ষণে শান্ত করে আবার গুছিয়ে নিয়েছি। বললাম — না, তেমন কিছু নয়। বলছিলাম যে আজকাল ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে, একটা সমান সমান চেতনা উভয়ের মনেই শিক্ষা থেকে, পরিবেশ থেকে এবং জীবন থেকে তৈরি হয়ে ওঠে। তাহলে ছেলেরাই চাকরি করবে, ব্যবসা করবে আর সংসারের রসদ যুগিয়ে যাবে এবং তার জন্যে কষ্ট পরিশ্রম আনন্দ উপভোগ সবই ছেলেদের ভাগে থাকবে এটা আজকালকার মেয়েরা মেনে নাও নিতে পারে। এতে তো দোষের কিছু নেই। অন্তত আমি কিছু দোষের দেখি না।

বিন্দু নিজেকে সামলাতে পারলো না। বলে উঠলো — দোষেব কেন হবে, মেয়েরা বিয়ের পরে [illegible] সারে মন না দিয়ে চাকরিবাকরিতে বারমুখো জীবনযাপন করবে, ছেলেদের মতো ড্যাং ড্যাং করে বেড়িয়ে বেড়াবে এতে দোষের কি থাকতে পারে! সংসার চুলোয় যাক, ভেসে যাক তাতে ওদের কি যায় আসে! শাশুড়ি আছে, না হয় কোনো পিসি মাসি আছে তারাই দেখবে কি বল?

আমি বলেছি — না, তা আমি বলি না। তুমি রেগে না গিয়ে ভেবে দেখো বিন্দু সেই তখন থেকে যে সংসার সংসার করছো তা কি এবং কতোটুকু। একজন ঝি এবং একজন রাঁধুনি থাকলে সংসার বলতে যা অবশিষ্ট থাকে তা সব মেয়েরাই নিজ নিজ স্বভাবের টানেই অত্যন্ত মন দিয়ে করে থাকে। একজন গৃহবধূ চাকরি করে যা আয় করবে তার একদশাংশ খরচা করলে অঢেল অবসর, অফুরন্ত অবকাশ এবং অনেকখানি স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ তৈরি হয়। তুমিই বলো ঠিক কিনা?

এই প্রথম আমি বিন্দুকে নরম হতে দেখলাম। বিন্দু বললো তোমার কথাগুলোর অনেকখানিই ঠিক। কিন্তু একবার যদি বৌয়ের টাকা সংসারে খরচা হয় তাহলে সে তো সাপের পাঁচ পা দেখে ফেলবে, ধরাকে সরা জ্ঞান করবে। তখন? মান সম্মান বাঁচিয়ে তখন কি আর সেই সংসারে থাকা যাবে? বিন্দুর কথায় আমি হেসে ফেলেছি। বলেছি — ছেলেদের টাকায় যদি যুগের পর যুগ সংসার চালিয়েও নারীদের অসম্মান না হয়ে থাকে তাহলে আজ হঠাৎ নারীর নিজের টাকায় সংসারের উন্নতি হলে নারীর সম্মান নষ্ট হতে যাবে কেন বলতে পারো?

চোখ বিস্ফারিত করে বিন্দু বলেছিলো — তুমি হঠাৎ এর মধ্যে নারীকে পেলে কোথায়। স্বামীর আয়ে স্ত্রীর অংশ নেই? ছেলের উপার্জনে মায়ের? স্ত্রী আর মা কি তোমার চোখে নারী? একজন অর্ধাঙ্গিনী অন্যজন গর্ভধারিণী। একই ব্যক্তি এই দুই রূপে সংসারের কেন্দ্রে থাকে। নারী থাকে কি?

আমি বলেছি — তুমি রাগ করো না বিন্দু, তোমার কথাটা অনেকটা তাপসের কথার মতো শোনালো। তাপস কৃষ্ণার স্বামী। কৃষ্ণার নামের যাবতীয় ব্যক্তিগত চিঠিও তাপস প্রথমে খুলে পড়তো। পড়ে দেখে দেবার মতো মনে হলে দিতো। কৃষ্ণার প্রশ্নের উত্তরে তাপস তোমার মতোই বলেছিলো। বলেছিলো স্ত্রীতো স্বামীর অর্ধাঙ্গিণী তাই স্ত্রীর চিঠিপত্রে স্বামীর অধিকার থাকে। কৃষ্ণা

বলেছিলো — তাহলে তো স্বামীর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে স্ত্রীর অধিকারও মেনে নিতে হয়। তাপস সেই কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। বলেছিলো — এসব তোমাদের মতো আধুনিকাদের অপযুক্তি। পরিবারের সব ভালোমন্দ থাকে স্বামীর হাতে। তাই তার অধিকার সর্বব্যাপী। স্ত্রীর কাজ সংসারের সেবা করা আর সন্তান ধারণ!

বিন্দু বলেছিলো — চিঠিপত্রের কথা আর টাকাপয়সার কথা এক হলো? চাকরি এবং উর্পাজনের অধিকার একবার বৌদের দিলে সেই উপার্জিত অর্থের খরচার অধিকারটাও তাকে দিয়ে দিতে হবে না? তখন কি আর রাশ টেনে ধরার উপায় থাকবে? আমার হাসি পেয়ে গেলো। হেসে হেসেই বললাম — তোমার কথা শুনে গলায় দড়ি বাঁধা গরুর ছবি ভেসে উঠলো মনের সামনে। রাশ থেকে রশির অনুসঙ্গ আর কি! তা তুমিই বা রাশ টেনে ধরতে চাও কেনো? তোমার ছেলে আর ছেলের বৌ কি নাবালক বলে তোমার বিশ্বাস? ওদের জীবনটা কি তুমি ওদের বেঁচে দেবে, না কি তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস মতো ওদের জীবন যাপন করতে বাধ্য করবে?

বিন্দু এক ঝলক বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে — কি বলেছো তুমি প্রীতি? ওরা জীবনের বোঝে কি? সংসারের জট-জটিলতার কোনো ধারণা আছে ওদের? ছেলের ঘরসংসার গুছিয়ে বুঝিয়ে দেবার দায় নেই মায়ের? আমি বলেছি সব ক্ষেত্রে সে দায় আছে কি নেই তা বলতে পারবো না। তবে এটা বুঝি যে দায় পূরণ করতে গিয়ে অনেক করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে ওঠে। তোমার মনের দায়-বোধটাই শেষ কথা নয় বিন্দু, তোমার ছেলে-ছেলেবৌয়ের মনে তোমার অভিভাবকত্ব অপেক্ষিত কি না তা একটা বড়ো কথা। অনপেক্ষিত অভিভাবকত্ব শনি প্রবেশের পথ খুলে দেয়। যদি সংসারে শিবের আস্তানা গড়ে তুলতে চাও তাহলে আজকের উচ্চশিক্ষিতা পূর্ণ যৌবনা জীবনসচেতন গৃহবধূদের 'ভুল' করে শিখতে দাও আর শিখতে শিখতে ভুল করতে দাও।

বিন্দু বলে উঠলো — তোমার কথা শুনলে সব সংসারই ছারখার হয়ে যাবে। সংসার বেশি ভুল সহ্য করে না। আমি বলেছি — আর আমার কথা না শুনলে সংসার তোমাকে পথের ধারে ফেলে রেখে — বলতে পারো পথে বসিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাট বাসী হবে! বিন্দু রেগে গিয়ে বলে ওঠে — দুষ্ট গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ভালো, বুঝেছো প্রীতি। ঘরের মধ্যে থেকে ঘর ভাঙ্গার চাইতে অন্য ঘরে গিয়ে ঘরকে মুক্তি দিলে ক্ষতি কি?

আমি চুপ করে গেলাম। বুঝলাম, এটা বিন্দুর কথার কথা। রাগের কথা। ছেলে যে বিন্দুর কতোখানি তা আমার চাইতে আর কে বেশি জানবে। সেই ছেলে দিন দিন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে; বৌয়ের বুদ্ধি পরামর্শে চলছে, নিজেদের মতো করে জীবনের পরিকল্পনা করে চলেছে। একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছে বিন্দু আর শ্রীলার মধ্যে। বিন্দু নিজেকে পরাজিতের দলে বলে মনে করছে। মনে করছে সে বঞ্চিত হচ্ছে। অধিকার থেকে, ক্ষমতা থেকে আর সংসার থেকে। এবং নিজের ছেলের থেকেও। আর এই সবকিছুর জন্যেই বিন্দু বিজয়কে নয়, শ্রীলাকেই দায়ী করছে। দায়ী করছে আর মর্মপীড়া ভোগ করছে।

সাতটা দিনও পার হয় নি মহীতোষ একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এলো অফিস থেকে। এসেই বললো, একবার ও বাড়িতে যাও প্রীতি, বিজয়দের বাড়িতে। বিন্দুবাসিনী অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছে। কিরণময় আমাকে বলেছে। শাশুড়ি-বৌতে কি সব হয়েছে। তুমি একবার এখুনি চলে যাও।

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে গেলাম। কিরণময় দরজা খুলে আমাকে দেখে বললো — এসে গেছো প্রীতি! খুব ভালো হয়েছে, যাও ঐ ঘরে তোমার বিন্দুকে একটু দ্যাখো। একেবারেই বেসামাল অবস্থা। আমি জানতে চাইলাম কী এমন হলো? কিরণময় বললো — বিস্তারিত জানি না, বলতেও পারবো না। মনে হয় সেই সনাতন শাশুড়ি-বৌ সমস্যা: অধিকারের লড়াই। একজনের সংসারের অধিকার, ছেলের অধিকার, প্রশাসনের অধিকার এবং সব ভালোমন্দের অধিকার আর অন্যজনের ভবিষ্যতের অধিকার। এই হবে, আর কি হবে? আর কি হয়ে থাকে? অবস্থাটাকে আর একটু বুঝে নিতে বললাম —— বিজয় কোথায়? কিরণময় বললো — যতক্ষণ মা ছেলেতে কথা হচ্ছিল ততক্ষণ ঘরে ছিল। মা যখন চোখের জলের ধারায় নেমে এলো আর কপালে করাঘাত শুরু করলো তখন ছেলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল দেখলাম। আমি বললাম — আর তুমি? তুমি কি করছিলে? কিরণময় বললো — আমি আবার কি করবো? কি করতে পারতাম আমি? জটিলতাই বাড়াতে পারতাম। তাছাড়া সংসার তো বিন্দুর। বহুবার শুনে শুনে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে আমার।

আমি আর দাঁড়ালাম না। লাভও নেই কিছু ভেবে ভিতরে ঢুকে গেলাম। বিন্দুকে দেখে আমি একটু থমকে গেলাম। পাথর! খাটের ঠেসে পিঠ দিয়ে বসে আছে বিন্দু। সদ্য বর্ষণান্ত বিষণ্ণ সন্ধ্যার মতো মুখখানা অত্যন্ত ভারি। পাশে গিয়ে বসেছিলাম। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আমার মৌন দিয়ে বিন্দুর যন্ত্রণাকাতর মনটিকে কাছে টেনে নিতে চাইলাম। এক সময়ে বিন্দু একটু নড়েচড়ে উঠতেই বললাম — কি হয়েছে বিন্দু?

কিছুক্ষণ বিন্দু স্থির তাকিয়ে রইলো আমার মুখেব দিকে। বুঝতে পারলাম বিন্দু আমাকে দেখছে না, দেখছে অন্য কিছু, অনেক কিছু। হয়তো সে তার অতীতের পাতায় হারিয়ে গেছে। আমি বিন্দুকে বাধা দিলাম না। অপেক্ষা করে রইলাম। একসময়ে বিন্দু আমার চোখে তাকালো। বললো — কখন এলে প্রীতি? এই কিছুক্ষণ, বলেই আমি জানতে চাইলাম — কি হয়েছে বিন্দু? এমন অসহায়ের মতো ভেঙ্গে পড়েছো কেন?

বিন্দু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলো। নিজের অদৃষ্টকে দিয়ে শুরু করে বিন্দু তার ঘরসংসার স্বামীপুত্র অতীত-বর্তমান সব কিছুতেই একের পর এক দুষে গেল। অভিযোগের পর অভিযোগ অনুযোগের পর অনুযোগ। তার সেই দীর্ঘ সশব্দ কান্নায় আর সুদীর্ঘ অভিযোগ নামায় আমি একটি কথাও বলি নি। বিন্দুর মনের মালিন্য আর অন্তরের শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়ায় আমার বাধা দেবার ছিলও না কিছু! কিন্তু শেষ দিকে যখন বিন্দুর চোখ যথেষ্ট শুষ্ক, কণ্ঠ স্পষ্ট আর বক্তব্য ঝরঝরে হয়ে এলো তখন দেখলাম বিন্দুর চোখে শ্রীলাই সব দোষের মূলে সকল নষ্টের গোড়ায় বলে বিন্দুর দৃঢ়-প্রত্যয়।

বিন্দু অনেক কথা বলে গেল। অনেক অনেক দিনের কথা। বিন্দুর বেদনা মাখা মনটা আমার মনকে বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলো। বিন্দু নিবার্যকেই অনিবার্য করে ফেললো তাও জানি। কিন্তু বিন্দুর অন্তরের জ্বালা, মনের বিষণ্ণতা আর হৃদয়ের শূন্যতা তো মিথ্যে নয়। কথা বলতে বলতে বিন্দু আবার ভেঙ্গে পড়ছিলো। চোখের কোণ বেয়ে আবার জলের ধারা দেখা দিয়েছিল।

কণ্ঠে বাষ্পরুদ্ধতা। বিন্দু বলেছিল — এমন জানলে এই মেয়েকে আমি কখনই আমার ছেলের বৌ করে ঘরে আনতাম না। আমি নিজে হাতে খাল কেটে আমার সংসারে কুমির এনেছি প্রীতি। এমন জানলে.......।

ভাবলাম বিন্দুবাসিনীর কথাগুলো আপনাদের জানিয়ে বাখি। বিন্দুর কথাগুলো আর সেই কথাগুলোব পিছনেব কথাগুলোও! এসবের কিছুই ব্যক্তিগত নয়, গোপনীয় তো নয়ই। তাই জানালাম। ইতি — প্রীতিকণা।

প্রিয় লেখকমশাই

ভেবেছিলাম তোমাকে কিছুই বলবো না। ভেবেছিলাম কারণ আমি জানি তোমাকে বলে কোনো লাভ নেই। তুমি যে হাড়ে মজ্জায় পুরুষ তা তো আর মিথ্যে নয়। সেই সত্য তুমি লুকোবে কি করে? আর পাঁচজনের মতো তুমি পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থার কথা অবশ্যই বলেছো। তোমার তনিমা কোনো কিছুকেই ছেড়ে কথা বলেনি। এটা যে তোমার লিপ-সার্ভিস — বলা উচিত পেন-সার্ভিস তা কিন্তু তুমি লুকোতে পারনি। তরুণী বয়স থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সকল নারীই তোমার কলমে একটা পর্যায়ে রায়বাঘিনী। যাকে দিয়েই বলানো হয়ে থাক, কথাটা যে তোমার তা তো জলের মতোই সহজ! জবাই করা গরুর দেহ গরুর গাড়িতেই বাহিত হয়! তাই তোমার কলমে নারীরাই নারীকে জবাই করে আবার তারাই একে একে সেই সব নারীদেরই বহন করে, বাহিত হয়। এই ব্যাপারটা ঘটে সংসার জীবনের গতিপথে, প্রবেশের ক্ষণ থেকে নির্গমন ক্ষণ পর্যন্ত। এমন একটা ধারণা তুমি বলতে চেয়েছো, বলাতে চেয়েছো।

আর এই করতে গিয়েই তুমি ধরা পড়ে গেছো। সমাজে সংসারে নারীদের নির্যাতনের পিছনে তুমি নারীদের ভূমিকাটি তুলে ধরেছো, নারীদের শোষণের দীর্ঘ ইতিহাসের কারণ হিসেবে তুমি নারীদেরই দায়ী করেছো। পুরুষ প্রাধান্যকে তুমি একটা বাতাবরণ বলে মনে করেছো, যে বাতাবরণে নারী নারীকে জবাই করে চলেছে। পুরুষকে তুমি সাংখ্যের পুরুষ হিসেবে নিষ্কর্মা ভোক্তা হিসেবে চিত্রিত করে নারীকে প্রকৃতি — শুধুমাত্র ত্রিগুণাত্মক নয় — বহু গুণাত্মক প্রকৃতি বলে জ্যান্ত একটা ছবি এঁকেছো।

এমন একটা একপেশে কাজ করেছো বলেই যে তোমাকে কিছু বলা দরকার বলে মনে হয়েছে তা কিন্তু নয়। তুমি একটা সহানুভূতিকে তোমার লেখার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছ, একটা সমবেদনা যেন সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছো। আমার প্রতিবাদের কারণ সেখানেই। পুরুষ হিসেবে একপেশে কথা বলার অধিকার তোমাদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু সমবেদনা? সহানুভূতি? সেটাই আমার সহ্য হলো না।

আমার কথা বলার আগে তোমাকে একটা গল্প শোনাই। আমাদের বাড়িতে বড়োদের পাখি পোষার খুব শখ আছে। একাধিক খাঁচায়, একাধিক চরিত্রের পাখি আছে, ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। আমার ছোট্ট ভাইঝিটি এ-খাঁচা ও-খাঁচা সে-খাঁচা করে করে সেই সব পাখিদের প্রত্যেককেই চিনে ফেলেছে। সে পাখিদের সঙ্গে কথা বলে অফুরন্ত, প্রশ্ন করে তার চাইতেও বেশি। মনের মতো ব্যবহার পায় না বলে তিন্নির খুব রাগ হয়, উত্তর পায় না বলে অভিমান করে। তিন্নিই আমার ভাইঝি। তা, সেই তিন্নি আমাকে প্রশ্ন করে। বলে — পিসি, ওই পাখিরা আকাশে ওড়ে না কেন? ওরা বাসা বানায় না কেন? ওদের ছেলেপুলে নেই কেন? ওদের মা-বাবা, মাসি-পিসিরা ওদের আদর করতে আসে না কেন? তিন্নির প্রশ্নের শেষও নেই মাথামুণ্ডুও থাকে না। তুমি বলতে পারো লেখকমশাই আমি তিন্নিকে কি উত্তর দেবো? বলবো কি যে ঐ খাঁচার বাতাবরণটাই দায়ী? না-কি বলব যে খাঁচার পাখি, সব খাঁচার পাখিই, মানুষের সতর্ক এবং সার্বিক কনডিশনিং-এর শিকার? সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বেড়াজালে ওরা আটকা পড়ে গেছে। বলবো কি যে পাখিরা আকাশে উড়তে পারে না তার কারণ ওদের ওড়ার সুযোগটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবার যে খাঁচায় একাধিক পাখি আছে তারা যে সারাক্ষণ ঠোকরাঠুকরি করে সে কি তাদের প্রকৃতিদত্ত স্বভাবের কারণে? না-কি বলবো যে তা ওদের কনডিশনড অবস্থার প্রভাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছে? কোনটা বলা ঠিক হবে?

এবার বলি আমার কথা। পাভলভ সাহেব একটি মাত্র কুকুরকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। সে ছিল শরীর বিষয়ক অনুসন্ধান। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা। আমাদের সমাজে একাধিক শ্রেণীকে শ্রেণীগতভাবেই কনডিশনিং করা হয়েছে, করা চলেছে। ডি-কনডিশনিং-এর কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি, বরং ডি-কনডিশনিং-এর যাবতীয় প্রথাপ্রকরণ নিরবচ্ছিন্ন চলে এসেছে। এটা চলেছে সামাজিক এবং মানসিক কনডিশনিং। এবং বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে নয়, স্বার্থ সুরক্ষার তাগিদে, অর্জিত ভোগের নিরঙ্কুশ অধিকার কায়েম রাখার জন্যে। সাংখ্যের নিষ্কর্মা পুরুষ নয়, করিৎকর্মা উচ্চকোটি পুরুষের অত্যন্ত ক্রীয়াশীল মস্তিষ্কের অবদান এই শ্রেণী কনডিশনিং। মুনিশ্রেষ্ঠ মনুই একমাত্র এবং একক উৎস কিনা তা অনুসন্ধানী পন্ডিতগণের বিচার্য বিষয়। বর্ণাশ্রমে যেমন শূদ্রের উদ্ভব গৃহাশ্রমে তেমনি গৃহ-শূদ্রের — নারীর — স্থান নির্দেশ দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী।

আধুনিক গোয়েবল্‌স্‌ কায়দায় চিৎকৃত ঘোষণায় আর ফিসফিস স্লোগানে নারী নরকের দ্বার বলে, শূদ্রাদপি শূদ্র বলে, প্রচার পেলো। অথচ কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌ পুরুষ মাত্রেই নারীর গর্ভে জাত ; অ-নিবার্য প্রাকৃতিক নিয়ম। এন্টিডোটের ব্যবস্থা তাই সেই গর্ভকে বাঁচানোর জন্যে পাকা করা হল — কোনো মা নারী নয়, সে মাতা, সে জননী ; এবং জননী শুধু জন্মভূমি থেকেই নয় স্বর্গ থেকেও গরীয়সী। এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম পুরুষকে নরক-জন্ম থেকে বাঁচালো আর নারী সমাজকে কীটস্য কীটে পরিণত করে দিল।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তাহলে তো মিটেই গেল — মাইট ইজ রাইট। নারী অবলা, দুর্বল, লতেব স্বভাব, পরনির্ভর, পরাশ্রয়ী। পাকাপাকি সামাজিক-মানসিক কনডিশনিং সম্পূর্ণ। পাখি উড়তে পারে না, উড়তে চায় না। প্রিয় লেখক মশাই, তোমরা পাখির আকাশটাকে কেড়ে নিয়ে, পাখির ওড়ার চেষ্টাটাকে বন্ধ করে দিলে। তার পরে পাখির গায়ে দুর্নামের নামাবলি এঁটে দিলে — পাখি দুর্বল, পাখি উড়তে পারে না, পাখি খাঁচা নির্ভর, পরাশ্রয়ী।

এই অবস্থায় নারীসমাজ প্রতিবাদ করতে পারতো, বিদ্রোহ করতে পারতো, অবতীর্ণ হতে পারতো সংগ্রামে। কেন তা পারেনি তা সমাজবিজ্ঞানী আর ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধেয়। পারেনি যে তা ঘটনা, স্টেট অফ এ্যাফেয়ার্স। আমি এর একটা মনোবিজ্ঞানসম্মত কূটচালের সন্ধান পাচ্ছি। শুনতে চাও সেট্‌ কি ? তবে শোনো ঃ নারীকে মানসিকভাবে নেশাগ্রস্ত করে রাখা, পূজা আর প্রশংসার গ্যাস-বেলুনে নারীমনের ভারসাম্য নষ্ট করে দেওয়া। নারী শক্তিরূপিনী, দশভূজারূপিনী, রমনী। নারী দেবী, গৃহের একচ্ছত্র গৃহিনী। এবং ইত্যাদি। পূজায় আর প্রশংসায় কে না আত্মবিস্মৃত হয় ? মন্ত্র অসাধ্যসাধন করতে পারে ; ফণীও নতশির ঝিমিয়ে পড়ে। পূজার মন্ত্রে নারী তাই নম্র-নত সেবিকা-নিবেদিতা বোধে হাষ্ট হয়ে পড়ে। এই সবই কনিডিশনিং — কখনও হট কখনও কোল্ড।

পুরুষ হট হবার ক্ষমতা রাখে বলে কোল্ডও হতে পারে। জৈব প্রাকৃতিক কারণে পুরুষ শক্তির অনুশীলনে নিরবচ্ছিন্ন, পেশী চর্চায় সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এটাই তার ঠ্যাঙাড়ে স্বভাবের মূলে। অন্যদিকে নারী তার প্রকৃতি নির্ধারিত অনন্যোপায় সৃষ্টিধর্মে — সন্তান ধারণ; লালন পালনের কারণে গৃহবন্দি জীবন যাপনে বাধ্য। এটাই তার নিবেদিতপ্রাণ স্বভাবের মূলে। মানব প্রকৃতির এই অনিবার্য দ্বৈত থেকে বিভেদের জন্ম। মনুষ্যেতর প্রাণিদের বেলায় প্রজাতির অভিব্যক্তিতে এই নারী স্বভাবটি কোন দীনতা বা অসহায়তার সৃষ্টি করেনি। করেনি কারণ প্রকৃতি নিজেই এই জৈব ব্যবস্থাকে বেঁচে থাকার সংগ্রামে সামঞ্জস্য দিয়ে স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষের বেলায় তা হয়নি। শক্তিধর পুরুষ তার ঠ্যাঙাড়ে স্বভাবকে পুষ্ট করতেই প্রকৃতির উপর খোদকারী করেছে। পীড়ন-শোষণ-বঞ্চনার সহজ সুযোগকে সে-অনায়াসেই কাজে লাগিয়েছে, সামাজিক এবং দৈহিক কনডিশনিং-এ কাজে লাগিয়েছে।

তুমি লেখক মশাই সব বলতে গিয়েও এই কথাটি বলতে পারলে না। বলতে পারলে না যে পুরুষ নিজেকে অধিকতর সবল বলে পাওয়ার জন্যে, নিজের শক্তিকে আরও বেশি করে অধিকার করার জন্যে এবং গৃহে-সমাজে একচ্ছত্র ক্ষমতাধর হবার মানসে নারীকে গৃহ-খাঁচায় বন্দি করার জাল বুনতে লেগে গেল, সমাজে নারীকে স্থানচ্যুত করার পরিকল্পনায় উঠেপড়ে লেগে গেল। মানব সমাজের অগ্রগতির ধারায় সবথেকে প্রয়োজনীয় কাজটি — সৃষ্টির কাজটি, ধারণের কাজটি এবং লালনপালন পোষণের কাজটি — নারীর ভাগে রইলো। একে মহোত্তম কাজও বলা যায়। কিন্তু পুরুষ নিজের হাতে তুলে নিল শোষণের কাজটি।

প্রকৃতি কিন্তু তার নিজের দায় যথাযথ পূরণ করে গেল। নারী ও পুরুষ সন্তানের অনুপাত মার খেলো না; কিন্তু পুরুষ সমাজ মূল্যায়নে নারীকে মেরে রাখলো। অবমূল্যায়নের বাতাবরণটি কন্যা সন্তানের জন্ম মুহূর্তের পাওনা হয়ে গেল। পুত্র সন্তানের আগমনে ঢাকে কাঠি পড়তে বিলম্ব হয় না; উচ্চতর মূল্যায়নের উচ্চরোলে পুরুষ তার নিজের শ্রেণীকে স্বাগত জানালো। নারী, প্রধানত মাতারূপে প্রতিবাদ করতে পারতো। কিন্তু পারেনি। পারেনি তার কারণ সেই কনডিশনিং। নারীর মস্তিষ্ক শোধন চলেছে দীর্ঘদিন ধরেই। পেশীক্ষমতা এবং অর্থশক্তিই যে জীবন যুদ্ধে প্রধান সহায়ক সেই কথাটি সমাজের পরতে পরতে আর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মস্তিষ্কের কোষে কোষে আমূল প্রোথিত-উপ্ত করে দেওয়া হলো। একটা বিশ্বাসকে, একটা সংস্কারকে এমনভাবেই গোয়েবল্‌স্‌ করা হলো যে তা একসময়ে সত্য বলে মনে হতে লাগলো। নারী জনশক্তির উৎসে, পুরুষ পেশী ও সম্পদ শক্তির মূলে। এবং বার বার দেখানো হলো, ঘোষণা করা হলো জনশক্তি অভাব-অনটনের বৃদ্ধির কারণ আর পেশী ও সম্পদ শক্তি ভোগ আর উদ্বৃত্তের হেতু। কন্যাসন্তান এবং ভবিষ্যতের নারী তাই সমাজের লায়াবিলিটি; পুত্রসন্তান এবং ভবিষ্যতের পুরুষ অনুরূপভাবেই সমাজের এ্যাসেট। নারী অভাব আর দুঃখের জন্ম দেয়, পুরুষ ভোগ আর আনন্দের ভগীরথ।

আর যায় কোথায়? পুরুষের দিনমণিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে তাই নারীর রজনীকেও দীর্ঘ করে তুলতে হয়। তাই হয়েছে। শোধিত-মস্তক নারী এবং প্রভাবিত-বুদ্ধি পুরুষ উভয়ে মিলেই এই দিন-রাত্রির বাঁটোয়ারায় মদত দিয়েছে। ক্রমান্বয়ে মদতপুষ্ট অতীত ধীরে ধীরে এমন একটা অবস্থানে পৌছে গেছে যে এখন আর অনিশ্চিত কন্যাসন্তান প্রসবের অপেক্ষা করে না, পূর্বাহ্নেই নিশ্চিত হয়ে উৎপাটন যোগ্য হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে পুরুষের রক্তচক্ষু পথ নির্দেশে। শুধু কি বিজ্ঞান? পুলিশ-প্রশাসন ধর্ষিতা নারীর অভিযোগ গ্রহণে অসম্মত হচ্ছে, নিজেরা অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে। নেতা-প্রতিনিধি আমলা-মন্ত্রী অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভোটের ঝোঁকের দিকে দৃষ্টি রেখে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করে চলেছে। এমন কি বিচারালয়ের সূক্ষ্ম বিচারও মার খেয়ে যাচ্ছে মনুর আঘাতে, পুরুষ-প্রাধান্যের নেশাগ্রস্ত মানসিকতায়।

হবে নাই বা কেন? প্রসবের পরে কন্যাসন্তানের মুখ পিতার কাছে রিপালসিভ; তার বিরস বদন নতনেত্র দৃষ্টি। পারিবারিক সামাজিক শক্তির উৎস যে পুরুষ, পিতা, তার এমতো অবস্থায়, ভাবান্তরে, প্রসূতি তো ম্রিয়মান বোধ করবেই। যাকে তুষ্ট করলে জগৎ তুষ্ট, নারীর কাছে সে তো তার স্বামী! এখানেও গোয়েবল্‌স্‌। পতি পরমেশ্বর, পতি নারীর শেষ গতি, নারীর ভাগ্যে দিনেরাতে যতো কলসীর কানাই জুটুক না কেন তাই বলে কি প্রেম দেবে না সেই নারী? পতি যে পরমগুরু! আত্মপ্রশংসার এমন নির্লজ্জ জয়ঢাক যারা নিজেরা অষ্টপ্রহর পিটে যেতে পারে, যারা চোখের পলক বিন্দুমাত্র না কাঁপিয়েই 'পরমেশ্বর' 'পরমগুরু' বলে যেতে পারে, তাদের বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা দায়, তাদের উদ্দেশ্যের বিষয়ে শোভন কোনো বিশেষণও খুঁজে পাওয়া ভার।

এই দুর্বিনীত এবং অশালীন ঢাকের বাদ্যি গৃহ ছাড়িয়ে অঙ্গনে-প্রাঙ্গণে, সিনেমা-থিয়েটারে, টেলিভিশনে-সিরিয়ালে, আর বিধানসভা-লোকসভায় সমানে, পাভলভের ঘণ্টাধ্বনির মতো, সমানে বেজে চলেছে। ডি-কণ্ডিশনিং-এর অবকাশ মাত্র রাখা যাচ্ছে না। নিত্যদিনের খবরে-বিবরণে, পাঠ্যে-দৃশ্যে, শ্রবণে-অনুভবে যেমন এই বাদ্য-কনডিশনিং চলছে, তেমনি চলছে নৈমিত্তিক ব্রত-পার্বণে, উপবাস-উদযাপনে। পতি-দেবতাকে দেখলেই তাই অ-নিবার্য ভক্তিগদ্‌গদ লালাক্ষরণের ব্যবস্থাটি পাকা হয়ে আছে। গৃহ-খাঁচায় আবদ্ধ নারী-পাখি যে স্বাধীন মনের আকাশে উড়তে পারছে না সে তো তার ওড়ার ইচ্ছেটাকেই অবদমিত করে দেওয়া হয়েছে বলে; সেই ইচ্ছেটা পাছে গজায়, তাই সুকৌশলে সেই ইচ্ছেটাকে উৎপাটিত করে সেখানে ভক্তি আর সংস্কারের বীজ উপ্ত করে দেওয়া আছে।

পাভলভের কুকুর কেন অ-যোগ্য ঘন্টাধ্বনির উদ্দীপকে স্যালিভেট করবে — এই প্রশ্নটা কুকুরের জন্যে ভুল প্রশ্ন; পাভলভের জন্যে অবশ্যই সঠিক। অথবা বলা যায় তিন্নির প্রশ্নটা পাখিকে করাটা ভুল, বাবা-কাকা-জ্যেঠাদের করলে ঠিক। তুমি কি একবারের জন্যেও সেই প্রশ্নটা সঠিক লোককে করতে পারলে না? সব নারীকেই রায়বাঘিনী বলে ঘোষণা করলে, কিন্তু একবারও তোমার মনে হলো না যে নারী মাত্রেই কেন রায়বাঘিনী হয়ে উঠল।

পুত্র সন্তানের জন্মমুহূর্ত থেকে পিতা-সম্প্রদায়ের মুখে একগাল হাসি আর হাতে মিষ্টির প্যাকেট দৃশ্যমান হবে। কন্যা হলেই বিরস-বিষণ্ণ-বিমর্ষতার ঘনকালো মেঘ। বলবে — সোনার আংটির আবার সোজা-বাঁকা কি? বলবে — পুত্র মানেই তো পুন্নাম নরক উদ্ধারকারী, প্রজন্ম প্রবাহের কেতনবাহী, রত্ন-রত্ন। আর মেয়ে সন্তান হলেই বলবে — মা-বাপের বোঝা, পরিবারের দায়, অপরের গচ্ছিত ধন (দ্রব্য অর্থে, মূল্য অর্থে নয়), হাড় কালি করার যন্ত্র। হাইলি চার্জড এ্যাণ্ড লোডেড পরিভাষা। একবারও বুক কাঁপে না, কণ্ঠ ক্লিষ্ট বোধ করে না, বিবেক বাধা দেয় না। পরিপূর্ণ ব্রেন-ওয়াশিং না হলে কি এমন অশোভন মানসিকতা স্যালিভেট করতে পারে? পূর্ণ কনডিশনিং না হলে?

এই যে শ্রেণীবিভেদ, মানসিকতার এই যে অশোভন ভিন্নতা তা আবাল্য চলতে থাকে। বিরামহীন চলতে চলতে ব্যাপারটা অবিরাম চলতেই থাকে। জীবনের পর্বে পর্বে, পর্যায়ে-পর্যায়ে যতো পরিবর্তনই ঘটুক না কেন এই বিভেদের আর এই ভিন্নতার অবসান ঘটে না। কণ্ঠে যত 'না-না' আছে, তর্জনীতে যতো নিষেধের ঋজুতা আছে আর দৃষ্টিতে যতো রক্তঝরা প্রতিরোধ আছে তার সবটাই বালিকা-কিশোরীর চলনে-বলনে-সামাজিকীকরণে প্রকাশ পেয়ে যায়। পুত্রের যেখানে সাতখুন মাপ, পুত্রীর সেখানে আজীবন শৃঙ্খলিত কারাবাস — পিতৃগৃহে, পতিগৃহে।

এই সর্বৈব শৃঙ্খল দশার মূলে বিষয়টা কেমন? উদ্দেশ্যটা কি? এবং হেতুইবা কি? নারীর দেহ ঠুনকো, নারীর মন সহজ-দুষণের শিকার, দেহ-মনের পবিত্রতা পতিদেবতার ভোগের জন্যে আবশ্যিক পূর্বশর্ত। সব মিলে সতীত্ব। ঠুনকো বলেই কি নারীদেহ খানখান ভঙ্গুর আর পুরুষদেহ পেশীবহুল বলেই কি ভাঙ্গে না, নষ্ট হয় না? সোনার পুত্তলি বলেই কি পুরুষের ইনট্রিনসিক ভ্যালু — স্বরূপ মূল্য — টোল খায় না? নারীকেই ভার্জিন ল্যাণ্ড হতে হবে আর পুরুষ লাঙলের ফলা — যত খুশি যেখানে খুশি চাষ দিতে পারবে? পুরুষ-লাঙলের সোনার অঙ্গে দাগ লাগে না; আর, নারীর দেহ যেমন ঠুনকো মনও তেমনি পচনশীল! প্রত্যয় না হয় পুরাণ-উপাখ্যান দেখুন, কাব্য-গল্প পড়ুন আর সময় পেলে সিনেমা-টেলিভিশন দেখুন। হ্যাঁ এখনও, এই বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও জবজবে আবেগের টসটসে আদর্শের নির্লজ্জ উদাহরণ দেখতে পাবেন। সেই কনডিশনিং সমানে বহমান।

প্রাণিজগতে এই কনডিশনিং-এর জন্যে ভৌত উদ্দীপকই যোগ্য — সেখানে ঘন্টাধ্বনি,

বৈদ্যুতিক মৃদু-শক্তি প্রবাহ বা আলো ইত্যাদিতেই কাজ চলে। মানুষের বেলায় সে সব তো যথেষ্ট বললে চলে না; তার সঙ্গে উচ্চস্তরের স্টিমুলি -- উদ্দীপক — চাই। তাই আদর্শ, মূল্যবোধ, ঈশ্বরভাবনা, দেবদেবী, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাধন ভজন ইত্যাদি যুক্ত হলে তবেই দীর্ঘমেয়াদী ফল প্রসব সম্ভব। সমাজের মঙ্গলের জন্য চাই বর্ণবিভেদ — শূদ্রের জন্ম। যুগ যুগ ধরে ওরা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বিশ্বাসের বুনোটে 'সমাজের' সেই মঙ্গলকে সম্ভব করে চললো, চলেছে। 'তুমি ছোটো জাত, তুমি নিম্নশ্রেণীর, তুমি সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে বলিপ্রদত্ত, সেবা করো বলেই তুমি মহৎ, সেবা তোমার পরমধর্ম' ইত্যাদির নেশা ধরানো শ্লোগান আর চিরদিন পদদলিত করে রাখার শ্লো-পয়জন যেমন শূদ্রকে — মুচি, ম্যাথর, চামারকে — মানসিক-সামাজিকভাবে অকল্যাণের মহামরুতে নির্বাসিত রেখেছে, তেমনি 'তুমি অবলা নারী, তুমি দুর্বল শ্রেণীর, তুমি গৃহের মঙ্গলের জন্য প্রকৃতি নির্ধারিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান নয় পতিভক্তিতে তুমি মহীয়সী, পতিসেবায় তোমার দেবীসত্তা স্ফুরিত হয়, গৃহ তোমার মন্দির, পতি তোমার প্রভু, ইত্যাদির শ্লোগানে-শ্লোপয়জনে নারীশ্রেণীকে অসম্মানের জীবনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

এই কনডিশনিং প্রক্রিয়ায় অবশ্যই একটা মানসিক অবদমন ঘটে — মেণ্টাল রিপ্রেশন। তার ফলে এখানে ওখানে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা দেখা দেয়, অগ্নুদ্গার ঘটে। শূদ্র সমাজের কিছু কিছু এলাকায় যেমন সংঘাতমনা ব্যক্তি প্রকাশ পায় তেমনি নারী সমাজেও নারীমুক্তি আন্দোলনের দামামা বেজে ওঠে। মোট জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ অবদমিত, আর সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধাংশ যে নারী সেও খাঁচার ঘেরাটোপে প্রক্ষিপ্ত, অবদমিত। এতো বড়ো অন্যায় যে শক্তির বলে এবং বুদ্ধির কৌশলে ঘটে চলেছে সেই শক্তি অর্থবল, সেই বুদ্ধি বিকৃতবুদ্ধি।

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। লজ্জা নারীর ভূষণ, কিন্তু নির্লজ্জ পুরুষের ভূষণ তার বাহু-ভোগের শক্তি, তার দম্ভ, তার বহু-ভোগ্য চরিত্র। অন্ত-প্রহর রাতের গভীরে স্খলিতপদ পুরুষের গৃহ প্রত্যাবর্তন ধিক্কৃত নয়, আবাহনে স্বীকৃত। গৃহত্যাগিনী নারী নৈব নৈব চ। একবার পা অথবা মন হড়কালো তো ব্যাস্, তোমার শেষ — ইতি। ফিরিবার পথ নাই, পথ যাবে মুছে। অপমানে সে বিতাড়িতা। সতীত্ব নারীর ধর্ম। ঈশ্বর নয়, অন্য কোনো আদর্শ বা মূল্যবোধ নয়। পুরুষের বেলায় সতীত্ব ধারণা অপ্রযোজ্য। পরিসংখ্যানও তাই বলে। শতকরা আটচল্লিশ জন পুরুষ নারী দেখলেই বিছানায় কেমন লাগবে ভাবে, অপরদিকে শতকরা ছাব্বিশ জন নারী তেমন ভেবে থাকে — আমেরিকার একটা সংস্থার দেওয়া পরিসংখ্যান এ কথা বলেছে। তাহলেই দেখুন পুরুষের স্বভাবের গভীরেই ব্যাপারটার উৎস, গোমুখ।

ভালবাসার অভিনয়ে, রোটি-কাপড়া-মকানের অঙ্গীকারে আর অনিশ্চয়তার ভয় থেকে মুক্তি দেবার প্রতিজ্ঞায় পুরুষ নারীকে কাছে টানে, ঘর বাঁধে। ঘর বাঁধা হয়ে গেলেই পুরুষ তার স্বভাবের শতকরা টানে আবার চারণভূমির খোঁজে মনোবিচরণ করে। অনেকে শুধু মনে মনেই বিচরণ করে না, সশরীরেই চলাচল শুরু করে। ভীত-সন্ত্রস্ত-অনন্যোপায় নারী যুগযুগান্তের কনডিশনড মন নিয়ে, অবদমিত কামনা-বাসনা নিয়ে কি করবে? নারীর মনে তাই ডিফেন্স মেকানিজম দানা বেঁধে ওঠে, আত্মরক্ষায় সেই সব অবচেতনের সৈন্য সামন্তরা তাকে চালিত করে। গৃহের অভ্যন্তরে আবদ্ধ, পুরুষের তৈরি খাঁচার মধ্যে তখন তারা নিজেরা বাঁচার লড়াই লড়ে, কামড়া-কামড়ি, ঠোকা-ঠুকি এবং হাঁচড়ানো-কামড়ানোতেই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। পালানোর পথ থাকে না বলেই তারা রায়বাঘিনী হয়ে প্রকাশ পায়। দোষটা পড়ে নারীর ঘাড়ে, পাখির ঘাড়ে আর গরুর ঘাড়ে। নারী অন্য নারীকে সহ্য করতে পারে না, পাখি বড্ড ঠোকরাঠুকরি করে, আর গরু জবাই করা স্বজাতিকে স্বস্কন্ধেই বহন করে।

তুমি রাগ করছো না তো লেখক মশাই? ঝোঁকের মাথায় হয়তো একটু বাড়াবাড়ি মতোই হয়ে যাচ্ছে, একই কথা একাধিকবার এসে পড়ছে। তা সে পড়ুক, কিন্তু মূল বিষয়টাই এমন যে নিজেকে সংযত রাখাই দায়। দেখো না বিধবাদের অবস্থাটা একবার। প্রথম তো হত্যা করার একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যবস্থা করা হলো। সতী-প্রথা। চিতায় তুলে দাও। বিগতদার পুরুষের বেলায় ব্যবস্থাটা তেমন হলো না কেন? সতী-প্রথায় সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য — পুণ্য, অর্থাৎ সম্পদ-সম্পত্তি — পতির অবর্তমানে ভাসুর দেবররা পেতে পারে। কিন্তু যদি পতি-প্রথা চালু হয় তাহলে সমূহ বিরোধ এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনা থেকে যায়। ভোগ্যের মৃত্যু বা অপসারণে ভোগের বিঘ্ন ঘটে না। তাই সতী-প্রথা। ভোক্তা যদি সেই ব্যবস্থা নিজের জন্যে করে তোলে তাহলে ভোক্তা হয়ে লাভ কি হলো? তাই পতি-প্রথা নৈব নৈব চ।

যারা সতী হলো না বা যাদের সতী করা গেল না তাদের জীবনটা একবার দেখ। কী অসীম অবমাননার জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয় এদের। এই ব্যাপারে নারীরা অবশ্যই প্রধান পাহারাদারের ভূমিকা নিয়ে থাকে; কিন্তু কেন? সেই পুরুষের তৈরি নিয়মকানুন, প্রথাপ্রকরণ এবং ভিজিলেন্স নয় কি? বলবে, নারীই তো নারীর অবমাননা করছে, অসহায় নারীকে অন্য নারীই তো পীড়ন করছে। আমি বলতে চাই — তুমি কি গাড়োয়ানের হাতের শক্ত লাঠিখানা দেখতে পাও না? গরু কি স্বেচ্ছায় বইছে? তার যে পিঠের চামড়ার ক্ষত আর সহ্যের সীমায় নেই তা কি তোমরা দেখতে পাও না? তুমি বলতে পারো — তা প্রতিবাদ করে না কেন, নারীরা সংঘবদ্ধ হতে পারে না কেন? আমি বলবো — হবে, করবে। একটু অপেক্ষা করো।

অবশ্য আর একটা কথাও বলবো। বলবো — হাজার হাজার লোক তো রোজ চাকরি করতে যায়। তারা কিসের ভয়ে এতোদিন নাকেমুখে চাট্টি গুঁজে দশটায় হাজিরা দিয়ে লাল দাগ বাঁচাতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতো? প্রাইভেটে এখনও ছোটে কেন? সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন আছে, সংঘবদ্ধতা আছে। তবুও ভয় ঘোচে না কেন? পা কাঁপে কেন অফিসারের সামনে? একটা নিয়মকানুন, একটা বাতাবরণ, দীর্ঘ মানসিক কনডিশনিং নয় কি?

নারী শিক্ষা চালু হতে লেগেছে কয়েক শতাব্দী; সহশিক্ষার বাতায়ন তার চাইতে কম দিনে খুলে গেছে। এবার দরকার সম-শিক্ষার। সমকক্ষতার শিক্ষা, সমক্ষমতার শিক্ষা, সম-সমতার শিক্ষা। এই শিক্ষাটা শুধুমাত্র স্কুলে কলেজের ঘেরাটোপে হলেই চলবে না; একে গৃহে-সমাজের জীবন চত্বরে চালু হতে হবে। যে শিক্ষা নারীকে দাসী আর পুরুষকে প্রভু করে তৈরি করে সেই শিক্ষা নারীর পক্ষে অবমাননার, পুরুষের পক্ষেও অসম্মানের। সহজলভ্য স্বার্থের লোভে নারী তার অবমাননাকে মেনে নিচ্ছে, পুরুষ তার অসম্মানকে। কিভাবে? বলছি শোনো।

প্রাণী মাত্রেই অনায়াস জীবন চায়। জৈব কারণেই এই চাওয়াটা বাস্তব। তার জন্যে সে অনেককিছুই ত্যাগ করতে পারে। গৃহের সুখ-শান্তি নির্ভয়-নিশ্চয়তা পেতে নারী এবং পুরুষ প্রতিযোজন করে একে অপরের সঙ্গে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বিচার-বিবেচনা, উচিত-অনুচিত বোধ ইত্যাদির সঙ্গে। এই করতে গিয়ে নারী নিশ্চিত আরাম বেছে নিয়েছে অনেকখানি স্বাধীনতার মূল্যে। অন্যদিকে পুরুষ অনেকখানি পরিশ্রমের মূল্যে প্রায় কিনে নিয়েছে নারীর লয়ালটি — নির্ভরশীলতা, আনুগত্য এবং একনিষ্ঠতা। উভয়েই উভয়ের প্রাপ্তিতে ক্রমশ নেশাগ্রস্ত হয়ে স্থিত বোধ করেছে। স্থিত এবং আশ্বস্ত। এবং নিজ নিজ এলাকায় নিজ নিজ প্রকৃতিতে অর্জিত প্রাপ্ত অধিকার এবং সুবিধাসমূহকে নির্বিঘ্ন করে তুলতে সচেষ্ট থেকেছে। নারী নিয়েছে ছলাকলার রণকৌশল, পুরুষ গ্রহণ করেছে আর্থ-সামাজিক এবং পেশী শক্তি।

এই শ্রেণী সংগ্রামে উভয়েই পরাভূত হয়েছে। নারী তার অবমাননায়, পুরুষ তার অসম্মানে।

দাসীবৃত্তির অতলে ডুবে যেতে যেতে নারী অনেক বেশি মূল্য দিয়ে ফেলেছে, অবমাননাকর অস্তিত্বে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে; পুরুষ প্রভু-বোধের নেশায় বন্ধু-সখাপ্রিয়া-ভার্যার বদলে একতাল দাসী-দেহ নিয়ে মশগুল থেকেছে। এটাই তার অসম্মান; নিজের যোগ্য করে না নিয়ে নারীকে ভোগ্যবস্তু করে তোলাতেই পুরুষের অসম্মান ঘটে গেছে।

অন্যান্য শ্রেণী সংগ্রামের তুলনায় এখানেই নারী-পুরুষ সংগ্রামের তফাত — এখানে, এই দ্বৈত পরাভবে। কোনো পক্ষই এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারে না। জয়ের অনুভব আর জয় এক কথা নয়। নয় যে তা তো নারী এবং পুরুষ উভয়েই টের পাচ্ছে। দু'জনের জীবন যৌথ জীবন। অবমাননা-অসম্মান তাই দুজনকেই অবনমিত করতে বাধ্য। মানবিক দিক থেকে, মূল্যবোধের নিরিখে আর জীবনকে সুস্থ-সুন্দর যাপনের ক্ষেত্রে। আয়েশ আর আরামের, বিলাস আর ব্যসনের জীবন লক্ষ্য থেকে নারীকে বেরিয়ে আসতে হবে বৃহত্তর জগতে, সমকক্ষতার প্রেক্ষিতে এবং ফিরে পেতে হবে ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিচারক্ষমতা, যোগ্যতা। সেখানেই ঘটবে তার অবমাননার মুক্তি। পুরুষকে নেমে আসতে হবে ধরণীর বাস্তবতায়, পতি হিসেবে দেবতা না হয়ে একটি আস্ত মানুষ হয়ে ওঠা অনেক কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজটুকু তাকে করতে হবে তাহলেই হাতে হাত ধরে সম-শিক্ষায়, সম-ক্ষমতায়, সর্ব-সমতায় দেখা হবে দুজনের। নরকের দ্বারকে পাশে নিয়ে আর আত্ম অসম্মানের জৈব অস্তিত্বে ভরাডুবি ঘটবে না পুরুষের। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে পূজা না করে নারী পুরুষকে নিজের মতো করে, মানুষের মতো করে কাছে পাবে, দেবতা বানিয়ে অতলে নেমে যেতে হবে না।

যতোদিন এটা না হচ্ছে ততোদিন তনিমা বিদ্রোহের ভাষায় কথা বলবে আর অনিমা অনুগত হয়েই সুখ খুঁজবে আর তোমার মতো লেখকরা নির্লজ্জের মতো সব নারীকেই রায়বাঘিনী করে চিত্র আঁকবে। রক্তের টান আর বংশগতি যাবে কোথায়? তোমরা তো পুরুষবংশজাত পুরুষ। কিন্তু একটু আলাদা। আলাদা এই জন্যে যে তোমরা কিছু মেকি সহানুভূতি আর সস্তা সমবেদনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও তোমাদের লেখার মধ্যে। আমাদের শত-ক্ষত দেহে যে তা নুনের ছিটের মতো মনে হতে পারে তা তোমরা বোঝো না।

আমার এই চিঠি যদি তোমার আবেগকে উত্তেজিত না করে চিন্তাভাবনাকে ছুঁয়ে দিতে পারে তাহলে পরের বার নারীদের নিয়ে সঠিক কিছু লিখো — এই অনুরোধ রইলো। আমি তোমার লেখার ভক্ত বলে এতো কথা বললাম। ভক্ত কিন্তু অন্ধ নই। চোখ খুলে চারদিকে তাকালে তুমি কোথাও না কোথাও আমাকে দেখতে পাবে। তাই আমার নাম ঠিকানা তোমাকে দিলাম না। দিলাম না কারণ আমার ঠিকানা আছে তোমারই মনে। একটু খুঁজলেই পেয়ে যাবে।

ইতি,
তোমার আমি।

প্রিয় প্রকাশক

আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। তোমার 'কিসের তরে অশ্রু ঝরে'-তে সব চরিত্ররাই তাদের নিজ নিজ বক্তব্য যথাসম্ভব জোরের সঙ্গেই তুলে ধরেছে। পাঠিকা হিসাবে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের অধিকার তুমি স্বীকার করে নিয়েছো। স্থান দিয়েছো তোমার উপস্থাপনায়। সকলেরই যুক্তি-জঙ্গলে পাঠক-কানা অবস্থা হবে সেটাও আমি দেখতে পাচ্ছি। তবুও দুটো কথা না বলে পারছি না।

প্রত্যেকেই পুরুষ শাসিত সমাজের কথাটা প্রায় তারস্বরে প্রকাশ করেছে। কেউই কিন্তু নারী শাসিত সংসারের কথাটা তেমন করে তুলে ধরেনি। The General rules the Army — সকলেই বলেছে ; কেউ বললো না — his wife rules the General. যুক্তি শাস্ত্রে যে ভুলই থাকুক না কেন সংসারের শস্ত্রাগারে অনুসিদ্ধান্তটি নির্ভুল লক্ষ্যভেদে সত্য। সমাজ প্রশাসনের সব সিংহই গৃহনীড়ে মূষিকস্বভাব। পাশুলশু নয়, স্বয়ং প্রকৃতিদেবী নারীর অস্ত্রাগার আর শস্ত্রসম্ভারকে নিপুণভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তীক্ষ্ণ এবং ধারালো করে রাখেন। উষ্ণ এবং শীতল — দুইভাবেই, both hot and cold. পুরুষ তাই সমাজের প্রশস্ত প্রতিবেশে যতো মার মারছে নারীকে, নারী ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে পুরুষকে মারছে তার শতগুণ। Rule of compensation ক্রমাগত এই মারকে বাড়িয়েই চলেছে। পুরুষ বাঁধনের দড়াদড়িতে যতো বেশি কষাকষি করছে নারী ততো বেশি বেশি করে গৃহাভ্যন্তরের গলা টিপুনিতে দড় হয়ে উঠছে। একটা শাশ্বত যুদ্ধাবস্থা তাই আহ্নিক গতিতে যেমন সত্য বার্ষিক পরিক্রমাতেও তেমনি সত্য হয়ে টিকে থাকছে।

এই যুদ্ধ চলছে পুরুষের জন্যে দুটো front-এ — এক, বাইরের জগতে, চাকরি-ব্যবসা-প্রশাসন, পাড়া-প্রতিবেশী-রাষ্ট্র, অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতির বৃহৎ পরিসরে এবং দুই, গৃহের সহ-অসহ-ধর্মিনীর আঁটোসাঁটো ক্ষুদ্র এলাকায়। অশান্ত যুদ্ধের অন্তে শান্তির নীড়ে এসে পুরুষ দ্বিখণ্ডিত বোধ করছে, অসহায় হয়ে পড়ছে। অবস্থা যতো জটিল হয়ে উঠছে পুরুষ ততো প্যাঁচ কষছে — গৃহ-যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করার জন্যে, তার শক্তি আর ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্যে পুরুষ তার যাবতীয় কলাকৌশল অভিজ্ঞতা নৈপুণ্য শক্তিসামর্থ প্রয়োগ করে চলেছে। বর্ণাশ্রমের পটভূমিতে নারীর জন্য শূদ্রযোগ্য স্থান নির্দেশ চলছে, সতী-ধারনা প্রচলিত করছে, বিধবাদের জন্যে অনুপুঙ্খ আচারবিচার নির্ঘণ্ট তৈরি হয়ে চলেছে আর এসবের জন্যে antidote হিসেবে দেবীত্ব আরোপ, শক্তিরূপিনী অভিধা এবং গৃহলক্ষ্মীর ঘোষণা-সম্মান ইত্যাদির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। প্রান্তরের ওপারে মুখোমুখী শত্রুর জন্যে অগ্নিগর্ভ গোলা বারুদ প্রকৃষ্ট এবং স্বীকৃত ; কিন্তু দিনান্ত বিছানা-মুখী নম্রপেলব গৃহ-শত্রুর জন্যে অন্যতর 'গোলাবারুদের' ব্যবহার বাস্তবসম্মত নয় কি ? তাই ভুরি ভুরি প্রশংসা-সম্মান আর তোষামোদের উষ্ণ কোমল নেশায় নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের গৃহসংগ্রাম স্বাভাবিক ভাবেই ফলপ্রসূ।

অন্যদিকে এই যুদ্ধ নারীর জন্যেও দুটো front খুলে দিয়েছিল। কিন্তু নারী প্রথমটি এড়িয়ে গেলো, বেছে নিলো দ্বিতীয়টি। প্রথমটি অবশ্যই সেই বাইরের জগৎ। সমকক্ষতার নীতিতে সেই বাইরের জগতের যুদ্ধটা এতোদিনে নারী লড়ে নিতে চাইছে, কিন্তু দীর্ঘদিন সেই চেষ্টাই করেনি। করেনি তার কারণ বোধহয় এই যে সর্বনিম্ন বাধার অনায়াস জীবন পেয়ে পেয়ে নারী শ্রমসাধ্য জীবনকে এড়িয়ে গেছে। পতির অর্থ সতীর অর্থ, পতির শক্তি-ক্ষমতায় নারীর শক্তি-ক্ষমতা এমন একটা সহজ সরল জীবনবোধ নারীকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছিলো। প্রতিফলিত আলোয় স্নাত বোধ করতে থাকলে নিজের মধ্যে আলো জ্বালানোর তেমন ব্যগ্রতা আর থাকে না। আর একবার সহজলভ্য আরামের ভাটার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে উজান-ঠেলা জীবন কষ্টসাধ্য মনে হতেই পারে। খরস্রোতা জীবনযুদ্ধের কথা অনেক দূরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এবং প্রচলিত প্রবাদ কথায় এ-কথাটাই বলা আছে — যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে শুয়ে থাকে তার অদৃষ্টও শুয়ে থাকে। নারী প্রথম ক্ষেত্রে যুদ্ধটা করতে চাইলো না বলেই আর করতে পারলো না।

আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, গৃহাভ্যন্তরে, যুদ্ধটা করতে সে তার নারী শক্তিকে কাজে না লাগিয়ে প্রকৃতিদত্ত রমণীর স্বরূপটিকে কাজে লাগালো! এখানেও সেই শ্রমবিমুখতা, সেই line of least resistance, সেই unearned ভোগের উপসত্ত্ব উপভোগের মানসিকতা প্রধান ভূমিকা নিয়ে বসলো।

প্রকৃতির দেওয়া চর্ম-বর্ম-ছলা-কলার কৌশলকেই মূলধন ভেবে আত্মশক্তির অনুশীলনে অনীহা দেখালো। সূর্যের শক্তিতে জয়ের গৌরবকে না দেখে চাঁদের চাঁদপানা নিশ্চেষ্টতার মধ্যেই সফলতাকে খুঁজে নিলে। এই দীনতার, এই শ্রমবিমুখতার আর এই রমণী-নির্ভরতার মধ্যে যে ভবিষ্যৎ পরাজয় তা নারী দেখতে পায়নি। পায়নি বলেই সে যুগ যুগ ধরে পরাভবকেই জয় বলে মনে করে এসেছে। এমনকি আজকের দিনেও অনেক শিক্ষিত মেয়েরাও এই মানসিকতার শিকার। কষ্ট করে সিদ্ধিলাভের বদলে অঞ্জলিতে পাওয়া আনন্দেই তারা বিভোর থাকতে পছন্দ করে দেখেছি। রমণী-ঐতিহ্য, প্রকৃতি-নির্ভরতা।

আর এই মানসিকতায় যখন এই রমণীরা তাদের ছেলেমেয়েদের তৈরি করে তখন তারা ছেলেদের পুরুষ করে গড়ে তুলতে চায়, কিন্তু মেয়েদের তৈরি করে রমণী করে — নারী করে নয়। সমকক্ষ বোধ নিজেদের মধ্যে থাকে না বলেই সব মা-মাসিরা কন্যাসন্তানদের মধ্যে নারী-শক্তির উৎসমুখটি খুলে দিতে পারে না, সিদ্ধিলাভের চেতনাটাই সঞ্চারিত করে দিতে পারে না। জীবনের শিক্ষা ছেলেমেয়েরা মায়ের কাছ থেকেই বেশি পায়। সেই শিক্ষিকা বা গুরুর দোষ গুণ ছাত্র-ছাত্রীদের — সন্তানসন্ততিদের মনে-মাথায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করে, করবে। তাহলে দায়ী কে?

এতো গেল নিজের ছাপে ছেলেকে পুরুষ আর মেয়েকে রমণী করে বা কামিনী করে গড়ে তোলার ইতিহাস এবং বাতাবরণ। এবারে একটু উঁকি দেওয়া যাক আন্তর শ্রেণী কলহের দিকে, ঠোকরাঠুকরি, কামড়াকামড়ির দিকে, রায়বাঘিনী প্রকৃতির দিকে। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা বলে বলা হয়েছে। পরনিন্দা-পরচর্চা আর আত্মকথা পাশ কথার উর্বর ক্ষেত্রও বটে এই অলস অপরাহ্ণবেষ্টিত রমণী জীবন। ভোগের এবং দুর্ভোগের গোমুখ থেকে পরিবার জীবনের নদীনালা খাল বিল বেয়ে অঢেল দুষণের স্রোতটি প্রবাহিত। এ-সব কি পুরুষ প্রাধান্যের জন্যে ঘটে?

পুরুষ তার জীবনের যুদ্ধটা বাইরের জগতে লড়ে নিচ্ছে। সে তো কিছু আর সোনার থালায় রূপোর চামচে মুখে দিয়ে জীবন সংগ্রামে অর্জনকে করায়ত্ব করতে পারছে না! ঘাম-রক্ত ঝরিয়েই তাকে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হচ্ছে। এটা একটা মানসিকতা। এই মানসিকতা, এই লড়াই করে নিজস্ব আদায়ের মানসিকতা পুরুষ পাচ্ছে কোথা থেকে? মা-বাবার কাছ থেকে, পরিবার থেকে, সমাজ থেকেই তো? তাহলে সেই একই সমাজব্যবস্থায়, একই পারিবারিক বাতাবরণে একই মা-বাবার কাছে নারী কেন এই মানসিকতা, এই প্রবণতা পাচ্ছে না? বাবা-কাকা-জ্যেঠারা বাধা দিচ্ছেন? অনেক ক্ষেত্রেই দিচ্ছেন। কিন্তু পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে মা-মাসি-ঠাকুমারা নয়? General-দের rule করতে যে মা-মাসিরা শত শত জৈব অস্ত্র আর সহস্র সহস্র মানসিক কলাকৌশল ব্যবহার করতে পারছেন সেই মা-মাসিরা নিজ নিজ কন্যাদের শত নিষেধ আর সহস্র বন্ধনে কেন নতনেত্র গৃহবলিভুক প্রাণীটি করে গড়ে তুলছেন? যাঁরা বাড়ি গাড়ি শাড়ি-গয়না আর পার্টির ব্যাপারে স্টিয়ারিং-এ বসে অভ্যস্ত তাঁরা কেন কন্যাদের জীবন গঠনে সেই স্টিয়ারিংকে সঠিক দিকে, কাঙ্ক্ষিত দিকে, ঘুরিয়ে ধরেন না?

আমার বিশ্বাস তাঁরা তাইই করেন। যে দিককে তারা সঠিক বলে মনে করেন, যে লক্ষ্যকে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বলে মনে করেন সেই দিকেই চালিত করেন। দুর্ভাগ্যবশত সেই দিকটি অত্যন্ত সুবিধাবাদীর দিক আর সেই লক্ষ্যটি অত্যন্ত পরনির্ভরশীলতার লক্ষ্য। নারীই তাই নারীর দিকভ্রষ্টতার কারণ, নারীই নারীকে ভ্রান্ত লক্ষ্য জীবন দর্শনে পরিচালিত করে চলেছে। এটা পাভলভের কনডিশনিং নয়, self conditioning, mental conditioning. প্রজন্ম প্রজন্ম ধরে বৃত্তিভোগী যেমন একটা অকর্মণ্য মানসিকতার শিকার হয়ে পড়ে, সে যেমন হাতকে হাতিয়ার ধরার যোগ্য মনে না করে অঞ্জলিপুটে প্রার্থনার ভঙ্গিতে পটু করে তোলে নারীও তেমনি যুগ যুগ ধরে উপসত্ব

ভোগের অলস মানসিকতায় নিজেকে প্রার্থী রূপেই চিহ্নিত করে তুলেছে। আর এই করতে গিয়ে নিজের প্রাকৃতিক মূলধনের অপ-ব্যবহার করেছে, ছলাকলায় কুশলী হয়ে উঠেছে কিন্তু সংগ্রাম আর যুদ্ধের মনটিকেই হারিয়ে ফেলেছে। স্বোপার্জিত স্বাধীনতার প্রতি নারীর আর মন নেই পরার্জিত স্বাধীনতায় ভাগ বসাতে সে উন্মুখ। এটাই অবমাননার মূলে।

আমাদের সমাজে-সংসারে শাশুড়ি মনোভাবটা যতো সহজে এবং সতেজে বেড়ে ওঠে নারীর মনে, ততো সহজে-সতেজে কি স্বাধীনতার স্পৃহাটি গড়ে ওঠে ? কখনই না। এই শাশুড়ি মনোভাবটা কি পুরুষেরা নারীর মনে উপ্ত করে দেয় ? তা তো নয় ; এটা তো নারীর নিজস্ব অভিব্যক্ত-অর্জন। সব বৌরাই সব শাশুড়ির দ্বারা নির্যাতিত। আজ যারা বৌ হয়ে সংসারের মধ্যে সবে প্রবেশ করলো — এবং নির্যাতিত জীবন বয়ে চলল, কাল তো তারাই শাশুড়ি হল। এবং তখন এই একদিনের বৌ কিন্তু আজকের শাশুড়িরাই আবার বৌদের নির্যাতনে লেগে গেল। অথবা, এভাবেও বলা যায়, আজ যারা শাশুড়ি হয়ে বৌদের চোখের জল ঝরাচ্ছে গতকাল তারাইতো বউ ছিল এবং চোখের জলে জীবন শুরু করেছিল। তাহলে এই অভিব্যক্ত মানসিকতা, এই স্ববিরোধ, এই আত্মখণ্ডন কি বাইরের কোনো আরোপ না ভিতরের নারী স্বরূপের প্রকাশ ?

এই আত্মখণ্ডনই নারীকে আত্মনির্যাতনে নিঃস্ব করে দেয়, দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। অসীম বলের উৎস হয়েও নারী অবলা। গৃহের শান্তি চেয়ে চেয়ে নারী নিজের দৃঢ়তা হারিয়েছে, শক্তি হারিয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকার হারিয়েছে। গৃহ শান্তির ভিত গড়তে এবং সেই ভিতে সুন্দরের সৌধ প্রতিষ্ঠায় নারী ও পুরুষের দায় সমান। এই কথাটি নারী প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পারলো না, বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্ত করতে পারলো না,প্রেমের সঙ্গে প্রেয় করে তুলতে পারলো না। সে গৃহে জৈব প্রকৃতিতে সেবিকা থাকাটাকেই সহজতম বলে ভেবে নিল, চিৎ-স্বভাবের আত্মশক্তিতে সবলা হয়ে উঠতে প্রেরণা পেল না ; সে কামিনী রূপে কাম্যের পদসেবা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো, দামিনীর ঔজ্জ্বল্যে গৃহকে আলোকিত করার বাসনা ত্যাগ করলো। সে রমণী হয়ে হাস্যে লাস্যে রমণীয় হতে চাইলো, রমা রূপে শ্রী ও ধীমতী হয়ে বরণীয় হতে চাইলো না। আপন অন্তরের শক্তিসম্পন্নতার চাইতে নারী তার প্রকৃতিদত্ত অস্ত্রাগারে শস্ত্রসম্ভারে বেশি মনোযোগী হয়ে সেই শক্তিসম্পন্নতাকেও হারালো, অস্ত্রশস্ত্রের অপব্যবহারেও নিজেকে ব্যবহারযোগ্য ক্রীড়নক করে ফেললো। গৃহে এবং বাইরে, সর্বত্র।

সামাজিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক স্বাধিকার নয়। এই পণ্যজীবনের মূলে আছে মানসিক স্ব-অধীনতা বোধের অভাব। বিদ্যালয় শিক্ষক স্বামীর অধ্যাপিকা স্ত্রী আর্থিকভাবে শুধুমাত্র সমকক্ষই নয়, অধিকক্ষমও বটে। তবুও সেই নারী প্রেম-ভালবাসা-বিবাহের ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স পার হয়েই নিজেকে 'আজীবন' নিপীড়িতা নির্যাতিতা বোধে আক্রান্ত দু'কুড়ি দশোর্ধ বছরের অর্থহীন অবস্থানে অনুশোচনা করছে। প্রায় সব নারীই সংসারে হাড় কালি করে মরণ হলে বাঁচি-র জীবন যাপন করে ; এক মাইক্রোস্কপিক অংশকে দেখতে পাই বিজ্ঞাপনের শতসহস্র রঙ্গে-ভঙ্গে, হাস্যে-লাস্যে-দেহ উদ্ভাসে আনন্দের হাটে। পণ্য! অথবা বিউটি কনটেস্টে প্রকৃতি প্রদত্তের বায়ো-জিয়ো মোচড়ে-মোচড়ে। ক্ষণপ্রভা বিশ্ব পণ্য। লক্ষকোটির দৃষ্টির আড়ালে এই সূক্ষ্মাংশ নারীদের জীবনের ইতিবৃত্ত আমার জানা নেই। এদের এই উদ্ভাসিত জীবনের অন্তরালে যে জীবন তা অন্যতর হবার সুযোগ আছে কি ? অথবা, যৌথ পরিবার ছেড়ে উচ্চ ফ্ল্যাট নীড়ে যে 'টোনা-টুনি' জীবন সেখানে সামাজিক স্বাধীনতা সীমাহীন। তা সত্ত্বেও সেই সব চার দেয়ালের বদ্ধ ঘরে টেপ রেকর্ডার রেখে দেখেছেন কেউ ? পরিসংখ্যান ?

কেউ বলবেন শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, কেউ বলবেন আইনকানুনের আধুনিকীকরণ

কেউ বলবেন 'রিজার্ভেশন', কেউ চাইবেন সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার। এ-সবই আবশ্যিক শর্ত, অবশ্য প্রয়োজনীয় বাতাবরণ। কিন্তু অনিবার্য নয়। প্রথম রাতে বিড়াল মারাটাই অনিবার্য জানবেন। মানসিকতা, স্ব-অধীনতার বোধটুকু শান্ত দৃঢ়তায় সঞ্চারিত করে দেওয়াটাই অনিবার্য। নিজ নিজ স্থান এবং আত্মসম্মান নিজের নিজের অন্তরে প্রথম স্থির বুঝে নেওয়া চাই। আত্মখণ্ডন আর আত্ম নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার পথ নারীর স্ব-কে অখণ্ড করে উপলব্ধি করা আর অন্য নারীদের যন্ত্রণা-বেদনাকে একাত্ম করে অনুভব করা।

অশ্রু কি আদায়ের হাতিয়ার হয়েই নারীর কপোল ভাসাবে চিরকাল? শিশুর ক্রন্দন, বালকের চিৎকার, যুবকের হুমকি আর রাজনীতির নেতাদের কণ্ঠঘোষণার মতো নারী কি অশ্রুকে অস্ত্র হিসেবেই ঝরাবে? না। নারী তার অতীতের দীনতা, যুগ যুগ সঞ্চিত আত্মখণ্ডন আর দীর্ঘ আরোপিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াসঞ্জাত স্বজাতি-নির্যাতনকে কবরে শায়িত করে অশ্রু-অঞ্জলি দেবে। সেই অঞ্জলি অন্তে সে খুঁজে পাবে তার মধ্যের শক্তিকে, দধিচীর প্রতিজ্ঞাকে আর স্ব-অধীনতার বোধকে। ভেঙে পড়বে পরিবার? ধ্বংস অনিবার্য হবে? কখনই না। নারীর কিছুই হারাবার নেই, পুরুষের আছে। পুরুষের সব আছে তাই হারানোর ভয় আছে। পুরুষ তাই ভীতু। ভীতু বলেই তো সে নারীকে পদানত রাখতে শক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত। পুরুষের শক্তি তার দেহে, তার অর্থে, তার নিজের করা ব্যবস্থায়। নারী যদি তার নিজের ভাগ্য জয় করতে এগিয়ে আসে, অধিকারকে আত্মস্থ করার বাসনাটি প্রকাশ করতে পারে তাহলেই এ যুদ্ধ নিতে পারে জিতে। পরিবারের ব্যাট্‌ল্ ফিল্‌ড্ কোনো গুলিগোলা ছোড়ার ক্ষেত্র নয়। এই নারী-পুরুষ যুদ্ধে পরিবার এককের দুটি প্রান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হবে; এই সংগ্রাম তাই মিত্র-সংগ্রাম, শত্রু-সংঘর্ষ নয়।

যুযুধান দুই পক্ষের উদ্দেশ্যই এক — সংসারের শান্তি। প্রক্রিয়ায় পার্থক্য ছিল, আছে। যে শান্তি নারীর মূল্যে এতোদিন অর্জনের চেষ্টা চলেছে সেই ক্ষেত্রে পুরুষকে ডাক দিতে হবে। তার অংশের মূল্য সে চুকিয়ে দেবে, দিতেই হবে। পুরুষ পক্ষ গোঁফে তা দিয়ে, দাড়িতে হাত বুলিয়ে আলবলা-গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক ঝংকার তুলবে আর নারী পক্ষ চোখের পাতা ভিজিয়ে অকিঞ্চন-অঞ্জলিপুটে নতস্কন্ধ অপেক্ষা করবে এমন বিষম চিত্র না পুরুষের পক্ষে সম্মানের না নারীর পক্ষে সম্ভ্রমের।

আর দ্বিতীয় যুদ্ধ নারীর নিজের প্রকৃতির সঙ্গে নিজের মানবিক স্বভাবের। নিজের পর্ব পর্যায়ের সঙ্গে নিজেরই পর্ব পর্যায়ের। নারীর সঙ্গে নারীর এই যুদ্ধে চোখের জল নয় হৃদয়ের সরসতা কর্কশকে পেলব, উষরকে প্লাব্য এবং জীবনকে সুন্দর করে তুলবে।

অশ্রু ঝরানোর কারণ নেই, হেতু নেই দীর্ঘশ্বাস ফেলার — হাস্যমুখে নারী তার অদৃষ্টের পরিহাসকে ইচ্ছে করলেই আমূল পালটে ফেলতে পারে। পারে, না, পারবে? শুরু করাটাই শক্ত; কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। দায় এখন বহমান রাখার।

তোমার সেই চেষ্টায় আমার সমর্থন রইলো।

ইতি

এক কন্যা-জায়া-মাতা